হিমালয়

রায় বাহাদুর শ্রী জলধর সেন

পদব্রজে পশ্চিম দেশে ভ্রমণ করতে গিয়ে আমি কেমন ধীরে–ধীরে যেন দেরাদুনের অধিবাসী হয়ে পড়েছিলুম। দেরাদুনের বাঙালী ও হিন্দুস্থানী অধিবাসিগণ তাঁদের স্বভাব–সুলভ স্নেহের বশবর্তী হয়ে আমাকে তাঁদের আপনার জন করে নিয়েছিলেন। আমিও যেন কেমন হয়ে গিয়েছিলুম। দু–দশ দিনের জন্য যেখানেই ছুটে যাই না কেন , ক্লান্ত হলেই দেরাদুনের বন্ধুগনের স্নেহশীতল আশ্রয়ে এসে হাঁফ ছাড়তুম। এই বিদেশে হিমালয়ের ক্রোড়ের মধ্যেও আমার ঘরবাড়ী হ'য়ে গিয়েছিল। আমি এক সংসারের পাশ ছিন্ন করবার জন্যে লম্বা এক–দৌড়ে –– হিমালয়ের কোলের মধ্যে গিয়েছিলুম; কিন্তু সংসারের আসক্তি আমার পিছনে পিছনে ছুটে এসে এই পাহাড়ের নিভৃত নেপথ্যদেশেও আমাকে গ্রেপ্তার করেছিল। এই সব কারণে মধ্যে মধ্যে ভারি একটা দুর্দমনীয় বাসনা হ'ত যে, একেবারে পাহাড়ের মধ্যে ডুবে যাই–– খুব একটা লম্বা পথে যাত্রা করি; –– নিতান্ত পথের সন্ধান না হয় , একেবারে নিরুদ্দেশ যাত্রাই করা যাক্! তাতে আর কি ক্ষতি? দেশে থাকবার সময় সাধু–সন্ন্যাসীর মুখে কেদারনাথ বদ্রীনাথের কথা অনেক শুনা গিয়েছিল। কিন্তু কোনদিন স্বপ্নেও সে–সব দেশে যাব এ কথা মনে উঠে নাই। এখন আমার মধ্যে মধ্যে –– সেই সব দেশে যাবার ইচ্ছে হ'ত; কিন্তু আমার ক্ষুদ্র শক্তিতে সে কাজটা যে হ'য়ে উঠবে , সে বিষয়ে খুব সন্দেহ ছিল। কেদারনাথ বদ্রীনাথে যাত্রী অতি কম যায়, বিশেষত: বাঙালীর সংখ্যা ত আরো অল্প, প্রতি বৎসর পাঁচজনের বেশী হবে না। আমার বদ্রীকাশ্রমে যাবার জন্যে অত্যন্ত আগ্রহ হ'তে লাগলো; কিন্তু কোন সুবিধা ক'রে উঠতে পারলুম না। তার তিন চার বৎসর আগে থেকে গভর্ণমেন্ট যাত্রীদের বদ্রীকাশ্রম যাওয়া বন্ধ ক'রে দিয়েছিলেন। কয় বৎসর গাড়োয়াল রাজ্যে এমন ভয়ানক দুর্ভিক্ষ হ'য়েছিল , যে যাত্রীদের পথ ছেড়ে দিলে তারা হয় ত অনাহারে মারা পড়তো। আমি কিন্তু সেই থেকেই বরাবর চেষ্টায় আছি, সুযোগ ক'রে উঠতে পারলেই একবার যাবো।

তারপর এক বছর হরিদ্বারে মহাকুম্ভ মেলায় গিয়ে আমার একজন পূর্বপরিচিত শ্রদ্ধেয় সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হ'ল। ইনি বাঙালী; বাল্যকাল হতেই উনি আমাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন; এখন ইনি সন্ন্যাস গ্রহণ করেছেন। বলা বাহুল্য, পথে ঘাটে যে রকম সন্ন্যাসী দেখা যায়, ইনি সে প্রকৃতির নন; ইনি প্রকৃতই একজন সাধু ব্যক্তি; আধুনিকভাবে শিক্ষিত, এবং সামাজিক, রাজনৈতিক প্রভৃতি বিষয়ে সবিশেষ অভিজ্ঞ। আমি নানাপ্রকার অনুরোধ ক'রে তাঁকে হরিদ্বার হ'তে দেরাদুন নিয়ে এলুম। কিন্তু তিনি লোকালয়ে আসতে স্বীকার পেলেন না। কাজেই তাঁকে টপকেশ্বরের এক পর্বতগুহায় রেখে বাসায় এলুম। অবকাশমত তাঁর নিকট যাতায়াত করতে লাগলুম; দুই একদিন সেই পর্বতগহ্বরে বাসও করা গেল; এবং এই রকম ক'রে আমরা দুজন–একজন সন্ন্যাসী ও একজন গৃহবাসী –পরস্পরের নিকট অধিকতর পরিচিত হ'তে লাগলুম। অবশেষে তাঁর সঙ্গে আমার বদ্রীকাশ্রমে যাওয়া স্থির হ'য়ে গেল। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই দেরাদুনস্থ বন্ধুবান্ধব–মণ্ডলীর মধ্যে এ

সংবাদ রাষ্ট্র হ'ল। আমার সকল হিন্দুস্থানী বন্ধুর ত চক্ষুস্থির। তাঁরা ভাবলেন, তাঁদের ভবিষ্যৎবাণী বুঝি বা সফল হয়।

সন্ন্যাসী মহাশয়কে আমি 'স্বামীজি' বলে ডাকতুম। তাঁর সঙ্গে আমার যাত্রা করার পরামর্শ স্থির হ'য়ে গেল, আমি যে সত্যই এরকম বড় একটা ব্যাপারে প্রবৃত্ত হচ্ছি, আমার দুর্ভাগ্যবশত: তা কেউ বিশ্বাস করতে রাজী হ'লেন না। যদি আমি কথঞ্চিত করুণা উদ্রেক করিবার অভিপ্রায়ে কোন বন্ধুর কাছে মুখ ভার ক'রে বলি, ''ভায়া হে, ছেড়ে ত চললুম, একেবারে ভুলো না।'' অমনি দুই বিন্দু অশ্রু এবং একটি দীর্ঘশ্বাসের পরিবর্তে এক মুখ হাসি আমাকে বিব্রত ও অপ্রস্তুত ক'রে ফেলতো। বিদ্রুপের স্বরে তাঁরা বলতেন, ''তুমি যাবে? --তীর্থ ভ্রমণে। দেখলে ত বিশ্বাস হয় না।'' বাস্তবিক আমার মত শ্রমকাতর মনুষ্য যে বহু কষ্ট স্বীকার ক'রে পদব্রজে পর্বতে পর্বতে ঘুরে বেড়াবে, এ কথা তাঁরা কি ক'রে সহজে বিশ্বাস করেন? আমারই এক এক সময়ে মনে হ'তে লাগলো এই সমস্ত পাহাড়, পর্বতের মধ্যে এত দীর্ঘ পথ হাঁটা কি আমার পক্ষে সম্ভব হবে? সামন্য দূরে ক্ষুদ্র এক চড়াইএ উঠতে হ'লেই আমার ডাণ্ডীর দরকার হয়– আর আমি কি ক'রে অত পথ অতিক্রম করবো? আর পথে বিপদের সম্ভবনাও ত কম নয়।

কিন্তু নানা জনের নানা কথার মধ্যে প'ড়ে আমার ভ্রমণেচ্ছা ক্রমেই দৃঢ় হ'তে লাগলো;– যতই চারিদিক থেকে পথের ভীষণতা সম্বন্ধে কথা শুনতে লাগলুম, ততই আমার যাবার ইচ্ছা প্রবল হ'তে লাগলো, শেষে যাত্রা করার দিন পর্যন্ত স্থির হ'য়ে গেল। তখন আমার বন্ধুদের পরিহাস আর বিদ্রুপ কোথায়?– বিদায়ের অশ্রুতে সব ভেসে গেল। সকলেরই মনে হ'ল, এই হয়ত শেষ দেখা। আর কি ফিরে আসতে পারব? এখন থেকে আমার দৈনিক লিপি উদ্ধৃত করি।

৫ ই মে,১৮৯০; মঙ্গলবার।– আগামীকাল অতি প্রত্যুষে আমার যাত্রা করবার দিন। বন্ধুবান্ধব সকলেই খুব বিষণ্ন, যেন আমি চিরদিনের জন্য সকলের স্নেহবন্ধন ছিঁড়ে চলে যাচ্ছি। পাড়ার বাঙালী স্ত্রী–পুরুষ সকলেই কাতরতা প্রকাশ করতে লাগলেন, বন্ধুবান্ধবেরা আপনার আপনার নামলেখা পোস্টকার্ড আমার গানের বইয়ের মধ্যে রেখে দিলেন। সমস্ত দিন কেটে গেল। দেরাদুনে এমনও দুই একজন লোক ছিলেন, যাঁরা আমার উপর খুব বেশী নির্ভর করেন; মনে মনে অখিল–নির্ভরের উপর তাঁদের সমর্পণ করলুম। রাত্রিতে আর নিদ্রা হ'ল না। সামান্য কোথাও যেতে হ'লেই নানা উৎকণ্ঠায় রাত্রে নিদ্রা হয় না, আর এ ত আমার সুদীর্ঘকালের জন্য যাত্রা। বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে কথাবার্তায় ও নানা কাজে সমস্ত রাত্রি কেটে গেল। আয়োজনের জন্য কিছু ব্যস্ত হ'তে হ'ল না; দীনের বেশে বের হব, তার আর আয়োজন কি করবো?

৬ ই মে, বুধবার।– আজ রাত্রি সাড়ে–চারটার সময় দেশত্যাগের বন্দোবস্ত; তৎপূর্বেই বন্ধুবর্গ বিদায়ের জন্য সমবেত হ'লেন। জ্যোৎস্নারাত্রি সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, সুষুপ্ত। আমার জীবনের ক্ষুদ্র পরিবর্তনে পৃথিবীর ধারা কি পরিবর্তিত হয়? সকলকে ছেড়ে চললুম, আত্মীয় বন্ধুবর্গ অনেক দূর পর্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে এলেন। তাঁদের এই দীর্ঘকালের স্নেহবন্ধন ছিন্ন করা সবিশেষ কষ্টকর ব'লে মনে হতে লাগলো। তাঁদের আর বেশিদূর

অগ্রসর না হ'তে অনুরোধ করলুম; শেষে তাঁরা অনিচ্ছাসত্ত্বেই ফিরলেন। আমিও ফিরে ফিরে অনেকক্ষণ ধরে তাঁদের দিকে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলুম। আমার মনে হ'ল, এতেই এত কষ্ট, আর নিতান্ত আপনার লোকের কাছ থেকে এ রকম বিদায় নেওয়া না জানি আরো কষ্টকর। দিন-কতক আগে 'Pilgrim's Progress' পড়েছিলুম; তারই একটি ছবির কথা আমার বার বার মনে আসতে লাগল। নানা চিন্তার মধ্যে অগ্রসর হ'তে লাগলুম।

সূর্যোদয় হ'ল। আমরা হৃষীকেশের পথে আসতে লাগলুম- এ আর একটা পথ। এ পথেও লোকজনের সংখ্যা বড় অল্প। পাহাড় ও জঙ্গল অতিক্রম করে বেলা ১১ টার সময় 'খানু' নামে একটা ছোট গ্রামে উপস্থিত হ'লুম। গাছ পাতায় ঢাকা পাঁচসাত ঘর গৃহস্থের বাড়ী নিয়ে এই গ্রামখানি শাখাপত্রসমাচ্ছন্ন ক্ষুদ্র বিহঙ্গ-নীড়ের ন্যায় স্নিগ্ধ ও শান্তিপূর্ণ। এই গ্রামের পাশ দিয়ে একটা ছোট ঝর্ণা চ'লে যাচ্ছে। আমরা সেই ঝর্ণার ধারে একটা গাছের তলায় আশ্রয় নিলুম; ক্ষুধা-তৃষ্ণায় অধীর হ'য়েছিলুম, প্রাণ ভ'রে ঝর্ণার জল পান করা গেল। তারপর সেই বৃক্ষতলেই আহারাদি শেষ করে অপরাহ্ণ ৫ টার সময় আবার যাত্রা আরম্ভ করলুম।

গ্রাম যখন ছাড়িয়ে গেছি-তখন দেখলুম দুজন সন্ন্যাসী আমাদের আগে আগে যাচ্ছে। ভাবলুম, আমরা দুজন আছি, এ দুজন সাধু ব্যক্তির সঙ্গ লওয়া যাক না; কিছুদূর একসঙ্গেই চারজনে যাওয়া যাবে। সেই দুজন সাধুকে ধরবার জন্য আমরা একটু তাড়াতাড়ি চলতে লাগলুম; কিন্তু সন্ন্যাসীদ্বয়ের কাছে গিয়ে আমার হাসিও এল, রাগও হ'ল। দেখি একজন আমারই বাসার চাকর। চুরি অপরাধে আজ কুড়ি পঁচিশ দিন পূর্বে তাকে তাড়িয়ে দিয়েছি। আজ তাকে যে রকম জাঁকাল সন্ন্যাসীর বেশে দেখলুম, এবং যে রকম উৎসাহের সঙ্গে সে ঘন ঘন ''হর হর বম্ বম্'' করছে, তাতে কার সাধ্য তাকে চোর বলে। তবে তার নিতান্তই গ্রহ-বৈগুণ্য যে, আজ আমার সম্মুখে পড়ে গেছে। আমি স্বামীজিকে সব কথা খুলে বললুম। তিনি বললেন ''হয় ত ওর সঙ্গীর ঝুলিতে কিছু অর্থ আছে, তাই আত্মসাৎ করবার জন্য বেটা ও রকম ভেক ধরেছে''। গৈরিক বসন ও জটা কমণ্ডুলর মধ্যে এই রকম কত চুরি ডাকাতি ও নরহত্যা ছদ্মবেশে দ্বিতীয় সুযোগের অপেক্ষা করছে, তার আর সংখ্যা নেই। আমার এই ভ্রমণ-বিবরণে পাঠকের ও-রকম অনেক সাধুদর্শন ঘটবে।

আমার চাকর বাবাজি হয় ত প্রথমে মনে ক'রেছিল, আমি তার এই পরিবর্তন দেখে তাকে চিনতে পারবো না; তাই তার পশ্চিমে বুদ্ধির দ্বারা আমার বাঙালী বুদ্ধির পরিমাণ স্থির ক'রে নিশ্চিন্ত ছিল। সে আমাদের দেখে আরও জোরে জোরে 'বম্ বম্' করতে লাগলো। এ ভণ্ডামী আমার নিতান্তই অসহ্য হ'য়ে উঠলো, আমি একটু হেসে বললুম ''আরে লৌণ্ডে, কবসে চোরী ছোড়কে সাধু বন্ গিয়া?''- আমার কথা শুনে বাবাজির মাথায় যেন বজ্রাঘাত হ'ল। সে একটা কথাও বলতে পারলে না। তখন তার সেই বিশ্বস্তচিত্ত সঙ্গী সাধুটিকে সমস্ত বললুম। সে বেচারী নিতান্ত ভাল-মানুষ। এই অল্পবয়সী, জোয়ান ছোকরা তার চেলা হ'তে স্বীকার করায় সে তাকে সঙ্গী করেছে। আমি বললুম ''সাধু তুমি ওকে রাখ, খেতে দেও, তাতে আমার আপত্তি নেই ; কিন্তু যদি তোমার ঝুলিতে কিছু টাকাকড়ি থাকে ত তা সাবধান ক'রে রেখো দশ বারো দিনে যে এমন সাধু

হ'তে পারে, দু পাঁচ ঘন্টার মধ্যে আবার তার নরঘাতক দস্যু হওয়ারও আটক নেই।''
– পরে জেনেছিলুম, সাধু আমার অযাচিত উপদেশ গ্রহণ ক'রেছিল।

সন্ধ্যার সময় আমরা 'ভোগপুরে' উপস্থিত হলুম। এ গ্রামে অনেকগুলি লোকের বাস। দু-চারটে ছোট কোঠাঘর দেখে বুঝলুম, এখানে ধনীও দু-পাঁচ ঘর আছে; অবিলম্বে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। এ-অঞ্চলে যে গ্রামে দু পাঁচঘর বর্ধিষ্ণু লোকের বাস, সেইখানেই গ্রামের লোকের ব্যয়ে ও যত্নে এক-একটা ধর্মশালা থাকে; বিদেশী সাধু অতিথি সেখানে আশ্রয় পায়; গ্রামের লোক যথাসাধ্য আহার-সামগ্রী দিয়ে যায়। তবে গ্রামে দোকান থাকলে, কি পথিকের হাতে পয়সা থাকলে তাদের ধর্মশালার সাহায্য নেবার বড় দরকার হয় না। বাঙলাদেশে ধর্মশালার মত জিনিসের অভাব বড় বেশী। নানা বিষয়ে আমরা ভারতের অন্যান্য দেশের লোক অপেক্ষা উন্নত ও সভ্য; কিন্তু পথিক বা রোগগ্রস্ত ব্যক্তি পথিপ্রান্তে প্রাণত্যাগ করলেও তাদের দিকে ফিরে তাকাবার আমাদের অবসর নেই; এতই আমরা কাজে ব্যস্ত। তবে আমাদের মধ্যেও যে দু-পাঁচজন এ-দলের বাইরে আছেন, এ-কথা অবশ্য স্বীকার করতে হবে। কিন্তু আমার যেন মনে হয়, পরোপকার, কি বিপন্নকে আশ্রয় দান এবং অতিথি-সৎকার প্রভৃতি বিষয়ে আমাদের দেশের শিক্ষিত লোক অপেক্ষা অশিক্ষিত গাড়োয়ালী কৃষকের হৃদয়ের উচ্চতা অনেক বেশী।
ভোগপুরের ধর্মশালায় রাত্রিবাস করা গেল, আহারাদির কোনও দরকার হ'লো না; পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়েছিলুম, শয়নমাত্রই নিদ্রা।

৭ ই মে, বৃহস্পতিবার।– প্রত্যুষে উঠে আবার যাত্রা। এবার সেই পূর্ব-পরিচিত হৃষিকেশের জঙ্গলে প্রবেশ করা গেল। জঙ্গল পরিচিত হ'তে পারে; কিন্তু রাস্তা সম্পুর্ণ অপরিচিত; পূর্বে যে রাস্তায় এসেছিলুম, এবারও সেই রাস্তায় যাচ্ছি কি না বুঝতে পারলুম না। বেলা একটার সময় হৃষিকেশে পৌঁছলুম। বৃক্ষতলে বিশ্রাম করা গেল, আহারাদি কিছুই হ'লো না। অপরাহ্নে রৌদ্রের তেজ কমতে যাত্রা ক'রে লছমন-ঝোলায় উপস্থিত হ'তে সন্ধ্যা হ'য়ে গেল। লছমন-ঝোলায় গঙ্গার উপর যে ক'খানা দোকানঘর ছিল, দেখলুম তা যাত্রির দলে পূর্ণ। সেইদিন এখানে একদল উদাসী সন্ন্যাসী এসেছে। এরা শিখ। গুরু নানক একেশ্বরবাদ প্রচার করেছিলেন; কিন্তু এরা এখন পৌত্তলিক। ইহারা হিন্দুর সমস্ত তীর্থই পর্যটন করে থাকে এবং নানকের লিখিত ধর্মগ্রন্থ পূজা করে। এরা সেই পুস্তককে 'গ্রন্থসাহেব' বলে। এই দলে প্রায় ২০০ লোক। এদের কথা পরে ব'লব।

পশ্চিম দেশে যাওয়ার আগে আমি প্রায়ই পদ্মানদীর ও-পারে আমার কোন বন্ধুর বাড়ী সর্বদা যাতায়াত করতুম। সেখনকার এক ব্রাহ্মণ-ঠাকুর একবার বদ্রীকাশ্রমে গিয়েছিলেন; কিন্তু আমাদের মত ইংরেজী-পড়া কতকগুলি ছেলের বিশ্বাস ছিল ঠাকুর হরিদ্বার পর্যন্তও যান নি। যা হ'ক, দেশের লোকে গয়া, কাশী, বৃন্দাবন যায়; সুতরাং সে সব যায়গার গল্প আমরা সর্বদা শুনতে পেতুম; কিন্তু বদ্রীকাশ্রমে দেশের লোক বড় একটা যায় না; কাজেই সেখানকার কাহিনী সম্বন্ধে বামুন-ঠাকুরই প্রধান 'থরিটি' ছিলেন। তিনি অনেকগুলি আজগুবি গল্প করেছিলেন; তার মধ্যে তাঁর লছমন-ঝোলার গল্প আমার বেশী মনে ছিল এবং তৎসম্বন্ধীয় একটা ভয়াবহ ভাব ছেলেবেলা থেকে একেবারে রক্তের সঙ্গে মিশে ছিল। আমি যে গ্রামের কথা বলছি, সেখানে একটা যায়গায় প্রতিবৎসর বর্ষার সময় কাদায় জলে মিশে একটা নরককুণ্ড হ'য়ে থাকত, এবং সেখান থেকে উদ্ধার লাভের

জন্যে গ্রামের লোক একটা বাঁশের সাঁকো প্রস্তুত ক'রে রাখত৷ সে সাঁকোর 'ইডিয়া' শহরের লোককে দেওয়া শক্ত৷ কাদার মধ্যে দু-খানা বাঁশ পুঁতে তার উপর একটা বাঁশ ফেলে খানিক উপরে আর একটা বাঁশ ধ'রে ধীরে ধীরে সেই কর্দমাক্ত স্থান পার হতে হ'ত৷ হঠাৎ হাত কি পা ফসকে গেলে সেই মহাপঙ্কে একেবারে নিমজ্জন ছাড়া অন্য গতি ছিল না৷ লছমন-ঝোলার গল্প শুনে অবধি, আমরা এই অপরূপ সাঁকোর নাম রেখেছিলুম লছমন-ঝোলা৷ তখন কি একবার স্বপ্নেও ভেবেছিলুম আসল 'লছমন-ঝোলা'ও আমাকে পার হ'তে হবে৷ কিন্তু এখন যারা লছমন-ঝোলা দেখবেন, তাঁর পূর্বের লছমন-ঝোলা কি রকম ছিল, তা বুঝতে পারবেন না৷ অতএব সে কালের ঝোলার একটা সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিচ্ছি৷

প্রথমে একটা দড়ির সিঁড়ি প্রস্তুত করতে হয়; খুব মোটা দু'গাছা দড়ি সমান্তরালভাবে বসিয়ে তার মাঝে মাঝে সিঁড়িতে যেমন পা দেওয়ার জন্য কাঠ থাকে, তেমনি ছোট ছোট শক্ত কাঠ বেশ ভাল ক'রে বেঁধে সেই দড়ির সিঁড়িগাছটা নদীর দুই পারে বেশ করে আটকিয়ে দেয়৷ তার উপরে পা দিয়ে পার হ'তে হয় এবং হাতে ধরবার জন্য নীচে যেমন উপরেও সেই রকম দুটো শক্ত রশি এপার ওপার বেঁধে দেয়৷ সেই রশি দুটো দুই কুক্ষির মধ্যে দিয়ে দু'হাতে ধরে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে হয়৷ একবার মনে করুন, ব্যাপারটা কি ভয়ানক৷ দুই কুক্ষির মধ্যে দুই রশি, আর পা সেই রসি-নির্মিত সিঁড়ির উপর৷ পায়ের তলায় চার পাঁচশো হাত নীচে ভয়ানক বেগবতী গঙ্গা৷ একবার কোনও রকমে পিছলে গেলে আর রক্ষা নেই৷ প্রথমে হাত দিয়ে কিছুক্ষণ বেশ ঝুলতে পারা যায় বটে; কিন্তু পা আবার যথাস্থানে স্থাপন করা অতি কম লোকের ভাগ্যেই ঘটে৷ আরো ভয়ানক কথা এই যে, এইরকম ঝোলার উপর দিয়ে একটু গেলেই পা এমন ভয়ানক দোলে যে, হাত পা ঠিক রাখা দুরূহ হ'য়ে পড়ে৷ প্রতিক্ষণেই মনে হয় এইবারই হয় ত পড়ে যাবো৷ লছমন-ঝোলা পার হওয়া এই জন্যই এত ভয়ের কারণ ছিল৷ এই ঝোলা পার হ'তে গিয়ে কত যাত্রী যে মারা গেছে তার সংখ্যা নেই৷ সেইজন্যেই সে-কালের লোক লছমন-ঝোলা পার হলেই নারায়ণ-দর্শনের আশা করতো৷ সে কালে বদ্রীনারায়ণের পথে আরও চার পাঁচটি ঝোলা ছিল বটে ; কিন্তু সেগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট, এই এক লছমন-ঝোলার ভয়েই অনেক লোক সে-পথে যেতে পারতো না৷ এখন চেতলার পুলের মত সর্বত্র টানা পুল হয়েছে৷ লছমন-ঝোলার বর্তমান পুলটি কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনী রায় সুরজমল ঝুনঝুনিওয়ালা বাহাদুর বহু অর্থব্যয়ে প্রস্তুত করেছেন৷ এ পুল পার হ'তে পয়সা দিতে হয় না৷ ১৮৮০ খ্রীষ্টাব্দে এই পুল প্রথম খোলা হয় ; তারপর হতেই বদ্রীনারায়ণের (বদরিকাশ্রমের) যাত্রীর সংখ্যা অনেক বেশি হয়েছে৷

সত্য কথা বলতে কি 'লছমন-ঝোলা' সম্বন্ধে ছেলেবেলা থেকে মনে মনে যে ভয়াবহ-ভাব পোষণ করে রেখেছিলুম, লছমন-ঝোলায় উপস্থিত হয়ে তার কিছুই না দেখে খানিকটা নিরাশ হ'য়ে পড়লুম৷ এখন দু'বছরের ছেলেরা পর্যন্ত মনের আনন্দে খেলা করতে করতে ঝোলা পার হ'তে পারে৷ পূর্ব বীভিষিকা মনে করিয়ে দেবারও কিছু দেখা গেল না; কেবল দেখলাম এ-পারে দু'খানি ও-পারে দু-খানি জীর্ণ কাষ্ঠ-খণ্ড দাঁড়িয়ে তাদের অতীত গৌরবের সাক্ষী দিচ্ছে৷
দোকানগুলি সব দখল হ'য়ে গেছে দেখে আমরা লছমন-ঝোলা পার হয়ে অপর পারে বৃক্ষতলে আশ্রয় গ্রহণ করলুম। পূর্ব কথিত দোকানঘর গুলিতে সাধুর দলের সকলের

স্থান সংকুলান না হওয়ায় তাঁহাদেরও অনেকে এই সমস্ত বৃক্ষতলে আশ্রয় নিয়েছিলেন। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি--প্রথম কয়েক ঘন্টা অন্ধকার; ধুনীর আলোকে অন্ধকার গভীর হ'তে লাগলো। আমরা অন্ধকার নদী-সৈকতে বালুকার উপর এই কম্বলশয্যা খুব শান্তিদায়ক হলো। আমার বোধ হ'ল, আমরা সংসারে নানা রকম বিলাসিতার মধ্যে জোর ক'রে নতুন নতুন অভাবের সৃষ্টি করে নিই; তাই সংসারে আমাদের এত দুঃখ,কষ্ট, পদে পদে ভগ্ন মনোরথের ক্লেশ, ও নৈরাশ্যের যন্ত্রণা।

যা হোক, সে রাত্রে যে রকম শান্তি উপভোগ করতে পারব ঠিক করেছিলুম, আমার অদৃষ্টে তা ঘটে নি। শয়নের প্রায় অর্ধঘন্টা পরে আমি আমার ডান হাতের আঙ্গুলে এক ভয়ানক দংশন-যাতনা অনুভব করলুম। সর্পাঘাত কি রকম জানিনে, কিন্তু আমাকে যে জীবে কামড়েছিল, তার যন্ত্রণা কখন ভুলব না। অনেকে কথায় কথায় সহস্র বৃশ্চিক-দংশনের কথা পেড়ে থাকেন, আমার আজিকার এ দংশন যদি বৃশ্চিক-দংশন হয়, তবে আমি নিঃসন্দেহে ব'লতে পারি, এই একটিই যথেষ্ট; সহস্র দূরে থাক দুইটিরও দরকার হয় না; বেদনার জ্বালায় আমি চীৎকার করে উঠলুম; সঙ্গী 'স্বামীজি' হাতের উপর দু-তিন জায়গায় দৃঢ় করে বাঁধন দিলেন; কিন্তু অতি অল্প সময়ের মধ্যেই তীব্র বিষ সর্বাঙ্গে পরিব্যাপ্ত করে ফেলল, আমার সর্বশরীর অবশ হ'য়ে গেল, নড়বার পর্যন্ত শক্তি রইল না, আমি যাতনায় গভীর আর্তনাদ করতে লাগলুম। দুই চারজন নিকটস্থ সন্ন্যাসী এসে অনেক ঝাড়তে লাগলেন, কিন্তু কিছুমাত্র ফল হ'লো না। আমার সঙ্গী স্বামীজি বড়ই কাতর হ'য়ে পড়লেন; তিনি আমাকে মার মত কোলে ক'রে বস্‌লেন, কিন্তু কি করবেন কিছুই স্থির করতে পারলেন না।

এই রকম প্রায় একঘন্টা কেটে গেল; যাতনা ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে লাগ্‌লো। এমন সময় বুঝি আমাকে রক্ষা করবার জন্যেই ভগবান একজন সন্ন্যাসীকে লছমন-ঝোলা পার ক'রে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি একটু আগে লছমন-ঝোলায় পৌঁছেছিলেন। দু-একজন সাধুর মুখে আমার এই রকম ভয়ানক দংশন-যাতনার কথা শুনে তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে উপস্থিত হ'লেন। তিনি আমাকে যে উপায়ে আরোগ্য করলেন তা অতি আশ্চর্য। আমার যে অঙ্গুলি দষ্ট হ'য়েছিল, সন্ন্যাসী সেই অঙ্গুলি মুখের মধ্যে দিয়ে দষ্টস্থান একটু কামড়িয়ে ধরলেন, বোধ হ'লো আমার শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ-প্রবাহ ছুট্‌ছে। শরীরে যন্ত্রণা আছে তা বুজছি, কিন্তু তার যন্ত্রণা অনুভব করতে পারলুম না। সন্ন্যাসী অল্প একটু কামড়িয়ে আঙ্গুল ছেড়ে দিলেন। ক্লোরোফর্ম্ম কর্‌লে শরীর যেমন ধীরে ধীরে অবসন্ন হ'য়ে পড়ে, আমিও পাঁচসাত মিনিটের মধ্যে সেই রকম অচেতন হ'য়ে পড়লুম।

প্রাতঃকালে সাধুর দলের যাত্রার আয়োজনের গোলমালে নিদ্রাভঙ্গ হ'লো। দেখলুম, আমি স্বামীজির কোলের মধ্যে রয়েছি; তিনি আমাকে কোলে নিয়ে সমস্ত রাত্রি কাটিয়েছেন। বিদেশে পথিপ্রান্তে এই রকম বিপদ অবস্থাতে একজন সন্ন্যাসীর নিকট যে মাতার স্নেহ ও প্রিয়তমের যত্ন পাওয়া যেতে পারে, এ-কথা আমার নিতান্ত অসম্ভব ব'লে মনে হ'ত; কিন্তু এ সংসারে , গৃহহীন পথিকের জন্যেও ভগবানের প্রেম স্বর্গ হ'তে মানবহৃদয়ে নেমে আসে। কৃতজ্ঞতা ও ভক্তির উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষু অশ্রুপূর্ণ হ'লো।

৬ ই মে, শুক্রবার--শরীর অত্যন্ত ক্লান্ত , তবু সকালে উঠে রওনা হওয়া গেল। বার মাইল গিয়ে আর চলবার ক্ষমতা রইল না, তাই 'ফুলবাড়ী' চটিতে সমস্ত দিন কাটান গেল। সন্ধ্যার পূর্বে রওনা হ'য়ে ছয় মাইল রাস্তা চ'লে সন্ধ্যার সময় 'বাগড়ী' চটিতে পৌঁছলুম। উলুবেড়ে থেকে উড়িষ্যার পথের ধারে যেমন সুন্দর সুন্দর চটী ছিল, তাদের সঙ্গে তুলনায় এ সমস্ত চটী কিছুই নয়; বিশেষতঃ গত তিন চার বৎসর গবর্ণমেন্টের আদেশে বদ্রীকাশ্রমে যাত্রী যাওয়া বন্ধ থাকায় সেই সমস্ত পাতার কুটীর একেবারে ভেঙে গেছে। এ বৎসরও যাত্রী যাওয়া বন্ধ থাক্‌বার কথা ছিল; কিন্তু কুম্ভমেলা উপলক্ষে হরিদ্বারে বহু যাত্রীর সমাগম হওয়ায় অল্প কয়েকদিন হ'ল যাত্রী যাওয়ার হুকুম হ'য়েছে; কিন্তু ভগ্ন চটীগুলি মেরামত হ'য়ে ওঠেনি এবং সেগুলিতে আজও দোকান বসে নি। আমরা দ্বিতীয় যাত্রী দল, আমাদের পূর্বে একদল মাত্র যাত্রী গিয়েছে। 'বাগড়ী' চটিতে পৌঁছে দেখি সেই পূর্বদিনের উদাসী সাধুর দল সেখানে দিনের জন্যে আড্ডা গেড়েছেন। একখানি মাত্র পাতার ঘর প্রস্তুত হ'য়েছে, আর তাতেই সামান্য জিনিসপত্রের দোকান ব'সেছে। বলা বাহুল্য, সে দোকানে যা কিছু জিনিস ছিল তা সেই দুইশত সাধুর পক্ষেই নিতান্ত অল্প; আমরা দেখলুম দোকানদারের কাছে আর ক্রয়োপযোগী কোন জিনিসই নেই।

এখানে সেই সাধুদের একটু পরিচয় দিই। এদের বড় বড় দল আছে এবং একজন দলপতি আছেন। তাঁর আদেশানুসারে দলস্থ লোক ভিন্ন ভিন্ন দলে বিভক্ত হ'য়ে নানা তীর্থপর্যটনে বাহির হয়; কাশীতে, নর্মদাতীরে এবং অমৃতসরে ও আরও অনেক স্থানে এই সাধুদের অনেক বড় বড় মঠ আছে। মঠে অগাধ সম্পত্তি; হাতী ঘোড়া প্রভৃতিও অনেক। যে দলের সঙ্গে আজ আমাদের দেখা হ'লো, তাদের মধ্যে একজনকে প্রধান ক'রে এরা ভ্রমণে বাহির হয়েছে। এদের সঙ্গে অনেক লোকজন আছে, বড় বড় পিতলের হাঁড়ী প্রভৃতিও সঙ্গে দেখলুম। এরা যেখানে উপস্থিত হয়, সে সময়ে সেখানে অন্যান্য যে সমস্ত লোক থাকে তাদের সকলকেই সযত্নে আহার করায়; এমন কি বাইরের লোকের খাওয়া না হলে এরা জলস্পর্শও করে না। এদের কোন রকম বদখেয়াল দেখলুম না; সকলেই সন্ন্যাসী এবং সকলেরই মাথায় বেণী-ভাঙান চুল। এরা অত্যন্ত কষ্টসহিষ্ণু; সঙ্গে 'গ্রন্থসাহেব' আছেন; তাঁর রীতিমত পূজা আরতি ও স্তবপাঠ হয়; তা ছাড়া এরা বিশেষ কোন ধর্ম্মালোচনায় যে সময়ক্ষেপ করে তা নয়; দু একজন ধর্ম্মপিপাসু সাধু ব্যক্তি আছেন; কিন্তু এদের অধিকাংশ লোকই খুব আমোদপ্রিয়; এমন কি দেখলুম, দুই তিন দল তাস ও দাবা খেলা আরম্ভ ক'রে দিয়েছে।

আমরা এদের কাছে আসবামাত্র এরা খুব যত্নের সহিত আমাদের অভ্যর্থনা করল; কোন রকমে আতিথ্য-সৎকারও সম্পন্ন হ'লো। তার পর সেই অনাবৃত আকাশতলে - প্রকৃতির রত্নখচিত নীল চন্দ্রাতপের নীচে শয়ন করা গেল। এদের একজন আমাকে বাঙ্গালী দেখে বাঙ্গালা ভাষায় আমার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলেন। তাঁর বয়স এখনও ত্রিশ হয় নি। অতি বিনয়ী, শাস্ত্রজ্ঞানও বেশ আছে বলে বোধ হ'লো। ইনি বাঙ্গালী, কিন্তু বাড়ী কোথায় তা প্রকাশ করলেন না; তবে জানতে পারলুম, এগার বৎসর বয়সের সময় মাত্র ইনি এই সাধুর দলে প্রবেশ করেছেন; এবং এই দলের মধ্যে থেকেই শাস্ত্রাদি অধ্যয়ন করেছেন । অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত তাঁর সঙ্গে খানিক বাঙ্গালা ভাষায় খানিক হিন্দীতে

অনেক তর্কবিতর্ক হ'লো; কিন্তু শেষে তর্কের যে রকম মীমাংসা চিরকাল হ'য়ে থাকে তাই হ'লো; অর্থাৎ কোন মীমাংসাই হ'লো না। তবু বুঝলুম লোকটি প্রকৃতই ধর্ম্মপিপাসু। বেশ আনন্দে রাত্রি কেটে গেল। শেষ রাত্রিতে জেগে দেখি, গায়ের উপর ঝুপঝাপ ক'রে বৃষ্টি পড়ছে, আর খোলা মাঠে শোঁ শোঁ ক'রে বাতাসের শব্দ হচ্চে; কিন্তু তখন আর কি উপায় করা যাবে; কম্বল মুড়ি দেওয়া গেল। এই সমস্ত কষ্ট ও অসুবিধা স্বীকারে প্রস্তুত হ'য়েই ত বাহির হ'য়েছি।

৯ ই মে, শনিবার--সকালে সম্মুখেই একটা প্রকাণ্ড চড়াই দেখলুম। ক্রমাগত ছ'মাইল উপরে উঠতে হলো। দিনকতক আগে আধমাইল উপরে উঠতে গেলেই গলদ্‌ঘর্ম হয়ে পড়তুম, কিন্তু আজ দৃঢ়চিত্তে ছয় মাইল উঠলুম। বেলা প্রায় এগারটার সময় আমাদের চড়াই শেষ হয়ে গেল। এই ছ'মাইলের মধ্যে একটিও চটি নেই; স্থানে স্থানে পর্বতের গায়ে দুএকখানি ছোট ছোট কুঁড়ে ঘর; দু'ক ঘর গৃহস্থ শান্তভাবে জীবনযাত্রা নির্বাহ করছে। ছয় মাইল উঠবার সময় মনে হয়েছিল নামা সহজ; কিন্তু নামবার সময়ও দেখা গেল, কষ্ট বড় কম নয়। যা হোক, অনেক কষ্টে নেমে একটা চটিতে উপস্থিত হলুম।

চটিতে একখানা ঘর, আর তাতে সেই ২০০ সাধু। দোকানে যা কিছু খাবার জিনিসপত্র ছিল, তা তারাই আত্মসাৎ করেছে। দুপ্রহর রৌদ্রে একটু ছায়া পর্যন্তও মিললো না; যে তিন চারটে বড় গাছ ছিল, তার তলাতেও সাধুরা আড্ডা ফেলেছে। রৌদ্রের মধ্যে কিছুক্ষণ কষ্ট পেয়ে শেষে সেখান থেকে বাহির হলুম। আমরা সংকল্প করলুম যে এরকম করে চলবো যে, হয় এই সাধুদের আগে থাকবো, না হয় খানিক পাছে থাকবো; সঙ্গে সঙ্গে আর যাচ্ছিনে। এদের সঙ্গে এক চটিতে বাস আর অনাহার ও রৌদ্রবৃষ্টি সহ্য করা একই কথা। তাই সেদিন এত কষ্টের পরে রৌদ্রের মধ্যে আবার হাঁটতে লাগলুম। কিন্তু এ-দিন যে কার মুখ দেখে উঠেছিলুম, তা বলতে পারিনে। অল্প একটু যেতে না যেতেই ভয়ানক মেঘ ও ঝড় উঠলো। বোধ হলো পাহাড়ের গা হতে আমাদের উড়িয়ে ফেলে দেয় আর কি। সৌভাগ্যের বিষয় বৃষ্টি হলো না। সেই বৃষ্টিহীন ঝড়ের মধ্যে ''মহাদেবচটি''তে এসে উপস্থিত হলাম। এখানে একজন বৃদ্ধ বাঙালী বসে ছিল; সে বড়ই দরিদ্র। আমরা তাকে পেয়ে যতদূর সুখী না হই, সে আমাদের পেয়ে খুবই সুখী হলো। সমস্ত দিন কষ্টের পর সন্ধ্যার সময় আশ্রয় পাওয়া গেল। আশ্রয় শুনে কেউ মনে করবেন না, বেশ চারিদিকে আঁটা সুন্দর ঘর। এ ঘর বটে, কিন্তু গাছের পাতা ডাল দিয়ে ছাওয়া; চারিদিকে দেওয়াল কি বেড়া কিছুই নেই। দোকানদার তারই একপাশে যেখানে তার দোকান সাজিয়ে রেখেছে, সেইখানটুকু একটু শক্ত করে ঘিরে নিয়েছে। দোকানে পনেরো ষোল সের আটা, তিন চার সের ঘি, লবণ, লঙ্কা আর কড়াইয়ের ডাল। এমন কি, তার দোকানে খানিকটে গুড় পর্যন্ত বিক্রি হয়। কিন্তু এ জিনিস শুধু পনেরো জন সাধুর খোরাক; তবে দোকানদার ভরসা দিলে, শীঘ্রই সে বড় রকম দোকান খুলবে।

যা হোক, দোকানদারদের সঙ্গে পরিচয় হলো; সে আমার একটি ছাত্রের পিতা। আমাদের পরিচয় পেয়ে সে আমাদের একটু বেশী খাতির করলে, এমন কি তার নিজের খাবার জন্যে সঞ্চিত দধিটুকু পর্যন্ত এনে আমাদের দিলে। অন্য সময় হলে আমরা সেই দধি স্পর্শ করতুম কিনা সন্দেহ, কিন্তু সেদিন পশ্চিমের মিষ্টান্ন অপেক্ষা সেই দইটুকু

আমাদের নিকট পরম উপাদেয় বোধ হলো। রাত্রিতে সেই বৃদ্ধ বাঙালী–প্রবাসী মনের আনন্দে গান করলে; বহুদিন পরে বৃদ্ধের মুখে–––
''আয় মা সাধন–সমরে, দেখি মা হারে কি পুত্র হারে'' ।
গান শুনে বড়ই আনন্দ বোধ হলো; আমিও দুর্বল কণ্ঠে প্রাণ খুলে কবিবর রবীন্দ্রনাথের প্রাণস্পর্শী মহাসঙ্গীত গাইতে লাগলুম ––

> ''মহাসিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপতি।
> তোমারি রচিত ছন্দে মহান্‌ বিশ্বের গীত।
> মর্ত্যের মৃত্তিকা হয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লয়ে,
> আমিও দুয়ারে তব হয়েছি হে উপনীত।
> কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
> তোমারে শোনাব গীত, এসেছি তাহার লাগি ;
> গাহে যেথা রবিশশী, সেই সভা–মাঝে বসি,
> একান্ত গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত।''

গাইতে গাইতে মনে পড়ল একদিন বাঙলাদেশে আমার ক্ষুদ্র কুটীরে আমার স্ত্রী এই গানটি আমার সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গেয়েছিলেন। আজ এই দূরদেশে এ–রকম ভাবে আবার এই গান গাইব, তা কি সেদিন স্বপ্নেও ভেবেছিলুম? এখন কোথায় তিনি, কোথায় আমি ? হঠাৎ অত্যন্ত চাঞ্চল্যে মন ভরে উঠলো। এই হিমালয়, এই নিস্তব্ধতা, এই শান্তি, সব ব্যর্থ মনে হলো। অনেক বিলম্বে মনকে আবার সংযত করে আনলুম।

দেবপ্রয়াগ– পথে

১০ ই মে,রবিবার–– পশ্চিম দেশে থাকতে গেলে অনেকেই একটু–আধটু চা খাওয়া অভ্যাস করেন; দুর্ভাগ্যবশতঃ আমারও সে অভ্যাসটা ছিল; এবং সব ছেড়ে এসে এখনও মধ্যে মধ্যে সকালবেলা একটু চা পানের প্রবৃত্তি বলবতী হয়ে উঠে। তাই আজ ভোরে এই 'মহাদেব' চটিতে একটু চায়ের যোগাড় করা গিয়েছিল। দোকানদার বেচারা তার ঝুলি ঝেড়ে চা সংগ্রহ করে আমাদের জন্যে প্রস্তুত করলে–তাতে খানিক বিলম্ব হয়ে গেল। স্বামীজি ত চটেই লাল। তিনি বললেন, যার এত হাঙ্গামা, তার আবার তীর্থভ্রমণে বাহির হওয়ার সখ কেন? – কিন্তু শর্করা–সংযুক্ত চায়ের সঙ্গে তাঁর ভর্ৎসনাটা বেশ সহজে পরিপাক করে বাহির হওয়া গেল। বিগত কল্য আমাদের সঙ্গে যে বাঙালীটি জুটেছিলেন, তিনি তাঁর সঙ্গীদের জন্যে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগলেন। তাঁকে আমাদের সঙ্গে নেবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করা গেল, কিন্তু পূর্ব সঙ্গীদের ছেড়ে আমাদের সঙ্গ নিতে তিনি একদম গররাজী।
আমরা সে–বেলা ছয় মাইল হেঁটে প্রায় এগারটার সময়, 'কান্তি' চটিতে উপস্থিত হলুম ; কিন্তু যাদের ভয়ে আগের দিন একটু এগিয়ে এসেছিলুম, আজ দেখি তারা সকলে আমাদের পিছনে ফেলে এই চটিতেই এসে আশ্রয় নিয়েছে। এত বেলায় এই রৌদ্রের মধ্যে আর যাই কোথায়? সেখানেই কোনরকমে কাটাতে হলো। কিন্তু রৌদ্রে বড়ই কষ্ট পাওয়া গেল; তার উপর কিছু আহারেরও যোগাড় হলো না। তখন সকালের সেই 'চা' এর লোভের জন্যে মনে বড় অনুতাপ উপস্থিত হলো; সন্ন্যাসী মহাশয় ভারি খুসী।

এইখানে আর একজন বাঙালী যুবক-সন্ন্যাসী আমাদের সঙ্গী হলেন। এঁর একটু পরিচয় দেওয়া দরকার। ইনি ঢাকা অঞ্চলের লোক, বৈদিক ব্রাহ্মণের ছেলে ইংরেজী জানেন না, কিন্তু বেশ সংস্কৃত জানেন। প্রথমে কলিকাতার সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজে যোগ দেন এবং উপবীত ত্যাগ করেন, তারপর এঁর মাথায় কি একটা খেয়াল চাপে। কলিকাতায় থাকতেই তিন মাসের জন্য মৌনব্রত অবলম্বন করেন; তখন নাকি ইনি শ্লেট হাতে করে বেড়াতেন এবং বক্তব্য বিষয় শ্লেটে লিখে দেখাতেন। মনে সব কথাই আসছে, কিন্তু তা মুখ-ফুটে না বলার মধ্যে যে কি পুণ্য লুকানো আছে, তা আমার বুদ্ধির অগম্য। বোধ করি এর কোন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা আছে; কিন্তু মুখ বুঝে থাকা অসহ্য, হাজার হাজার কথা এক সঙ্গে পেটের মধ্যে জমা হয়ে বের হবার জন্যে ক্রমাগত ঠেলাঠেলি কচ্ছে, কিন্তু বের হতে না পেরে পেটের ভিতর ভয়ানক একটা অরাজকতা উপস্থিত করছে – এ বড়ই মুস্কিলের কথা। যা হোক তিনি সে পরীক্ষা হতে উত্তীর্ণ হয়ে কাশীতে আছেন এবং সেখানে এক গুরুর কাছে 'দণ্ড' ধারণ করে সন্ন্যাসী হন। কিন্তু এরকম মানুষের কোনটাই বেশী দিন পোষায় না। দণ্ডীদের অনেক কঠোরতা করতে হয়। তাদের শূদ্রের বাড়ীতে যেতে নেই, তাদের শূদ্র গৃহস্থের বাড়ীতে ভিক্ষা নিতে নেই, এমন কি শূদ্রের সঙ্গে বসাও নিষেধ। ব্রাহ্মণগৃহেও এক বেলার বেশী অতিথি হওয়ার নিয়ম নেই। পূজা অর্চনা যথারীতি করতে হয়; তাছাড়া দণ্ডখানি চব্বিশ ঘন্টার মধ্যে কাছ-ছাড়া করবার যো নেই। দণ্ডী-শ্রেণীতে এমনি করে শিক্ষানবিশী শেষ হলে কয়েক বৎসর পর গুরুর আদেশে দণ্ড ত্যাগ করে পরমহংস শ্রেণীতে প্রবেশ করতে পাওয়া যায়। প্রকৃত "পরমহংস" হওয়া সকলের ভাগ্যে ঘটে না, কিন্তু সব দণ্ডীই দণ্ডত্যাগ করে পরমহংসত্ব লাভ করেন। ব্রাহ্মণ ছাড়া কেহ দণ্ডী হতে পারেন না। আমাদের দেশে উপবীত গ্রহণ যেমন, দণ্ডগ্রহণও অনেকটা তাই। উপবীতের সময় ব্রাহ্মণ সন্তান যেমন তিনদিন ঘরের মধ্যে বসে ফলমূলের ও গৃহসামগ্রীর সর্বনাশ করে এবং মা-বাপের মহাত্রাস জন্মিয়ে শেষে একেবারে ব্রহ্মণ্য-তেজে পরিপূর্ণ হয়ে বাহির হন, এঁরাও তেমনি দণ্ড গ্রহণ করে দুচার মাস বাঁধাবাঁধির মধ্যে বাস করেন; তার পর দণ্ডখানি জলে ভাসিয়ে পরমহংস হন ও অভিমানের বোঝা ভারী করেন।

আমাদের এই নূতন সঙ্গী সন্ন্যাসীও দণ্ড ত্যাগ করেছেন, কিন্তু পরমহংসশ্রেণীতে 'প্রমোশন' পাওয়ার আগেই কোন কারণে গুরুর উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে দণ্ডখানি জলে ফেলে দিয়েছেন; সুতরাং এখন তাঁর অবস্থা "না তাঁতী না বৈষ্ণব" । সন্ন্যাসীর পরিধানে গৈরিক বসন। সঙ্গে একটি কাঠের কমণ্ডুল, আর দু-তিনখানা বেদান্তদর্শন। লোকটা ঘোর বৈদান্তিক। দাম্ভিকশ্রেণীকে আমার বিশেষ ভয়; কিন্তু এই জঙ্গলে এই বৈদান্তিককে পেয়ে মনে বড়ই আনন্দ হলো। লোকটা বেশ সরল প্রকৃতির, তবে বেদান্তের দোষেই হোক, কি নিজের অদৃষ্টের দোষেই হোক, তার দয়ামায়া কিছু কম বলে মনে হল। তা না হলে আর মা বাপ, স্ত্রী সব ছেড়ে এই ভবঘুরে বৃত্তি অবলম্বন করেছে? ভগবান জানেন তার মনে কতটুকু শান্তি আছে; কিন্তু তাকে ত সন্ধ্যা আহ্নিক পূজা-অর্চনা, ঠাকুর-দেবতাদের প্রণাম প্রভৃতি কিছুই করতে দেখিনি ; উপরন্তু সে কথা বলতে গেলে মহা তর্কজাল বিস্তার করে সব 'নস্যাৎ' করে দেয়। রাস্তাঘাটে এমন তার্কিক লোক একটা সঙ্গে থাকলে আর কিছু না হ'ক পথশ্রম অনেক কমে আসে। বাবাজীর এখনকার নাম অচ্যুতানন্দ সরস্বতী। বঙ্কিমবাবুর 'আনন্দমঠে' সবই আনন্দ, আর রাস্তা-ঘাটের

সন্ন্যাসীদের নামেও অধিকাংশই আনন্দ। নামে আনন্দ আছে বটে, কিন্তু তা তার কতটুকু ভোগে লাগে, সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ; শুধু চিনির বলদের মত আনন্দের বোঝা ঘাড়ে করে বেড়ান মাত্র।

'কান্তি' চটির সম্মুখেই একটা ছোট গ্রাম। সেই গ্রামে সেদিন একটা বিবাহ। ঢোল বাজছিল; আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা ভাল কাপড়-চোপড় পরে, হাত-ধরাধরি ক'রে নেচে বেড়াচ্ছিল; মুখ ভাবনাশূণ্য এবং চক্ষু অত্যন্ত উজ্জ্বল ও চঞ্চল। সন্ধ্যার সময় দূরের এক গ্রাম থেকে বর আস্‌বে। দেখলুম, মেয়েমহলের ভারি উৎসাহ লেগে গেছে; তারা ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে নানারকম আয়োজন ক'রছে।
চটিতে জায়গা পাওয়া গেল না।, দূরে একটা বড় সেওড়াগাছের ছায়ায় ব'সে একলা এই দৃশ্য দেখতে লাগলুম। আমার সঙ্গীদ্বয় তখন নিদ্রায় মগ্ন, আমার চক্ষে আর ঘুম এল না। আমি এই আনন্দের ছবির দিকে চেয়ে থাকলুম। একবার ইচ্ছা হ'ল আজ রাত্রে এখানেই থেকে এদের বিবাহের উৎসব দেখে যাই, কিন্তু উদাসীন সাধুর দল আজ এখানে থাকলে আমাদের রাত্রিতেও অনাহার, কাজেই বিকেলে চারটের সময় বের হ'য়ে পড়া গেল।

খানিকপথ এসেই মুষলধারে বৃষ্টি আরম্ভ হ'লো। নিকটে গ্রামও নেই কোনও পর্বতগহ্বরও নেই। আরও কষ্টের কারণ এই হ'লো যে, বৃষ্টির সঙ্গে এমন ঝড় বইতে লাগলো যে, প্রতি মুহূর্তেই নীচে প'ড়ে যাবার সম্ভাবনা দেখা গেল। আমাদের বাঁয়ে পর্বতের মধ্যে গঙ্গা। আমরা যেখান দিয়ে যাচ্ছিলুম, সেখান হ'তে যদি কোনরকমে একবার হাত-পা ছেড়ে দেওয়া যায় ত একেবারে পাঁচছয়শত ফিট নীচে গঙ্গার জলে দেহখানি নয়, - কখানা ভাঙা হাড় মাত্র, পড়তে পারে। আমার হাতে সেই সাড়ে চার হাত পার্বতীয় লাঠি, তারি উপরে ভর রেখে বহু কষ্টে কাপড় ও উত্তরীয় কম্বল ভিজাতে ভিজাতে একটা জায়গায় উপস্থিত হলুম। তখনও সমান তেজে বৃষ্টি ও ঝড় হচ্ছে। সেখান হ'তে পাঁচশ ফিট নীচে নাম্‌তে হবে; রাস্তা একরকম নেই বল্লেই হয়। পূর্বের রাস্তাটি ভেঙে গেছে, এখনও মেরামত হয় নি - সামান্য 'পাকদণ্ডি' আছে মাত্র। রাস্তা সংক্ষেপ করবার জন্য বলবান পাহাড়ীরা এড়োএড়ি যে সমস্ত ভয়ানক পথে কখনো বা গাছের ডাল ধ'রে, কখনো বা পাথরে পা আটকিয়ে, কখন কখন এক পাথর থেকে লাফ দিয়ে আর একটা সম্মুখের পাথরে চ'ড়ে যাতায়াত করে - তারি নাম 'পাকদণ্ডি। একে ঝড়বৃষ্টি, তাতে এই রকমের পথ, তার উপর আবার নীচে নাম্‌তে হবে; বেলাও বেশি নেই, সুতরং আমরা যে মহা ভাবনায় প'ড়ে গেলুম, তা বলা বাহুল্য মাত্র। তবে এইমাত্র বলতে পারি যে, সহস্রধারা দেখতে যাওয়ার সময়ের আমি ও আজ্‌কের আমিতে তফাৎ বিস্তর। পাঠকমহাশয় হয় ত আমার এই গর্বাতিশয্যে কিঞ্চিৎ বিরক্তি প্রকাশ করবেন; কিন্তু বাস্তবিক বলতে কি, সে সময় পশ্চিম দেশে আমার প্রথম আসা; তার পর তিন বৎসর ধরে পাহাড়ে চলাফেরা করতে করতে এখন শক্ত-সমর্থ হয়েছি; নতুবা এই পা দুখানার উপর কখন এত বিশ্বাসস্থাপন করতে পারতুম না। দাঁড়িয়ে ভেজার চেয়ে পথ চলতে চলতে ভিজলে কষ্ট কম হবে, মনে করে তিন জনে অতি ধীরে ধীরে, কখন বসে, কখন গছের গুঁড়ি ধরে নামতে লাগলুম; এবং এক-একবার জোরে বাতাস এসে আমাদের বিষম ব্যতিব্যস্ত করে তুলতে লাগলো।

ধীরে ধীরে নেমে অনেকক্ষণ পরে একটা পুলের ধারে এলুম। এ পুলটি রামগঙ্গার উপরে। একটি ছোট নদী গঙ্গায় পড়েছে। এই নদীর নামই ব্যাসগঙ্গা। আমরা বরাবর গঙ্গাকে বাঁয়ে রেখে চলেছি , অর্থাৎ গঙ্গা দক্ষিণমুখো চলেছে, আর আমরা উত্তরমুখো চলেছি লছমন-ঝোলা হতে গঙ্গা পার হয়ে, বরাবর গঙ্গা বাঁয়ে রেখে চলতে চলতে এই নদী আমাদের পথরোধ করল। ব্যাসগঙ্গাও হিমালয় থেকেই বাহির হয়ে কতকটা দক্ষিণদিকে এসে শেষে পশ্চিমমুখো হয়ে গঙ্গায় পড়েছে। এখানে ইংরেজ-বাহাদুর একটা ছোট টানা-সাঁকো তৈয়ারী করে দিয়েছেন; সাঁকোটা চল্লিশ হাতের বেশি হবে না। সাঁকো খুব ছোট করতে হয়েছে বলে এত নীচে তৈয়ার করান হয়েছে, এ জন্যে উপরের রাস্তা থেকে আমাদের প্রায় পঁচিশ ফিট নীচে নেমে আসতে হয়েছিল। সাঁকোর প্রায় দেড়শ-দুইশ হাত সম্মুখে ব্যাসগঙ্গা গঙ্গায় পড়েছে।

এখানে একটা চটি আছে, তার নাম ''ব্যাসচটি''। এ চটি একেবারে জলের ধারে। নিকটে অনেকদিনের পুরাণো ভগ্নপ্রায় দুটো মন্দির আছে। সেখানকার লোকে বলে, ঐ মন্দিরের সম্মুখে ব্যাসদেব অনেক দিন তপস্যা করেছিলেন। যেখানে বড় মন্দিরটি আছে সে জায়গাটি বড় সুন্দর। নীচেই নদী, ওপারে ছোট বড় অনেক গাছের সার। গাছগুলো বাতাসে দুলছে, আর তাদের চঞ্চল ছায়া নদীর নির্মল জলে সর্বদাই কাঁপচে। কিন্তু গাছের শোভার চেয়ে ময়ূরের শোভাই বেশি। ওপারের গাছগুলিতে ময়ূরের পাল। একটু আগে বৃষ্টি হয়ে গেছে, এখনও আকাশে বেশ মেঘ আছে। দলে দলে ময়ূর পুচ্ছ খুলে যে কি সুন্দর নৃত্য আরম্ভ করেছে তার আর কি বলবো? তাদের ডাকে সেই বনভূমি ও নিস্তব্ধ নদীতীর প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। একটা দোকানে বসে এই দৃশ্য দেখতে দেখতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। কবির কথা এখন আমার মনে আসতে লাগলো -

''সেই কদম্বের মূল যমুনার তীর,
সেই সে শিখীর নৃত্য
এখনও ভরিছে চিত্ত
ফেলিছে বিরহ-ছায়া শ্রাবণ তিমির।''

কিন্তু এ যে বৈশাখ। - তা হলেও বৈশাখের বৈকালে মধ্যে মধ্যে শ্রাবণের ঘনঘটা চোখে পড়ে যায়।

এখানে নদীর ধারে কয়েকখানা দোকান আছে। অন্যান্য চটির চেয়ে ব্যাসচটিতে দোকানের সংখ্যা কিছু বেশী, এবং তাদের অবস্থাও ভাল; কারণ শ্রীনগর থেকে এদিক দিয়ে ব্যাসগঙ্গার ধারে ধারে নাজিমাবাদের রাস্তা, আর এই রাস্তায় অনেক লোকজন চলে। ভিজে কাপড় কোন রকমে শুকিয়ে এখানেই রাত্রি কাটান গেল, এবং যতক্ষণ নিদ্রা না এল, অচ্যুতানন্দ বাবাজির সঙ্গে আধিভৌতিক ও আধিদৈবিক তত্ত্ব নিয়ে অন্যের দুর্বোধ্য বাঙলায় কথাবার্তা কওয়া গেল।

১১ ই মে, সোমবার - সকালে উঠে তাড়াতাড়ি বের হলুম, কারণ এখানে যে দুটি মন্দির আছে, কাল সন্ধ্যার সময় তা আর দেখা হয় নাই। মন্দির-দুটি পাথরের ; দেখলে অনেক দিনের বলে মনে হয়; আর তা এমন জীর্ণ হয়ে পড়েছে যে, বোধ হয় আর দু-তিন

বছরের মধ্যেই ভেঙে একেবারে ভূমিসাৎ হবে। এই সমস্ত প্রাচীন মন্দির রক্ষা করবার জন্য চেষ্টা হওয়া উচিত। মন্দির-দুটির পুরোহিত একজন। মন্দিরের মধ্যে দেখলুম, কতকগুলি সিন্দূরমাখান পাথর, আর দুটি অস্পষ্টাকৃতি দেব-দেবীর মূর্তি। প্রত্যহ পূজা করা দূরে থাক, পুরুত ঠাকুর যে প্রত্যহ মন্দিরের দ্বারও খোলেন না, তা মন্দিরের ভেতরের চেহারা দেখলেই বেশ বোঝা যায়। তবে যাত্রীদল সে পথে যেতে আরম্ভ করলে তিনি মন্দির একটু পরিষ্কার রাখেন; আর মন্দিরের বাহিরের এক প্রস্তরখণ্ড ব্যাসের আসন বলে যাত্রীদের দেখিয়ে তাদের ভক্তি এবং সঙ্গে সঙ্গে কিঞ্চিৎ অর্থ আকর্ষণ করে থাকেন। স্থানটি দেখে যে খুব ভক্তির উদয় হয়, তার আর সন্দেহ নেই; কিন্তু প্রতি পদে যদি বিনা বাক্যব্যয়ে এই রকম করে 'নজ'˝ দিতে হয়, তা হলে বদ্রীকাশ্রম পৌঁছিবার বহু পূর্বেই রাস্তার মধ্যে দেউলে হয়ে আমাদের দেশে ফিরতে হবে।

আজ আমরা দেবপ্রয়াগে পৌঁছব। আজ অক্ষয়তৃতীয়া, বদ্রীকাশ্রম বদ্রীনারায়ণের মন্দির আজই খোলা হবে। আমাদের ইচ্ছা ছিল, আর দু'চার দিন আগে বের হয়ে অক্ষয়তৃতীয়ার দিন বদ্রীকাশ্রমে পৌঁছি। কিন্তু তা হয় নি, কাজেই এখন তাড়াতাড়ি পথ চলতে আরম্ভ করেছি। আমরা স্থির করেছি, যেমন করেই হোক আজ দেবপ্রয়াগে পৌঁছিব। কিন্তু এত তাড়াতাড়ি করার জন্য যে শেষে খুব নাকাল হতে হবে, তা কে জানতো? সে কথা পরে বলছি।

অনেক দূরে আসার পর তিন চার দল পাণ্ডা এসে আমাদের আক্রমণ করলো। এরা দেবপ্রয়াগ থেকে খানিক রাস্তা এগিয়ে এসে যাত্রী ধরবার জন্য বসে থাকে। আমাকে নিয়ে মহা পীড়াপীড়ি। আমি তাদের বুঝিয়ে দিলুম যে, আমার পাণ্ডার কোন দরকার নেই; তবে যদি নিতান্তই দরকার হয়, তা হ'লে যে আমাকে প্রথম বলেছে, তাকেই পাণ্ডা করবো। এই কথায় আশ্বাস পেয়ে একজন আমার সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলো। যতগুলি পাণ্ডা দেখলুম, তার মধ্যে এর বয়স কম, বেশভূষার পরিপাট্যও বেশি। গলায় সোনার হার, হাতে সোনার তাগা, কাঁকালে সোনার গোট, কানে বীরবৌলী। তার নাম লক্ষ্মীনারায়ণ, বয়স ত্রিশ বত্রিশ বৎসর।

আমরা দেবপ্রয়াগে পৌঁছে বাজারে একটা দোতলার উপর বাসা নিলুম। বাজারে কোঠাবাড়ী আছে, কিন্তু ছাতে অনেকগুলি দোকান; জিনিসপত্রও মোটামুটি সবই পাওয়া যায়। পাণ্ডাদের জ্বালাতন হতে উদ্ধার হয়ে দোকান ঠিক করে স্থির হয়ে বসতে আমাদের প্রায় একঘন্টা লাগলো। বাসা করা হলে আমাদের সঙ্গী বৃদ্ধ স্বামীজি তাঁর ব্যাঘ্রচর্ম বিছাতে গিয়ে দেখেন - ব্যাঘ্রচর্ম নেই। এই ব্যাঘ্রচর্মটি তিনি ভাল করে বেঁধে কোরিয়ার ব্যাগের মত পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে চলাফেরা করেন। তাঁর ব্যাঘ্রচর্মখানি যাওয়াতে তাঁর কিঞ্চিৎ দঃুখ হলো বটে, কিন্তু আমার একেবারে চক্ষুস্থির।

দেরাদুন থেকে বের হবার সময় কিছু টাকা সঙ্গে নিয়ে বের হয়েছিলুম। রাস্তায় নোট ভাঙানর সুবিধা হবে না; কাজেই যা কিছু অর্থ নিয়েছিলুম, তা সবই নগদ টাকা; আর সিকি, দুয়ানি, আধুলি। সঙ্গে ট্রাঙ্ক কি ব্যাগ প্রভৃতি কিছু নেই। এতগুলি টাকা রাখি কোথায়? - তাই বন্ধুবান্ধববর্গের সুপরামর্শ মত মোটা জীনের হাত তিনেক লম্বা ও দু আঙুল কি আড়াই আঙুল চওড়া এক থলি কিনেছিলুম; তার মধ্যে টাকাকড়ি রেখে সেটা

কোমরে জড়িয়ে রাখতে হ'তা যেদিন রওনা হই, সেদিন সেইরকমই করেছিলুম; - কিন্তু চলবার সময় সেটাতে বড় অসুবিধা বোধ হ'তে লাগলো৷ তাই স্বামীজির পরামর্শমত সেটা তাঁর ব্যাঘ্রচর্মের সঙ্গে জড়িয়ে দুই পাশে মোটা দড়ি দিয়ে শক্ত ক'রে বেঁধে দিলুম৷ ঐভাবে গত কয়দিন চ'লে এসেছো আজ খুব শীঘ্র চলতে হবে ঠিক করে সকলেই ভারি তাড়াতাড়ি লাগিয়েছিলেন; কিন্তু খানিক রাস্তা তাড়াতাড়ি চললেই ক্লান্ত হয়ে পড়তে হয়৷ এই জন্যেই আমাদের রাস্তায় দু-তিন জায়গায় বসতে হ'য়েছিল৷ একটা জায়গায় ব'সে স্বামীজি তাঁর স্কন্ধ থেকে ব্যাঘ্রচর্মটা একবার নামিয়েছিলেন - কিন্তু উঠবার সময় তা পুনর্বার স্বস্থানে স্থাপন করবার কথা ভুলে গিয়েছিলেন, - তার মধ্যে পয়সাকড়ি সব, সঙ্গে কিছু নেই বললেই হয়৷ স্বামীজি প্রথমে বললেন, তিনি কখনও সেটা রাস্তায় ফেলে আসেন নি; দেবপ্রয়াগে পৌঁছিবার পর পাণ্ডা বেটারাই কেউ হাতিয়েছো তিনি আরও বললেন, যে, এখানে পাণ্ডাদের যে রকম উপদ্রব, তাতে তারা গলায় ছুরি না দিয়ে যে ব্যাঘ্রচর্ম কেড়ে নিয়েই ক্ষান্ত হয়েছে, এই আমাদের ঢের পুণ্যের কথা৷ আমি হতাশ ভাবে বললুম ''র ব্যাঘচর্ম! আপনারা শুধু ব্যাঘ্রচর্ম গেছে মনে ক'রেই পুণ্যের কথা বলছেন , আমার যে যথাসর্বস্ব গেছে ; এর চেয়ে গলায় ছুরি দেওয়া ত অনেক ভাল ছিল''। আমার মন কি রকম খারাপ হ'লো, তা আর কহতব্য নয়৷ কিন্তু যাকে পাণ্ডাস্থির করবো বলে আশ্বাস দিয়েছিলুম, সে বললে, আমরা বাজারের মধ্যে বসিনি, আর পাণ্ডাদের দ্বারাও এরকম কাজ হয়নি৷ আমরা নিশ্চয়ই সেটা রাস্তায় কোথাও ফেলে এসেছি৷

বাদানুবাদে প্রায় পনের মিনিট কেটে গেল৷ শেষে সেই পাণ্ডা প্রস্তাব করলে যে, রাস্তায় আমরা যেখানে যেখানে বসেছিলুম , সেই সমস্ত জায়গা সে নিজে ও তার সঙ্গে অচ্যুতানন্দ বাবাজি গিয়ে খোঁজ করে আসবো কিন্তু তাতে যে কিছু ফল হবে, আমি একবারও সে আশা করিনি৷ মাথায় হাত দিয়ে ব'সে আকাশ পাতাল ভাবতে লাগলুম৷ এই পাহাড়ের মধ্যে বন্ধুহীন দেশে কি রকম করে দিন কাটবে ? এক উপায় আছে, - ভিক্ষা ; কিন্তু এ পাহাড়ের মধ্যে কে কয়দিন ভিক্ষা দেবে? তবে আর একরকম সভ্যতাসঙ্গত ভিক্ষা আছে, আতিথ্য স্বীকার করা; এতে কতক অভ্যাস আছে বটে; কিন্তু এ বছর দুর্ভিক্ষের প্রকোপ থাকায় - পাহাড়ের মধ্যে যে দুই চারিখানি গ্রাম আছে, সেখানকার লোকেরাই একরকম খেতে পায় না - তা তারা অতিথিকে কি খেতে দেবে ? আমি এই সমস্ত কথা চিন্তা করতে লাগলুম, স্বামীজি শুয়ে পড়লেন৷ অচ্যুতানন্দস্বামী পাণ্ডাঠাকুরের সঙ্গে অসাধ্য-সাধন করবার জন্য চলে গেলেন৷ রাস্তায় যদি ফেলে এসে থাকি, ত সে স্থান যে কোথায় তার কিছু ঠিক নেই; আর তারপর প্রায় তিনঘন্টা কেটে গেছে, এঁদের খুঁজতে খুঁজতে আরও একঘন্টা না লাগবে? এই সময়ের মধ্যে কত যাত্রী কত বক্‌রিওয়ালা সে পথ দিয়ে যাতায়াত করেছো এতগুলো লোকের মধ্যে সে ব্যাঘ্রচর্ম কারো চোখে পড়েনি? - যা হোক তাদের পথ চেয়ে বসে রইলুম৷ এদিকেও ভিক্ষা - ওদিকেও ভিক্ষা; দেখা যাক,- তারা ফিরে এলে যা হোক করা যাবো

প্রায় দুই ঘন্টা পরে দেখি তাঁরা ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়ে আসছেন৷ তাঁরা অনেক নিকটে এলে অচ্যুতানন্দ বাবাজী খুব চেঁচিয়ে বললেন , ''মিল গিয়া, মিল গিয়া''। আমি অকূল পাথারে কূল পেলুম৷ তাঁরা একেবারে প্রাণপণ শক্তিতে দৌড়িয়েছিলেন৷ লছমীপ্রসাদ পাণ্ডা এসে

থলিসুদ্ধ টাকা মাটিতে ফেলে হাঁপাতে হাঁপাতে দেওয়ালে পিঠ দিয়ে বসে পড়লো। তাদের অবস্থা দেখে টাকা কিরূপে কোথায় পাওয়া গেল তা আর তখন জিজ্ঞাসা করলুম না। শেষে তারা শান্ত হ'য়ে বললে যে, রাস্তায় চলতে চলতে যাদের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তাদেরই ব্যাঘ্রচর্মের কথা জিজ্ঞাসা করেছে; কিন্তু কেউ কোনো কথা বলতে পারেনি; শেষে এক সন্ন্যাসী বলেছিল যে, প্রায় দেড় মাইল তফাতে এক ঝর্ণার পাশে একখণ্ড পাথরের উপর সে একখানা ব্যাঘ্রচর্ম পড়ে থাকতে দেখেছে। তার মনে হয়েছিল, বুঝি কোন সন্ন্যাসী সেখানে আসন রেখে বনের মধ্যে প্রবেশ করেছে। এই কথা শুনে তাদের মনে আশা হ'ল। তারা দৌড়তে দৌড়তে সেখানে গিয়ে দেখে যে, ব্যাঘ্রচর্মখানি ঠিক সেখানে সেরকম বাঁধা অবস্থাতে পড়ে আছে। অচ্যুতানন্দ তা তুলে নিলেন, কিন্তু হাতে করেই তাঁর হরিষে-বিষাদ উপস্থিত হলো। আসন পাতলা,খুলে দেখেন ভিতরে কিছুই নেই, অথচ উপরে যেমন বাঁধা ছিল তেমনই বাঁধা। দুজনেই মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন। কিন্তু একটু পরেই পাণ্ডাঠাকুর উঠে চারিদিক অনুসন্ধান করে দেখতে লাগলেন; কিছুই দেখতে পেলেন না। তাঁরা সে রাস্তা ছেড়ে জঙ্গলের ভিতর দিয়ে নীচে নেমে গেলেন। আর একটু নীচে গিয়ে দেখেন একটি রাখাল বালক কতকগুলি মেষ চড়াচ্ছে। তাকে জিজ্ঞাসা করলেন সেখান দিয়ে কোন লোক নেমে গেছে কি না। পাণ্ডাজির কেমন বিশ্বাস হয়েছিল যে, যে টাকা নিয়েছে, সে কখনও প্রকাশ্য পথ দিয়ে যেতে সাহস করেনি, এদিক ওদিক দিয়ে নেমে গেছে। পশ্চিমে পাণ্ডার এতটা বুদ্ধির পরিচালনা অবশ্য একটু অসাধারণ। যা হোক, প্রথমে রাখাল বালক পাণ্ডাজিকে কোন কথাই বলতে পারলে না; শেষে খানিক ভেবে-চিন্তে বললে যে, সে যেন সেই পথ দিয়ে একজন সন্ন্যাসীকে খানিক আগে যেতে দেখেছে। তাই শুনে পাণ্ডাঠাকুর ঠিক করলেন, এ টাকা চুরি সেই সন্ন্যাসী ছাড়া আর কারও কাজ নয়। রাখাল যে পথ দেখিয়ে দিলে, সে কাঁটা-জঙ্গল ভেঙে তাঁরা সেই দিকে দৌড়াতে লাগলেন। কাঁটায় সর্বশরীর ছিন্নভিন্ন হ'য়ে গেল। তাতে ভ্রুক্ষেপ না করে দৌড়তে দৌড়তে দেখলেন- খানিক আগে একজন সন্ন্যাসী উপরের দিকেই উঠছে। পাণ্ডাঠাকুর তার অলক্ষ্যে তার পিছু পিছু যেতে লাগলেন। সন্ন্যাসী বেশ বলবান বোধ হওয়ায় এই নির্জন প্রদেশে তাকে একেবারে চেপে ধরতে তাঁর কিছু ভয় হলো। যা হোক, রাখাল বালকও ব্যাপার কি জানবার জন্য ধীরে ধীরে পাণ্ডাজির পেছনে পেছনে আসতে লাগলো। অচ্যুতবাবাজিও একটু একটু করে অগ্রসর হচ্ছিলেন। চোর সন্ন্যাসী যখন ধীরে ধীরে নীচে রাস্তার উপরে যাবার আয়োজন করছিল, তখন পাণ্ডাঠাকুর অদূরে রাস্তার উপর অচ্যুতবাবাজিকে দেখে সাহস পেয়ে এক দৌড়ে সিংহবিক্রমে সেই সন্ন্যাসীর ঘাড় চেপে ধরে একেবারে '' শালা চোর, নিকালো রূপেয়া'' বলে চীৎকার করে উঠলেন। ওদিকে অচ্যুতবাবাজি ''ক্যা হুয়া'' বলে এক লম্ফে সেখানে উপস্থিত। সন্ন্যাসী চোর ত একেবারে থ। তার আর কোনও কথা বলার শক্তি রইল না। সে নিজেও খুব জোয়ান বটে; কিন্তু আগে পাছে দু'জন ষণ্ডামার্কা দেখে তার বড় ভয় হ'ল, এবং সে সব কথা স্বীকার করে পাণ্ডাজির পায়ে ধরে কান্নাকাটি আরম্ভ করলো। তারপর তিনজন মিলে সেই ঝর্ণার কাছে এসে টাকা খুলে দেখে যে, একটি টাকাও কমেনি। সন্ন্যাসী চোরটা বড়ই নির্লজ্জ; কোথায় চুরি করে ধরা পড়েছে বলে পালাবার চেষ্টা করবে, না - কিছু ভিক্ষার জন্যে তাদের দুজনকে ধরে ব'সলো। টাকা পেয়ে তাদের এতই ফূর্তি হ'লো যে, দয়ার্দ হ'য়ে তারা তাকে একটাকা বক্‌শিস দিলে; আর সেই রাখালকে ডেকে তাকে চার আনা পুরস্কার দিয়ে এই সংবাদ আমাদের জানাবার জন্যে প্রাণপণে ছুটে আসছে। আমি পাণ্ডাজিকে পাঁচ টাকা পুরস্কার দিতে গেলুম। সে কিছুতেই তা নিলে না, বললে, ''বাবাজি, ইনাম কা ওয়াস্তে ইতনা তক্‌লিফ

লেনেকা আদমী মেঁই নেহি হুঁ, আপকো ওয়াস্তে প্রাণ ব্যাকুল হুয়া থা।'' তার এই স্বার্থশূণ্য কথাগুলি শুনে, আমি যে টাকা দিয়ে তার পরিশ্রমের মূল্য নির্দেশ করতে গিয়েছিলুম, এ ভেবে মনে বড় লজ্জার উদয় হ'লো; কিন্তু তার এই মহৎ ব্যবহারে আমার খুব আনন্দও হ'লো। এই পর্বতবাসী একজন অশিক্ষিত পাণ্ডা আমার মত অপরিচিতের জন্যে যে কষ্ট স্বীকার করলে, দেশের কোনও পরিচিত আত্মীয়বন্ধুও এর চেয়ে বেশি করতে পারতেন না; এ রকম মহত্বের দৃষ্টান্তও অতি বিরল।

দেবপ্রয়াগ গঙ্গা–অলকানন্দার সঙ্গমস্থলে অবস্থিত। গাড়োয়ালের মধ্যে দেবপ্রয়াগ একটি প্রসিদ্ধ স্থান। এখানকার হাটবাজার বেশ ভাল। বদ্রীনারায়ণের পাণ্ডাদের বাস এইখানেই। প্রায় পাঁচশত ঘর পাণ্ডা এখানে বাস করে। এদের অনেকরই অবস্থা ভাল; ঘর–বাড়ী পাকা এবং সকলেই এক জায়গায় থাকে। গঙ্গা ও অলকানন্দা যেখানে সম্মিলিত হয়েছে, তারই ঠিক উপরে একটু সমতল স্থান আছে। সেই স্থানের মধ্যেই এই পাঁচশ ঘর গৃহস্থ কোনরকমে বাস করছে।

দেবপ্রয়াগে একটি পুরনো মন্দির আছে; মন্দিরটা পাণ্ডাদের বাড়ীর ঠিক মধ্যখানে। এই মন্দিরে রামসীতার মূর্তি আছে। গাড়োয়ালের রাজা – এখন তাঁকে টিহরীর রাজা বলে,– এ মন্দিরের অধিকারী। মন্দিরের অনেক ধনসম্পত্তি আছে। টিহরী রাজ্যের নিয়ম এই যে, রাজার মৃত্যু হ'লে তাঁর নিজ ব্যবহার্য সমস্ত জিনিসই এই মন্দিরে পাঠান হয়। মন্দিরের সমস্ত আয় ব্যয়ের ভার টিহরীর রাজার উপর; তাঁর নিযুক্ত পুরোহিতের উপর দেবসেবার ভার আছে।

পাণ্ডার সঙ্গে গিয়ে সঙ্গমস্থলে স্নান করলুম; গঙ্গা ও অলকানন্দার মধ্যে অলকানন্দাকেই বড় ব'লে মনে হয়। এখন আমাদের অলকানন্দার ধারে ধারে যেতে হবে। আমাদের যেখানে বাসা, সেখান থেকে সঙ্গমস্থলে যেতে হ'লে অলকানন্দা পার হ'তে হয়। ইংরাজের প্রসাদে এখন আর ঝোলা পার হ'তে হয় না। যেখানে যেখানে ঝোলা ছিল, সেই সমস্ত জায়াগায় এখন এক একটা সুন্দর টানা পুল তৈয়ারি হয়েছে। ইংরাজেরা যে কয়টি সাঁকো তৈয়ারি ক'রেছেন, তার মধ্যে এইটিই সবচেয়ে বড় ও সুন্দর। এর নির্মাণ প্রণালী কলিকাতার সন্নিহিত চেতলার পুলের মত। এই সমস্ত ভয়ানক স্থানে বহু অর্থ ব্যয় ক'রে পুল তৈয়ারি করিয়ে ইংরাজরাজ বহু প্রতিষ্ঠা ও আশীর্বাদভাজন হ'য়েছেন, প্রকৃতপক্ষে বদ্রীকাশ্রমের পথ ইংরাজের প্রসাদেই অনেক সুগম হয়েছে।

বিকালে আমরা মন্দির দেখতে গেলুম; ঠাকুরের পায়ে স্বর্ণ ও মণিমুক্তার অলঙ্কার। আমার পাণ্ডা আমাকে বাঙালীর এক কুকীর্তির কথা শুনিয়ে দিলে। লজ্জায় আমার মুখ চোখ লাল হ'য়ে উঠলো। দেবপ্রয়াগে ভদ্রবেশধারী বাঙ্গালীকে এখন সকলেই সন্দেহের চক্ষে দেখে, এমন কি তার গতিবিধি পর্যন্ত পর্যবেক্ষণ ক'রে থাকে। বাঙ্গালীর পক্ষে এ বড় কম লজ্জার কথা নয়। যাকে বড় বেশী বিশ্বাসী ব'লে মনে হয়, সে যদি অবিশ্বাসের কাজ করে, তা হ'লে তার পরে কি আর কাউকে তেমন সহজে বিশ্বাস করা যায়? ব্যাপারটা কি এখানে বলা যাক।

আজ প্রায় পাঁচ বৎসর হ'লো, একদিন এক বাঙ্গালী বাবু দেবপ্রয়াগে এসে উপস্থিত হন। তীর্থদর্শন তাঁর উদ্দেশ্য। তাঁর বাড়ী কলিকাতায়, তবে ঠিক সহরের মধ্যে কি না তা বলা যায় না। সে বাঙ্গালীর নামটাও শুনেছিলাম, সেটা আমার ডাইরিতেও লেখা ছিল, কিন্তু পেন্সিলের লেখা উঠে গেছে, আর তাঁর নামটা মুছে যাওয়ায় আমি কিছুমাত্রও দুঃখিত নই। বাঙ্গালী জাতি থেকে যদি তাঁর নামটা মুছে যেত, তা হ'লে তাঁর কুকীর্তির কথা শুনে আমাকে এত লজ্জিত হ'তে হ'তো না।

দেবপ্রয়াগে এসে তিনি প্রথমে একদিন থাকবেন ব'লে বাসা নিয়েছিলেন। কিন্তু স্থানটি অতি মনোরম বোধ হওয়াতে তিনি এখানে বেশী দিন ধ'রে বাস করতে লাগলেন। এখানে একটা ইংরাজের থানা আছে। থানার লোকজনের সঙ্গে বেশ ভাব হ'লো; ডাকঘরের বাবুর সঙ্গে বেশ আলাপ পরিচয় হ'লো, বড় বড় পাণ্ডাদের সঙ্গেও বন্ধুত্ব স্থাপন ক'রলেন, এবং একজন ইংরেজী জানা ধনশালী (পশ্চিমে একটু ফিটফাট থাকলেই সে দেশের লোক ভাবে এ ব্যক্তি একজন রাজা মহারাজা হবে) বাঙ্গালী বাবুর সঙ্গে আলাপ পরিচয় ও ঘনিষ্ঠতায় সকলেই আপনাকে একটু কৃতার্থ মনে ক'রতে লাগলো।

বাবু প্রত্যহই রামসীতা দর্শন করতে যান; মহাভক্তির সঙ্গে ঠাকুরদের দিকে -- কি ঠাকুরদের গহনার দিকে ঠিক বলা যায় না -- চেয়ে থাকেন, এবং আর সব দর্শক ও যাত্রী চ'লে গেলে তিনি সকলের শেষে মন্দির থেকে বাহির হন। তিনি দেখলেন বাহিরের দিক থেকে একটা বড় তালা দিয়ে মন্দির বন্ধ করা হয়, সুতরাং মন্দিরের এই তালার দিকে তাঁর দৃষ্টি পড়লো। পোষ্টমাষ্টার বাবুর অফিসের তালাটিও অনেকটা এইরকমের, কিন্তু সে দিকে আর কারও দৃষ্টি পড়ে নি, আর পোষ্টমাষ্টারকেও বড় একটা আফিস বন্ধ ক'রতে হয় না; কাজেই সেই চাবিটা কোলুঙ্গার উপর অযত্নে প'ড়ে থাকে। বাঙ্গালীবাবু সেই চাবিটা হস্তগত ক'রলেন এবং তাকে ঘষে সেই মন্দিরের তালায় লাগাবার উপযোগী ক'রে নিলেন। শেষে একদিন রাত্রিতে যখন সকলে নিদ্রিত-- সেই সময় তিনি ধীরে ধীরে মন্দিরের দ্বার খুলে মদিরে প্রবেশ ক'রলেন এবং দ্বার বন্ধ না ক'রেই চ'লে গেলেন। মন্দিরের বাহিরে একটা ছোট ঘরে পুরোহিতের একজন লোক শয়ন ক'রে ছিল। সে কার্য্যবশতঃ উঠে দেখে, মন্দিরের দ্বার খোলা, ভিতর থেকে আলো আস্ছে। এত রাত্রিতে মন্দিরের দ্বার খোলা দেখে তার ভারী সন্দেহ হ'লো। সে চুপে চুপে মন্দিরের কাছে গিয়ে দেখে ভিতরে টুক্টাক্ শব্দ হচ্ছে। সে উচ্চবাচ্য না ক'রে প্রথমে মন্দিরের পাশে একটা দুয়ার ছিল (সেটা ভিতর থেকে বন্ধ) সেই দুয়ারটাতে শিকল টেনে দিলে, তার পর নিজের ঘর থেকে সেই বড় দরজার চাবি এনে দুয়ার বন্ধ ক'রে চীৎকার আরম্ভ করলে।

চোর মহাশয় ইতিমধ্যে মন্দিরে প্রবেশ ক'রে সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান অলঙ্কারগুলি --কতক বা ঠাকুরের গা থেকে এবং কতক বাক্স ভেঙে বের ক'রে--গায়ের কাপড়ের উপর রেখেছেন। তিনি বিশ্বস্ত-চিত্তে এই ব্যাপারে প্রবৃত্ত--সহসা মন্দির-দ্বারে জনকোলাহল শুনে তাড়াতাড়ি দুয়ারের কাছে এসে দেখেন দ্বার বন্ধ। দশ মিনিটের মধ্যে চারিদিকে পাণ্ডার দল এসে জুটলো, মেয়েপুরুষে সেই মন্দির-প্রাঙ্গণ পূর্ণ হ'য়ে গেল। বাবাজি বিনা চেষ্টাতেই ধরা পড়লেন, কাপড়ে বাঁধা জহরৎ সমস্তই বাহির হ'য়ে পড়লো। টিহরী রাজ্যে দু'বৎসর মেয়াদ খেটে তার পর ইংরেজের কাছে বিচার হ'য়ে তার আর দু বছরের

জেল হ'ল। জেল থেকে বের হ'য়ে সেই পুরুষ পুঙ্গব এখন যে কোথায় স'রে পড়েছেন , তা জানা যায় নি। এখন ভদ্রবেশধারী যুবক দেখলেই মন্দিরের লোক তার দিকে সন্দিগ্ধচিত্তে চেয়ে থাকে, এবং বিশেষ সাবধান হয়, আমি যে তাদের সন্দেহ থেকে এড়িয়েছিলুম, তা বোধ হয় না। আমার বয়সের লোক যে কোন একটা বিশেষ অভিপ্রায় ছাড়া এত কষ্ট ক'রে শুধু তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে এতদূর এসেছে, এ কথা আর তারা সহজে বিশ্বাস করতে রাজী নয়, কেন না তাদের এ বিষয়ে অভিজ্ঞতা সম্পূর্ণ অন্য রকমের। শুধু এই হতভাগ্যই যে এ দেশে আমাদের নামে কলঙ্ক রেখে গেছে তা নয়, পশ্চিমের আরও অনেক স্থানে, অনেক বাঙ্গালীর কুকীর্তির কথা শুনতে পাওয়া যায়, এবং সে সমস্ত কথা শুনে অধোবদন হ'তে হয়। কিন্তু আজকাল অনেক ভদ্রলোক পশ্চিমে গিয়ে আমাদের লুপ্ত গৌরব উদ্ধার ক'রেছেন এবং ভরসা আছে, তাঁদের মহত্ত্বে আমরা ভবিষ্যতে এ সব দেশে বাঙ্গালী ব'লে পরিচয় দেওয়া বিশেষ গর্ব্বের কথা ম'নে ক'রবো।

দেবপ্রয়াগ

১২ ই মে মঙ্গলবার -- আজ দেবপ্রয়াগে অবস্থান। অনেকদিন পরে লোকালয়ে এসেছি, বোধ হ'লো এতদিন যেন জীবনের নেপথ্যে নেপথ্যে বেড়াচ্ছিলুম, - তার মধ্যে না ছিল জনকোলাহল না ছিল কিছু, কেবল মুক্ত প্রকৃতি তার সমস্ত সৌন্দর্য্য থরে থরে সাজিয়ে - আমার হৃদয়মন্দিরে অবস্থান ক'রেছিল। আজ হঠাৎ মানব-কোলাহলে সে দৃশ্যের পরিবর্তনে একটু নুতনত্ব পাওয়া গেল। বাজারের দোকানদারদের কেনাবেচার গোল, পাণ্ডাদের যাত্রী সম্বন্ধে আলোচনা, ছোট ছোট ছেলেমেয়ের হাসি গল্প প্রভৃতি শুনে মনে হ'লো এতদিন পরে বুঝি সংসারে ফিরে এলুম। সঙ্গে সঙ্গে একটু আরাম ও সুখভোগের ইচ্ছাটাও বেশ প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ল। এতদিন ত অবিশ্রান্ত পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলুম, খানিক বোসে আয়েস করার কথা ত একবারও মনে হয় নি। কিন্তু আজ পা দুটি একটু ছুটি নেবার জন্যে মহাব্যতিব্যস্ত করে তুলল। আমি ফিলজফাইজ করলাম, যতক্ষণ মানুষ কষ্টের মধ্যে থাকে যতক্ষন দেখে যে কষ্ট ছাড়া আর লাভের কোন সম্ভাবনা নেই, ততক্ষণ সে তা বেশ ঘাড় হেঁট ক'রে সহ্য করে যায়, কিন্তু যখনই তার ফাঁক দিয়ে একটু সুখের ছায়া নজরে পড়ে, তখনই আবার সে সব ছেড়ে সেই সুখটুকুর পিছু পিছু ছোটে, আর তা লাভ করতে না পাল্লেই নিজেকে মহা দুর্ভাগ্য ব'লে মনে করে। আমার আজ আর উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না, কিন্তু নগর ত দেখা চাই, কাজেই আলস্য ঝেড়ে উঠে নগর ভ্রমণে বাহির হওয়া গেল।

দেবপ্রয়াগের দৃশ্যশোভা বড় সুন্দর। পূর্ব্বেই বলেছি এখানে গঙ্গা ও অলকানন্দার সঙ্গম হয়েছে। গঙ্গার মাহাত্ম্য বেশী, তাই লোকে বলে গঙ্গায় অলকানন্দা মিশেছে, কিন্তু ঠিক কথা বলতে গেলে বলা উচিত অলকানন্দার সঙ্গে গঙ্গা মিশেছে। অলকানন্দা ঘোর রবে নাচতে নাচতে চলে যাচ্ছে, তার উচ্ছৃঙ্খল বেশ, তার তরঙ্গ কল্লোল, আর তার উচ্চ তটভূমির বিস্তীর্ণ পাথরের উপর শ্যামল শৈবালের স্নিগ্ধ শোভা দেখে তাকে কবিতার একটা জীবন্ত প্রতিকৃতি বোলে বোধ হয়। সেই ভৈরব দৃশ্যের মধ্যে গঙ্গা কল কল রবে তার নির্ম্মল জলরাশি ঢেলে দিচ্ছে। আমাদের বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রে দুটো নদীর একটা সঙ্গম বড় বিশেষ ব্যাপার নয়; দৃশ্যতেও তেমন কিছু বৈচিত্র্য থাকে না - কেবল সঙ্গমস্থলটা খানিকটা প্রশস্ত হয় মাত্র; আর দুটো নদী যে কেমন ক'রে মিশে গেল, তার খবরও পাওয়া যায় না, স্বতন্ত্র অস্তিত্বের চিহ্ন ত দূরের কথা। কিন্তু এ দেশের

পার্ব্বত্য নদী পার্ব্বত্য জাতির মতই তেজস্বী; সহজে আত্মবিসর্জন করতে রাজী নয়, যথেষ্ট আয়োজন ক'রে তবে আত্মবিসর্জন করে।

বদ্রীকাশ্রমের পথে যে ক'টা জায়গা দেখেছি, তার মধ্যে দেবপ্রয়াগই আমার সব চেয়ে ভাল বোধ হ'লো। সে যেন ঠিক একখানা ছবি। পর্ব্বতের বিবিধ দৃশ্য, ছোট ছোট ঘর বাড়ী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আঁকা বাঁকা রাস্তা, অনুচ্চ মন্দির যেন পাহাড়ের গা খুঁদে বের করা হ'য়েছে। তার পর বৃক্ষলতা, নানারকম সুন্দর সুন্দর ফুল, স্বচ্ছন্দচিত্ত গাড়োয়ালীদের নিঃশঙ্ক পদচারণা ও বেশবিন্যাসশূণ্য প্রফুল্ল বালক-বালিকার ছুটোছুটি বা শাখাপত্র প্রচুর দীর্ঘ বৃক্ষমূলে জটলা, এ সব দেখে মনে হয় না যে এ আমাদের সেই বহু প্রাচীন, জ্ঞানবৃদ্ধ, নিয়মাবদ্ধ, এবং দঃুখ ও অশান্তিপূর্ণ পৃথিবীর একটা অংশ। এখানে এসে বাস্তবিকই -

'' শুধু জেগে উঠে প্রেম মঙ্গল মধুর,
বেড়ে যায় জীবনের গতি;
ধূলিধৌত দুঃখ শোক শুভ্রশান্ত বেগে
ধরে যেন আনন্দ মূরতি।
বন্ধন হারায়ে গিয়ে স্বার্থ ব্যাপ্ত হয়
অবারিত জগতের মাঝে,
বিশ্বের নিশ্বাস লাগি জীবন-কুহকে,
মঙ্গল আনন্দধ্বনি বাজে।''

আমরা এখানে এসে যেখানে বাসা নিয়েছিলুম, সেখান হ'তে পাণ্ডাদের যেখানে বাস, সেখানে যেতে হ'লে একটা সাঁকো পার হ'তে হয়; এ সাঁকোটা অলকানন্দার উপর। দেবপ্রয়াগ আবার দু'ভাগে বিভক্ত, বাজারটা ইংরেজদের আর বাকী সহরটা তিহরীর রাজার। এই অলকানন্দা বৃটিশ গাড়োয়াল ও স্বাধীন গাড়োয়ালের সীমা নির্দ্দেশ করেছে।

এখানকার পাণ্ডাদের মধ্যে বেশ লেখাপড়ার চলন আছে, তবে এখানে বড় কেউ ইংরেজী লেখাপড়ার ধার ধারে না; হিন্দি ও সংস্কৃতের চর্চ্চা বেশী। কলিকাতার কোন হিন্দী সাপ্তাহিক কাগজ এখানে তিন চারখানা আসে। এখানে আমাদের দেশের কাগজ আসে শুনে মনে বড় আনন্দ হ'লো; আমার পাণ্ডা আমাকে সেই কাগজ একখানা এনে দিলে; তাতে আমাদের দেশে শেয়ালের উপদ্রবের খবর পাওয়া গেল; একটা গ্রামে হরিসংকীর্তন হয়েছিল, তার এক দীর্ঘ বিবরণ, আরও কত কি পড়লুম, - পরনিন্দা, পরকুৎসা, এবং সঙ্গে সঙ্গে হরিসভার সটিক বিবরণ পাঠ ক'রে আমার যথেষ্ট উপকার ও প্রচুর আনন্দ হ'লো; কিন্তু এ সকল সংবাদে এই পাহাড়ী জাতির কি পাভ, তা অনুমান করা আমার সাধ্যাতীত। বিকেলে পোষ্টমাষ্টার বাবুর কাছে শুনলুম, এদেশে কারো নামে একখানা খবরের কাগজ আসা, বিশেষ গৌরবের বিষয়।

দেবপ্রয়াগে প্রায় ৫০০ ঘর পাণ্ডার বাস; কিন্তু এত লোকের বাসের জন্যে আমাদের দেশে যতখানি প্রশস্ত জায়গার দরকার, ততখানি দূরের কথা, সমস্ত গাড়োয়াল রাজ্যে তার শত ভাগের একভাগ সমতল ভূমি আছে কিনা সন্দেহ। দেবপ্রয়াগে সমতলভূমি নেই। পাহাড়ের গায়ে যে ঢালু আছে, তারই উপর লোকের বসবাস। এক জায়গা একটু কম ঢালু – সেইখানে এই পাঁচশ ঘর পাণ্ডা বাস ক'রচে। একটা বাড়ীর মধ্যে হয় ত দশ পনেরটি গৃহস্থের বাসস্থান। বাড়ীগুলি অপ্রশস্ত, ঘরে জানালার সম্পর্কমাত্র নেই, যেন একটা সিন্দুক, আলো ও বাতাসকে যতদূর সম্ভব তাদের ভিতর থেকে নির্ব্বাসিত ক'রে দেওয়া হ'য়েছে। কোন কোন বাড়ী তিন চার তলা। রাস্তার ভাল বন্দোবস্ত নেই, কারো ঘরের বারান্দা দিয়ে, কারো ঘরের ভিতর দিয়ে যাওয়া আসা ক'রতে হয়। এই ত বাড়ীর অবস্থা – এরই এক এক ক্ষুদ্র কুটীরে এক এক বৃহৎ পরিবারের বাস। তার মধ্যেই রান্নাঘর, গোরুর ঘর এবং নিজেদের থাক্‌বার বন্দোবস্ত। পা দুটো যেমন জুতো জোড়াটার ভিতরকার সমস্ত স্থানটা অধিকার ক'রে, জলকাদা থেকে আপনাদের বাঁচিয়ে দিব্য স্বচ্ছন্দে বাস করে এদের এই সংকীর্ণ ঘরে বাসও অনেকটা সেই রকমের। আলাদীনের প্রদীপের দৈত্য যেমন এক রাত্রির মধ্যে এক সুবৃহৎ অট্টালিকা তৈরী ক'রেছিল সেই রকম একটা দৈত্য এসে যদি এই সব ক্ষুদ্র কুটীরে ভেঙে একরাত্রির মধ্যে বড় বড় ঘর তৈয়ারি ক'রে দিয়ে যায়, তবে এই পাণ্ডা বেচারীরা তাদের মধ্যে একদিন বাস ক'রেই হাঁপিয়ে উঠে।

পাণ্ডাদের ঘর–দ্বারের অবস্থা এরকম হলেও তারা খুব গরীব নয়। বদ্রীনারায়ণের অন্যগ্রহে প্রতি বৎসর এই সময় তারা বেশ দু'দশ টাকা রোজগার করে, আর তাতেই তাদের সমস্ত বছরটা চলে যায়। হরিদ্বার, কাশী, গয়া কি অযোধ্যার পাণ্ডারা যে রকম জোর–জবরদস্তী ক'রে যাত্রীর কাছ থেকে টাকা আদায় করে, এরা সে রকম নয়; আর এরা স্বল্পেই সন্তুষ্ট। মধ্যে মধ্যে এরা নীচে নামে, অনেকে কাশী পর্য্যন্তও যায়; কিন্তু বাঙ্গালাদেশ পর্যন্ত এগোয় না। গ্রীষ্মের ভয়েই তারা বাঙ্গালায় যেতে চায় না। হরিদ্বার, হৃষীকেশ, প্রভৃতি জায়গা হ'তে তারা যাত্রীদের সঙ্গ নেয়। পাণ্ডারা অতি শুদ্ধাচারী; এদের মধ্যে কর্ণাটী, দ্রাবিড়ী, সৌরাষ্ট্রী ও দক্ষিণী ব্রাহ্মণই বেশী। এদেশে মোটেই মুসলমান নেই, পাণ্ডারা মাছ মাংস স্পর্শও করে না; এদের চলন মিতাক্ষরার মতো।
সঙ্গী সন্ন্যাসী দু'জন আজ সমস্ত দিন বিশ্রাম করবেন, ঠিক করলেন; আমি বেচারা দিনটা কেমন ক'রে কাটাই, ভেবে না পেয়ে বেরিয়ে পড়লুম। অনেকক্ষণ পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়ান গেল, অনেক লোকের সঙ্গে আলাপ হ'লো আমি খানিক বেড়াচ্ছি, খানিক বা একটানা পাথরের উপর ব'সে প্রকৃতির শোভা দেখ্‌ছি; অস্তমান সূর্য্যের রশ্মিজাল পর্ব্বতের পাশ দিয়ে শ্যামল প্রকৃতির মধ্যে এসে বিকীর্ণ হ'য়ে পড়চে। আমার দৃষ্টি কখন ধূসর পর্ব্বত–অঙ্গে, কখন সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত জ্যোতির্ম্ময়ী অলকানন্দার উপর।

দেখতে দেখতে কতকগুলি পর্ব্বতবাসিনী রমণী এসে আমাকে ঘিরে দাঁড়ালো। এই নির্জ্জন প্রদেশে আমাকে ব'সে থাক্‌তে দেখে তারা যে বিস্মিত হয়েছিল, তা তাদের চাহনিতেই বেশ বুঝতে পারা গেল। ধীরে ধীরে সাহস পেয়ে তারা আমাকে দুই একটা ক'রে অনেক প্রশ্ন জিজ্ঞাসা ক'রলো। কেন দেশ ছেড়ে এসেছি, দেশে আমার আর কে আছে, আবার কবে দেশে ফির্‌বো, এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে দেখলুম, আমার প্রতি

সহানুভূতিতে তাদের হৃদয় আর্দ্র হ'য়ে গেল। তারা প্রকাশ্যে আমাকে কিছু না বললেও তাদের মনের ভাব স্পষ্ট বুঝতে পেরে আমার বড় আনন্দ হ'লো। এই দূরদেশে আমার মত প্রবাসীর প্রতি মা, বোনের স্নেহের আভাস ভারি প্রীতিকর।

অলকানন্দা ও গঙ্গার সঙ্গমের একটু উপরে বেশ একটু নির্জ্জন জায়গা আছে। বেড়াতে বেড়াতে সন্ধ্যার একটু আগে সেখানে গিয়ে একটা শিলাখণ্ডে বসে পড়লুম। নদীর কলতানের সঙ্গে প্রাণ ভেসে যেতে লাগলো। সন্ধ্যা হ'তে আর বেশী বিলম্ব নেই; কিন্তু আমার সে জায়গা ছেড়ে উঠ্‌তে ইচ্ছে হ'লো না। নদীর দিক্‌ হ'তে মুখ ফিরিয়ে পিছনে চাইতেই দেখি একটু দূরে দুটি মেয়ে ,-- বেশ সুন্দর দেখতে। অপরিচিত বেশ, চুলগুলো এলোমেলো হ'য়ে এদিক ওদিক লতিয়ে পড়েছে, হাতে কতকগুলো সুন্দর লতাপাতা ও ফুল। তারা উপর থেকে নেমে আস্‌ছিল। আমাকে দেখে তারা একটু থম্‌কে দাঁড়াল, দুজনে কি বলাবলি ক'রলে, তারপর যে দিক্‌ থেকে এসেছিল সেই পথে ফিরে যাবার যোগাড় কর'লো। আমি তাদের সঙ্গে কথা কইবার প্রলোভন কিছুতেই সংবরণ ক'রতে পারলুম না। তাদের ডাকতেই ফিরে এল। মেয়ে দুইটির মধ্যে যেটি অপেক্ষাকৃত বড়, সে একটু বেশি লাজুক। সে সলজ্জভাবে পাশের একটা বড় পাথরে ঠেস্‌ দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো। আজন্ম পার্ব্বত্যপ্রকৃতির মধ্যে বর্দ্ধিত হ'লেও তার লজ্জাশীলতা দেখ্‌লুম আমাদের বঙ্গবালিকাদের মতই প্রবল এবং সেই রকমই মধুর। ছোট মেয়েটি আমার কাছে এসে দাঁড়ালো। আমি তাদের বাড়ী কোথা, কে আছে, কয় ভাই, কয় বোন প্রভৃতি প্রশ্নে আলাপ আরম্ভ কর'লুম। প্রথমে তাদের কথা কইতে একটু বাধবাধ ঠেকলো, কিন্তু শীঘ্রই সে সঙ্কোচভাব দূর হয়ে গেল। অনেকক্ষণ কথাবার্তা হ'ল, সে সব কথা মনে নেই, কিন্তু একটা কথা আমাকে বড় বেজেছিল, তাই সেটা বেশ মনে আছে। আমি যখন তাকে বললুম যে, ''আমার বাপ নেই, স্ত্রী নেই, ছেলেও নেই তখন সে তার করুণ ও আয়ত চক্ষুদুটি আমার মুখের উপর রেখে অতি কোমল স্বরে বললে,, ''লেড়কি'' ছিল, জানিনে কোন অপরাধে তাকে তিন বৎসর হারিয়েছি। আজ এই বালিকার একটি কোমল প্রশ্নে সেই সুপ্ত স্মৃতি জেগে উঠলো। আমার চোখে জল দেখে বালিকার মুখখানি কেমন শুকিয়ে গেল। সে তার অপরিষ্কার ওড়না দিয়ে আমার চোখের জল মুছিয়ে, তার কোমল ছোট ছোট আঙ্গুল দিয়ে আমার হাতের আঙ্গুল লাড়তে লাগ্‌ল। তার সেই স্নেহস্পর্শে, তার অকপট সহানুভূতিতে আমি মুগ্ধ হয়ে গেলুম। বালিকা আমাকে আর কোন কথা বলতে পারলে না। আমি জানতে পাড়লুম মেয়েটি তার মা-বাপের একমাত্র সন্তান, তাই বুঝি তার মনে হ'য়েছিল মানুষের একটি মেয়েও না থাকা কতটা অসম্ভব।

সন্ধ্যা বেশ ঘন হ'য়ে এল। মেয়ে দুটি আগে আগে পথ দেখিয়ে চল্‌তে লাগ্‌লো, আর ঘন ঘন ''হুসিয়ারী'' ''খবরদারি'' বলতে লাগ্‌লো, পাছে আমার পায়ে ঠক্কর লেগে আমার পায়ে ব্যাথা হয়। আমাকে তারা রাস্তায় তুলে দিয়ে বিদায় নিলে। আমার বড় কষ্ট বোধ হ'ল। হায়, আবার কখন কি জীবনে তাদের সঙ্গে দেখা হবে ? যদিই, বা হয়, তা হ'লে আর কি তাদের সেই করুণারূপিণী সরলা বালিকা মূর্ত্তিতে দেখ্‌বো-দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বাসার দিকে অগ্রসর হলুম।

বাসায় এসে দেখি, পাণ্ডারা অনেকে সেখানে এসে উপস্থিত। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীদ্বয় আমার জন্যে বিশেষ উৎকণ্ঠিত হ'য়ে পড়েছেন। তাঁরা সন্ন্যাসী, তাঁদের নিজের গতিবিধি বেশ ঠিক আছে; কিন্তু আমি গৃহস্থ; মনের চাঞ্চল্য যথেষ্ট আছে; কখন কোথায় চলে গিয়ে কি

বিপদে পড়ি এই ভয়ে তাঁরা সর্ব্বদাই ব্যস্ত। আমি যে সন্ন্যাসীর সঙ্গে এই তীর্থভ্রমণে বের হ'য়েছি, তিনি আমাকে প্রতিপদে হারান, দু'পা আগে গেলে ব্যস্ত হন, দু'পা পাছে পড়্লে রাস্তায় ব'সে আমার জন্যে অপেক্ষা করেন। আজ দেখ্লুম অনেকক্ষণ আমাকে না দেখে তিনি ঠিক ক'রে ব'সে আছেন--আমি হয়ত কোথাও চ'লে গিয়েছি। যাহোক, আমাকে পেয়ে তাঁরা নিশ্চিন্ত হ'লেন। সন্ধ্যার পর আমাদের অনেক কথা হ'লে পূর্ব্বরাত্রের সেই বাঙ্গালী বাবুর কথাও উঠলো।আমার সঙ্গী সন্ন্যাসী এ গল্প শুনে বড়ই মর্ম্মাহত হ'লেন। বাঙ্গালা, উড়িষ্যা ও আসামের লোকজন ধর্ম্মে ভূষিত হ'য়ে যাতে মনুষ্যত্ব লাভ করতে পারে, এই চেষ্টায় তিনি বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত অক্লান্তভাবে যুবকের মত পরিশ্রম ক'রেছেন, আজ সেই বাঙ্গালীর একজন এতদূরে এসে বাঙ্গালীর নামে একটা কলঙ্কের ছাপ রেখে গেছে মনে ক'রে তাঁর চোখে জল এল।

পুণ্যভূমি উত্তরাখণ্ডে পাহাড়ের মধ্যে এসে মনে করেছিলুম ঝগড়া-বিবাদ, বাদ-বিসংবাদ ভ্রাতৃবিরোধ ও আত্মীয়বিচ্ছেদ বুঝি বা পশ্চাতের সমভূমে ফেলে এসেছি; কিন্তু ক্রমে দেখলুম এখানেও বিবাদ মামলা মোকদ্দমা আমাদের দেশেরই মতন। এখানেও ভাই ভাইকে প্রবঞ্চিত ক'র্তে ছাড়ে না, জ্ঞাতি জ্ঞাতির বুকে ছুরি মারবার জন্যে প্রস্তুত। আমার পাণ্ডার সঙ্গে তার ছোট ভাইয়ের এক মোকদ্দমা উপস্থিত। তাদের পিতা মৃত্যুকালে দুই ভাইয়ের দু'রকম প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে, তাঁর যা কিছু ছিল, সমস্ত ভাগ করে দিয়ে যান, এমন কি খাতা পর্যন্ত ভাগ করে দেন।

'খাতা' কথাটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। প্রত্যেক পাণ্ডার কাছে একখানা খাতা থাকে। যিনি যখন তীর্থভ্রমণে গিয়ে যে পাণ্ডার যজমান হন, তিনি সেই পাণ্ডার খাতায় নিজের নাম, গ্রামের নাম, ভাই, বোন, বাপ, মা -- এমন কি ছেলেপিলের নাম পর্যন্ত লিখে দিয়ে আসেন। পাণ্ডারা পুরুষানুক্রমে সেই নামগুলি মুখস্থ ক'রে রাখে এবং অনেক বৎসর পরে কোন ভদ্রলোক তীর্থভ্রমণে গেলে বাপ পিতামহের পরিচয় নিয়ে তারা সেই খাতা দেখিয়ে নিজেদের স্বত্ব সাব্যস্ত করে। খাতা দেখাতে না পারলে কিন্তু দাবী নামঞ্জুর।

আমার পাণ্ডার পিতা সেই খাতাখানা পর্যন্ত দুভাগ ক'রে ছেলেদের দিয়ে যান, সুতরাং ভাইয়েদের মধ্যে বিবাদের কোন কারণ ছিল না। কিন্তু তাদের দুর্ভাগ্যবশতঃ বাড়ির পিছনে আধহাত চওড়া ও পনের ষোল হাত লম্বা উঁচু নীচু যে জমিটুকু ছিল, সে টুকুর কথা অন্যান্য বিষয় ভাগের সময় পিতার মনে আসে নি। সেই জমিটুকু নিয়েই দুই ভাইয়ে এখন বিবাদ। সে জায়গাটুকু যে আপাততঃ সাপ, ব্যাঙ, ইঁদুর, বিড়াল ও আবর্জ্জনা ছাড়া আর কারও কাজে আসতে পারে, এই সম্ভাবনা আমার একবারও মনে উদয় হয় নি; কিন্তু তাদের অভিপ্রায় অন্যরকম। দু'জনেই বলে যে, চিরদিন কিন্তু এমন অবস্থা থাকবে না, কিছুকাল পরেই যদি এই কোঠা ভেঙে নূতন কোঠা তৈয়ের করা হয়; তবে ঐ জায়গাটায় খুব কাজ দেখ্বে। এ দিকে দুই ভাই মিলে যে মোকদ্দমা জুড়েছে, তাতে যা কিছু আছে তাও যে যাবে--সে বিষয়ে তাদের বিন্দুমাত্রও দৃক্‌পাত নাই। আমরা ছোট ভাইটিকে সেখানে ডাকলুম, দুজনকেই অনেক বোঝান গেল, কিন্তু কেউ বুঝতে চাইলেন না। আমাদের দেশের শিক্ষিত ভাইয়েরাই বোঝে না, আর এরা ত অশিক্ষিত পাহাড়ী। দুই ভাইয়ের পক্ষেই অনেক হিতাকাঙ্খী জুটেছেন; বড়র পক্ষীয়েরা সাক্ষী দেবেন, বাপ মৃত্যুকালে এ জমিটুকু বড় ভাইকেই দিয়ে গেছেন, কারণ বড় ভাইয়ের পোষ্য অনেক;

ছোটোর পক্ষ হোতে প্রমাণ হবে এটা মিথ্যে কথা। আমি ভাবলুম এরা ধার্ম্মিক হয় ত ধর্ম্মকথায় এদের মন নরম হবে; সুতরাং ''যদুপতেঃ ক্ব গত মথুরাপুরী'' ও ''নলিনীদলগত জলবৎ তরলং'' প্রভৃতি বড় বড় বাঁধি শ্লোক আউড়ে তাদের মন নরম করবার চেষ্টা করলুম; কিন্তু চোরা না মানে ধর্ম্মের কাহিনী ! এ বৈষয়িক ব্যাপারে আধ্যাত্মিকতা কিছুতেই খাট্‌লো না। শেষে উভয়ে আমাকে অনুরোধ করলো যে, টিহরী রাজদরবারে বিচার হবে; যদি কাউন্সিলের কোন মেম্বরের সঙ্গে আমার পরিচয় থাকে ত তাঁর কাছে একখানা অনুরোধপত্র দিতে হবে, যেন পুনঃ পুনঃ দিন ফিরিয়ে তাদের হয়রান করা না হয়, এবং বিচার যেন ন্যায়-সঙ্গত হয়। আমার দুর্ভাগ্যক্রমে টিহরীর রাজদরবারের সঙ্গে অল্প পরিচয় ছিল। আমি একটা অনুরোধপত্র লিখে দিলুম যে, যেন এ সম্বন্ধে একটু বিশেষ অনুসন্ধান হয়।

১৩ ই মে, বুধবার। -- আজ খুব ভোরে পাঁচটার আগে উঠে দেবপ্রয়াগ ছেড়ে চললুম। এখন হ'তে আমরা বরাবর অলকানন্দার ধার দিয়ে চলতে লাগলুম। ন'মাইল চলে ''রাণীবাড়ী'' চটিতে এসে পৌঁছান গেল। এ জায়গাটা সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বল্‌বার নেই। আমরা বৈকালে রওনা হওয়ার যোগাড় করলুম, কিন্তু দেখ্‌তে দেখ্‌তে চারিদিকে ঘোর ক'রে বেশ মেঘ হয়ে এলো। ঝড়বৃষ্টির মধ্যে যে কষ্ট পাওয়া গিয়েছিল তা বেশ মনে আছে, সেই জন্য আর মেঘ মাথায় ক'রে বের হওয়া কারো ভাল বলে মনে হলো না। এখানে রাত্রিটাও কাটান গেল। রাত্রিতে বৃষ্টি দেখে মনে হলো, না বেরিয়ে ভালই করেছি। ১৪ ই মে,-বৃহষ্পতিবার। -- প্রাতে যাত্রা। সাতমাইল চ'লে এসে একটা ঝর্ণার ধারে উপস্থিত হ'লুম। ঝর্ণার উপরে একটা প্রকাণ্ড শিবমন্দির। শিবের নাম ''বিল্বকেশ্বর'', আমার সঙ্গী সন্ন্যাসীদ্বয় মন্দিরের মধ্যে শিব দেখে এলেন। সেখানে কিন্তু আমার ''প্রবেশ নিষেধ'', কারণ সন্ন্যাসীদের পয়সা দিয়ে শিবদর্শন ক'র্‌তে হয় না, কিন্তু গৃহীর পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা। ঠিক সে সময়ে আমার হাতে পয়সা ছিল না, সেও এক কারণ বটে। আর এক বিশেষ কারণ এই যে, এইরকম পয়সা দিয়ে ক্রমাগত ঠাকুর দেখার প্রবৃত্তি আমার বলবতী ছিল না। এই দুই কারণে আমার শিবদর্শন ঘট্‌লো না। ঝর্ণার জলপানে তৃপ্ত হ'য়ে আমি এদিক ওদিক ঘুরে বেড়াতে লাগলুম। খানিক পরে স্বামিজী শিব দেখে ফিরে এলেন। তাঁর মুখে শুন্‌লুম, সেই মন্দিরের মধ্যে পাথরের উপর খুব বড় পায়ের চিহ্ন আছে; পাণ্ডারা তা অর্জ্জুনের পদচিহ্ন ব'লে ব্যাখ্যা করে থাকে। শুন্‌লুম সেই অসাধারণ পদচিহ্নের মধ্যে আমাদের মত ক্ষুদ্রপ্রাণীর তিনখানি পা বেশ পাশাপাশি শুয়ে থাকতে পারে। অর্জ্জুন অতবড় বীর, তাঁর পা আমাদের পায়ের মত হ'লে আর তাঁর পদগৌরব থাকে কোথায় ? সুতরাং তাঁর পায়ের চিহ্ন খুব জাঁকাল হওয়াই যুক্তিসঙ্গত। এ সব বিষয়ে আমাদের পুরাণকারদিগের খুব বাহাদুরী আছে; হনুমান বেচারাকে খুব প্রকাণ্ড ক'রে আঁকতে হবে, অতএব সূর্যকে তার কুক্ষিগত করানো হ'লো। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সূর্যের আকার বিস্তৃততর হয়েছে, সুতরাং হনুমানজীর মহিমার তাতে বৃদ্ধি বই হ্রাস হয়নি। এই রকম কুম্ভকর্ণের নাসারন্ধ্র খুব বড় দেখানো দরকার - অতএব তার এক এক নিশ্বাসে বিশ পঁচিশটে রাক্ষস বানর উদরে প্রবেশ ক'রছে, আর বের হ'চ্ছে। কিন্তু তারপর যখন যুক্তির ও তর্কের কাল আসে, তখন এই সমস্ত গাঁজাখুরী গল্পের এক একটি বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা প্রস্তুতের অত্যন্ত দরকার হয়ে পড়ে। তাতে দিনকতক চারিদিকে খুব বাহবা প'ড়ে যায় বটে, কিন্তু শেষ ফল এই হয় যে, এই সমস্ত গল্পের সেই

প্রাচীন স্নিগ্ধ ভাবগুলিও সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয় এবং তা হ'তে একটা নূতন সত্য আবিষ্কারের চেষ্টাও ব্যর্থ হয়ে পড়ে। এই সমস্ত কথা চিন্তা করতে করতে আরও দু'মাইল চ'লে এসে গাড়োয়ালের রাজধানী শ্রীনগরে প্রবেশ করা গেল।

শ্রীনগর

১৪ ই মে, বৃহস্পতিবার -- বেলা প্রায় এগারটার সময় গাড়োয়ালের প্রধান শহর শ্রীনগরে উপস্থিত হওয়া গেল। ভারতবর্ষের উত্তরে দুই শ্রীনগর আছে; এক হচ্ছে ভূস্বর্গ, কবিতা ও কল্পনার চিরলীলনিকেতন, সমগ্র হিমালয় প্রবেশের রম্য কুঞ্জকানন কাশ্মীর-রাজধানী; আর অন্যটি এই গাড়োয়ালের প্রধান নগর। কাশ্মীর-রাজধানীর তুলনায় এ শ্রীনগর অবশ্য অনেকটা শ্রীহীন, কারণ এখানে প্রকৃতির সৌন্দয্যই আছে, কিন্তু সে সৌন্দর্য্য বেশী করে ফুটিয়ে তোলার জন্যে কোন আয়োজন এখানে হয় নি, কিংবা মানবের রুচি এই সৌন্দর্য্য উপভোগ করবার জন্যে কোন কৃত্রিম উপায় অবলম্বন করে নি। কিন্তু তবু এ সৌন্দয্যের মধ্যে একটা মহান গম্ভীর ভাব আছে, তা শুধু প্রাণ দিয়েই অনুভব করা যায়। চারিদিকে হিমালয়ের অসমান শৃঙ্গ আকাশ স্পর্শ করার জন্যে দাঁড়িয়ে আছে, মধ্যে অলকানন্দা নির্ম্মল জলপ্রবাহে উপলখণ্ড ধুয়ে চলে যাচ্ছে; দুই একটা জায়গায় বড় বড় প্রস্তরস্তূপ প'ড়ে তাদের গতি ব্যাহত করার চেষ্টা ক'রছে। সেখানে তাদের বেগ বড়ই ভয়ানক। নির্ম্মল তরল প্রবাহ বটে, কিন্তু তাদের গতি কে রোধ করতে পারে ? নদীর পাড়ে এবং অসমতল পর্ব্বত-উপত্যকায় নানা রকমের গাছ। ফুলের গাছ যে কত, তার সংখ্যা নাই। কোথাও রাশি রাশি ইট ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'য়ে রয়েছে, একরাশ সতেজ লতা তাদের জড়িয়ে ধরে - বেশির ভাগ জায়গা সবুজ পাতায় ঢেকে - আশেপাশের দু'পাঁচটা গাছকে তাদের ''ললিত লতার বাঁধনে'' বাঁধার চেষ্টা ক'চ্ছে। তার অল্প দূরেই শ্রীনগর, পূর্ব্বগৌরবের লুপ্ত চিহ্ন পুরাণো রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ, আর স্থানে স্থানে নানা শিল্পকার্য্যবিশিষ্ট প্রাচীন দেবালয়।

শ্রীনগরের দৃশ্য-শোভার মধ্যে মোটেই বিলাসের ভাব নেই। এখানে আমি এমন একটা জায়গা দেখেছি ব'লে মনে হয় না, যেখানে নদীতীরে, জ্যোৎস্নাপুলকিত, কুসুমসুরভিপ্লাবিত রাত্রে নৈশবায়ুহিল্লোলিত লতাকুঞ্জে নায়ক নায়িকা পরস্পরের হৃদয়াবেগ ঢেলে দিয়ে তৃপ্তি অনুভব করতে পারেন। সমস্ত স্থানটা যেন যোগীহৃষির তপ-জপের পক্ষেই একান্ত উপোযোগী। হৃদয়ে শান্তি আনে, বিলাসিতার চাঞ্চল্য-জাগায় না।

আমরা শ্রীনগরে প্রবেশ ক'রে একটা ছোট পরিচ্ছন্ন দোতলা ঘরে বাসা নিলুম। হরিদ্বার ছেড়ে অবধি যত জায়গা দেখেছি, তার মধ্যে শ্রীনগরকেই সহর বলা যায়। পর্ব্বতের মধ্যে এতদূর বিস্তৃত সমতলভূমি আর কোথাও দেখি নি। অন্য যে সমস্ত নগর দেখেছি, কোনটা পর্ব্বতের গায়ে, কোনটা বা তিন চারি বিঘা সমতলভূমির উপর কিন্তু শ্রীনগর ষোল বিঘে কি তার চেয়ে বেশী সমতলজায়গা দখল ক'রে আছে। বাজারের সমস্ত দোকানই প্রায় কোঠাঘর। দোকান বিস্তর, আর সে সকল দোকানে নানা রকম জিনিস পাওয়া যায়। এমন কি নিকটে আর কোন জায়গায় যে সকল জিনিস দেখা যায় না, এখানে তাও পাওয়া যায়। আর এই জন্যই সমস্ত গাড়োয়ালের লোক এখান থেকে দরকারী জিনিস কিনে নিয়ে যায়। তবে এদেশের লোকের দরকারী জিনিসের সংখ্যা নিতন্ত কম - লবণ, লঙ্কা, আটা ও কাপড় হ'লেই সকলের বেশ চলে যায়। এগুলি ছাড়া আর সমস্ত জিনিসই বিলাসের

উপকরণ ব'লে সাধারণের বিশ্বাস৷ বাজারে যে পঞ্চাশ ষাটখানা দোকান আছে, তার প্রায় সকলগুলিই হিন্দুর – দুই একখানা মাত্র মুসলমানের দোকান৷ শ্রীনগরে এই দুই একঘর মুসলমান দোকানদার ছাড়া সমস্ত গাড়োয়ালে আর মুসলমান অধিবাসী নেই৷
শ্রীনগরে পৌঁছে বাসাভাড়া করার পর সেখানে পরিচিত যে দুই একজন লোক ছিলেন, তাঁদের কাছে আমাদের শুভাগমন সংবাদ পাঠান গেল৷ তাঁরা অবিলম্বে আমাদের বাসায় এসে উপস্থিত হ'লেন এবং আমাদিগকে তাঁদের বাড়ী নিয়ে যাবার জন্যে যথোচিত পীড়াপীড়ি আরম্ভ করলেন; কিন্তু আমি তাঁদের বললুম, এখানে আমরা একরাত্রি মাত্র থাক্‌বো, বাসাতেই আহারাদির আয়োজন করেছি, অতএব আর কোথাও নড়াচড়া না ক'রে বদ্রীণারায়ণ হ'তে ফেরবার সময় তাঁদের বাড়ী যাব; এই কথায় বন্ধুবর্গকে তখন বুঝিয়ে স্থির করা গেল৷ আহার ও বিশ্রামের পর বিকেলে সহর দেখতে বের হলুম৷ শ্রীনগরের দর্শনযোগ্য স্থানের বিবরণের আগে, উপক্রমণিকায় তার একটু ইতিহাস দেওয়া দরকার, কারণ ইতিহাসের সঙ্গে তার একটু সম্বন্ধ আছে৷

অনেকদিন আগে একবার নেপালের রাজা গাড়োয়াল রাজ্য আক্রমণ করেন৷ গাড়োয়ালের রাজা যুদ্ধে পরাস্ত হন এবং পর্ব্বতে পলায়ন করেন৷ এই সময় হ'তে গাড়োয়াল নেপালের অধিকারভুক্ত হয়৷ কিন্তু এই সময়ে এখানে কি রকম শাসনপ্রণালী অবলম্বন করা হ'য়েছিল তার কোন বিবরণ পাওয়া যায় না৷ তবে রাজপ্রাসাদে ও দুর্গে নেপালীদের অত্যাচারের চিহ্ন আজও বেশ দেখা যায়৷ যা'হোক গাড়োয়ালরাজ উপায়ন্তর না দেখে ইংরেজের সঙ্গে সন্ধি স্থাপন করলেন এবং তাদের সাহায্যে গাড়োয়াল স্বাধীন হ'লো৷ কিন্তু এই স্বাধীনতা প্রায় অর্দ্ধেক গাড়োয়ালের পরিবর্তে ক্রীত হ'য়েছিল; কারণ যুদ্ধের ব্যয়স্বরূপ গাড়োয়ালের অনেকখানি অংশ ইংরাজরাজ গ্রহণ করেন – এই অংশের নামই বৃটিশ গাড়োয়াল আর অবশিষ্ট অংশের নাম স্বাধীন গাড়োযাল; তবে নেপাল বা ভোটের মত স্বাধীন নয়; যাঁরা অনুগ্রহ ক'রে পরের হাত থেকে রাজ্য জয় ক'রে দিলেন – আবশ্যক হলে যে তাঁরা তা কেড়ে নিতেও পারেন, এ কথা বলাই বাহুল্য৷ তবে এ অবস্থায় যতখানি স্বাধীনতা থাকার সম্ভাবনা , গাড়ওয়ালের তা যথেষ্ট আছে৷ আর স্বাধীন গাড়োয়ালের আর একটু ভরসা এই যে, তাতে প্রলোভনের এমন কিছুই নেই, যে জন্যে এদেশে দেশীয় পাগড়ীর পরিবর্তে রাতারাতিই ইংরেজের টুপি ও ছড়ির আমদানী হ'তে পারে; বরং প্রলোভনের যেটুকু ছিল, সেটুকুর আপদ অনেক আগেই চুকে গেছে৷ নেপালের কবল থেকে গাড়োয়াল উদ্ধার ক'রে ইংরেজ গাড়োয়ালের উৎকৃষ্ট অংশটুকুই অধিকার ক'রেছেন৷

অলকানন্দার পূর্ব পার ইংরেজের অধিকার, পশ্চিম পার গাড়োয়াল রাজ্য বা টিহরীর রাজার সীমানা৷ দেবপ্রয়াগে অলকানন্দা গঙ্গার সঙ্গে মিশেছে; সুতরাং গঙ্গার পূর্ব পার ইংরেজের, পশ্চিম অংশ টিহরী রাজার৷ হরিদ্বার ও হৃষিকেশ যদিও গঙ্গার পশ্চিম পারে , কিন্তু ইংরেজের অধিকারে ; ওদিকে মসুরী ও ল্যাণ্ডর সহরও ইংরেজের৷ ল্যাণ্ডরের পূর্বপ্রান্তের একটা রাস্তা হ'তেই টিহরীর সীমানা আরম্ভ৷ মসুরী ও ল্যাণ্ডর আগে টিহরী রাজারই ছিল, পরে গবর্ণমেণ্ট তা কিনে নিয়েছেন৷ টিহরীর রাজা মাটীর দরে পর্ব্বতের যে জঙ্গলময় অংশ বেচেছিলেন, কে জানতো যে কয়েক বছর পরে মহাসমৃদ্ধ দু'টি নগর

স্থাপিত হবে এবং তা ভারতের শ্রেষ্ঠ বিলাসীদের জন্যে গ্রীষ্মকালের বিরামকুঞ্জে পরিণত হ'বে ?

নেপালরাজ গাড়োয়াল আক্রমণ করবার পর – গাড়োয়ালরাজ রাজ্য ত্যাগ ক'রে পলায়ন করলেন। নেপালীরা অরক্ষিত প্রাসাদ ও সুরম্য রাজপুরী সম্পুর্ণরূপে শ্রীভ্রষ্ট করে ফেলেছিল। পরে ইংরেজের সহায়তায় যখন গাড়োয়াল পুনর্জীবিত হ'লো, তখন গাড়োয়ালের রাজা আর শ্রীনগরে ফিরে এলেন না; তিনি শ্রীনগর হ'তে বত্রিশ মাইল উত্তর–পশ্চিম অলকানন্দার অপর পারে টিহরীতে পলায়ন ক'রেছিলেন; – সেই জায়গাটা সুন্দর ও সুরক্ষিত দেখে সেইখানেই তিনি বাস করতে লাগলেন। শ্রীনগর ইংরেজরাজ্যের অধিকারভুক্ত হ'য়ে বৃটিশ গাড়োয়ালের প্রধান নগররূপে পরিণত হ'লো। তা হ'লো বটে, কিন্তু ইংরেজের কাছারী সেখানে রৈল না; শ্রীনগর হ'তে ৬ মাইল দূরে পাহাড়ের উপরে ''পাউড়ি''তে কমিশনার সাহেবের পীঠস্থান হ'লো, একটা রেজিমেন্টের আড্ডা পড়লো, এবং আফিস আদালত সমস্ত সেখানে স্থাপিত হ'লো; কেবল ডাক্তারখানা শ্রীনগরে। ''পাউড়ি''র কাছাড়ীবাড়ী ও সাহেবদের বাড়ী তৈয়ারীর জন্যে গাড়োয়াল রাজ্যের বহুমূল্য সুন্দর প্রাসাদের অনেক ভগ্নাবশেষ সেখানে চালান হ'য়েছে। ''পাউড়ি''তে একবার যাবার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু সময় ও সুযোগের অভাবে যাওয়া হয় নি।

আমার বন্ধু পণ্ডিত হরিকিষণ অপরাহ্নে আমাদের সঙ্গে নিয়ে প্রথমেই ডাক্তারখানায় গেলেন। ডাক্তারখানায় অনেকগুলি রোগী দেখা গেল। ডাক্তারবাবু বাঙালী কায়স্থ, বাড়ী কলিকাতার বাগবাজারে। তিনি এখানে সপরিবারে বাস কচ্ছেন। এই পর্ব্বতের মধ্যে একঘর বাঙালী ভদ্রলোক গৃহস্থ দেখে ভারি আনন্দ হ'লো। তাঁর সুন্দর প্রফুল্ল ছেলেমেয়েগুলি দেখে বোধ হলো, আমরা আবার যেন বাঙলাদেশে ফিরে এসেছি। ডাক্তারবাবু আমাদের যথেষ্ট যত্ন করলে। তাঁর যত্ন ও আগ্রহে আমরা খুব সন্তুষ্ট হয়ে ডাক্তারখানায় পরিদর্শন করতে বের হলুম। গবর্ণমেন্টের সাধারণ ডাক্তারখানায় রোগী সম্বন্ধে সাধারণতঃ যে রকম বন্দোবস্ত হয়ে থাকে, এখানেও সে চিরাগত নিয়মের কোন ব্যতিক্রম দেখা গেল না, সুতরাং সেখানে আর বেশী সময় না কাটিয়ে পুরাতন রাজবাড়ীর ভগ্নাবশেষ দেখতে গেলুম। গিয়ে দেখি সে এক লঙ্কাদগ্ধের ব্যাপার । রাশি রাশি ইট আর পাথর স্তূপাকারে পড়ে আছে, আর যদি দুই এক বছর পরে কোন পর্যটক এখানে আসে, ত এই স্তূপীকৃত ইট পাথরকে সুশ্যামল শৈবাল সজ্জিত দেখে একটা ছোট–খাট গিরিশৃঙ্গ বলে মনে করবে। সেই নীরস, অনাবৃত পাহাড়ের বুকে ভগ্ন–প্রাসাদের বড় বড় দেয়ালগুলো হাঁ করে রয়েছে; তার খানিকটে তফাতে একটা পাথরের প্রকাণ্ড সিংহদ্বার – বহুকাল হতে এমনি অসহায় অবস্থায় ঝড়বৃষ্টির সঙ্গে যুদ্ধ করে কাৎ হয়ে পড়েছে এবং সেই অবস্থাতেই আরো কয়েক বছর ঝড়বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করার দুঃসাহস প্রকাশ করছে। এক ধারে একটা ভাঙা মন্দির বহুদিন আগে তার দরজাজোড়া একদল ধর্ম্মধ্বজী নেপালী এসে তুলে নিয়ে গিয়েছে; বোধ করি তা দিয়ে পশুপতিনাথের কোন মন্দিরের সিঁড়ি তৈয়েরি হয়েছে। আমরা সেই পুরাণো রাজবাড়ী ঘুরে–ফিরে দেখতে লাগলুম। অনেক দূরে একটা বড় মন্দির; পাথরে নানারকম দেবদেবীর মূর্ত্তি ; সকলেই হিন্দুদেবমূর্ত্তি কি না ঠিক বুঝতে পারলুম না, – বুঝবার জন্যে তেমন চেষ্টাও করি নি। একটা জায়গায় দেখলুম শ্রীযুত গজানন মহাশয় , তিনিই দেবতাকূলে সবচেয়ে নিরীহ – হস্তচতুষ্টয়ে গদা ও তীরধনুক নিয়ে মহাতেজে অগ্রসর হচ্ছেন। – নিরীহ কেরাণী দেবতাটীর এই যুদ্ধসাজ বড়ই অমানান দেখাচ্ছিল। মহাভারতে ত কোথাও গনেশের একটা বীর–পরাক্রম প্রকাশের কারণ উল্লেখ

দেখা যায় না, তবে যদি অন্য কোন পুরাণে এ সম্বন্ধে কিছু থাকে, তা হলে একটা কথা বটে। কতকগুলি দেবতার চেহারা চক্ষে একটু নতুন ঠেক্‌লো; তেত্রিশকোটির মধ্যে হতে তাঁদের চিনে নেওয়া আমাদের মত লোকের পক্ষে বিলক্ষণ কঠিন ব্যাপার। তবে একটা কথা মনে হলো যে, যদি সেগুলি হিন্দু দেবমূর্তি না হয়, তবে নিশ্চয়ই বৌদ্ধ দেবমূর্ত্তি হবে, কারণ নেপালীরা যখন সেখানে ছিল, তখন তার যে দুই এক জায়গায় নিজেদের ভাস্কর বিদ্যা প্রকাশ করেনি, এ কখন সম্ভব নয়। একটা চক এখনও বর্তমান আছে, শুনলুম তার ভিতরে সাপ বাঘ ও ভল্লুকের চিরস্থায়ী আড্ডা হয়েছে। দেখলুম তার ফুকোরের মধ্যে রাজ্যের পাখী বাসা করেছে; আর ভিতরে দুই একটা ফাটল দিয়ে বড় বড় অশ্বত্থ গাছ মাথা তুলেছে। এই সমস্ত দেখে-শুনে চকের মধ্যে আর প্রবেশ করতে সাহস হলো না।

চকের সম্মুখেই নহবতখানা। এটা এখনও ঠিক আছে, কোনদিক আজও ভেঙে পড়ে নি। আমাদের সঙ্গী একটা ছোকরা ভিতরে গিয়ে কোন দিক দিয়ে একেবারে নহবতের চূড়ায় উঠে বসলো। শুনলাম উপরে উঠবার রাস্তা সহজে চিনে নেবার যো নেই; যারা সে রাস্তা বেশ চেনে, তারাই সহজে উপরে উঠতে পারে। আবার তার ভিতরে হারানও নাকি খুব সহজ; কিন্তু তাতেও আমরা উপরে উঠ্‌বার ঝোঁক ছাড়ি নি। শেষে যখন শুনলুম তার ভিতর বহুজাতীয় সর্পবংশের নির্বিবাদ বংশবৃদ্ধি ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন হচ্ছে, তখন আমাদের প্রবল ঝোঁক অবিলম্বে ছেড়ে গেল। বেলা যায়, সূর্য্যের উজ্জ্বল কিরণ এসে প্রাসাদের ছাদহীন উন্মুক্ত প্রাচীরে গায়ে হেলে পড়েছে, চোখে বড় খট্‌কা লাগলো। এই অতীত কীর্তির ভগ্নাবশেষ ও মনুষ্য গৌরবের অসারতার চিহ্নের উপর অমানিশার গাঢ় অন্ধকার যবনিকাই সম্পূর্ণ উপযোগী।

এখান হ'তে আমরা কেদারনাথ মহাদেব দেখতে গেলুম। কাশীর বিশ্বেশ্বরের আকার ও কেদারনাথের আকার অনেকটা এক রকম; একটির অনুকরণে যেন আর একটি তৈয়ের হয়েছে, কিন্তু কোন্‌টি ''অরিজিনাল'', তা স্থির করা বড় কঠিন। কাশীতে বিশ্বেশ্বরের মাথায় কলসী বা ঘটী করে জল ঢালতে হয়, কিন্তু এখানে কেদারনাথের মাথায় হিমালয় একটি ঝর্ণা উৎসর্গ করে দিয়েছেন; তা থেকে অবিরাম অবিশ্রাম জল পড়ে কেদারনাথের মাথা ঠাণ্ডা হচ্ছে। কেদারনাথের মন্দির অলকানন্দার ঠিক উপরে; মন্দিরের কোন রকম জাঁকজমক নেই। কাছেই এক-ঘর সেবাইতের বাড়ী। তার অবস্থা দেখেই দেবতার আর্থিক অবস্থা বেশ অনুমান করে নিলুম। উভয়েই দেখলুম কোন উপায়ে দুর্ভিক্ষের হাত থেকে আত্মরক্ষা করে আপনাদের সম্মন ঘোষিত কচ্ছেন। এখান হতে ফিরে বাজারে এলুম। দেখলুম ভিন্ন ভিন্ন দোকানে নানারকম জিনিস খরিদবিক্রী হচ্ছে। আমার মনে পড়ে, অনেক দাম দিয়ে আমরা এখানে তিনটে গোল বেগুন কিনেছিলুম। বাজারে একবার পানের অনুসন্ধান করা গেল, কিন্তু তা পাওয়া গেল না; শীতকালে মধ্যে মধ্যে এখানে পানের আমদানী হয়, কিন্তু বছরের অন্য কোন সময়ে তা পাওয়া কঠিন।

আমরা সন্ন্যাসী বটে, কিন্তু তাই বলে ভাল জিনিসের প্রলোভন ত্যাগ করার সংযম কিচ্ছুই শিখি নি; কাজেই আমাদের খানিকটা সময় জিনিসপত্রে দরদাম করতেই কেটে গেল। বৈরাগ্য-ধর্ম অবলম্বন করে সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়েছি, তখনো দর কচ্ছি, '' না বাপু, তিন পয়সা হবে না, দু পয়সা পাবে, দাও'' - এবং দুপয়সায় যখন তা পাওয়া গেল,

তখন সেই একজন বল্লে, ''ওটার একপয়সা দাম হওয়াই উচিত ছিল'' – অমনি এক পয়সা ঠকিচি মনে করে আমাদের দীর্ঘকালের এত আদরের সন্ন্যাস এক পয়সার চিন্তাকে জড়িয়ে তার পুনরুদ্ধারের পথ খুঁজতে ব্যগ্র হয়ে উঠলো। শুধু আমরা নই, এরকম সন্ন্যাসী বিস্তর।

এখানকার বাজারের রাস্তাগুলি সমস্তই বাঁধান। সকল রাস্তাই পরিসরে তেমন বড় নয়, তবে একটা খুব চওড়া আছে। বাজারের মধ্য দিয়ে যেতে স্কুল দেখলুম। স্কুলটিতে মাইনর পর্য্যন্ত পড়ান হয়। এটা খৃষ্টান মিসনারীদের স্কুল; স্কুলের লাগাও হেডমাষ্টারের বাসা। হেডমাষ্টারের বাড়ী এই দেশেই, আগে তিনি ব্রাহ্মণ ছিলেন, এখন খৃষ্টান হয়েছেন। ''ইয়ং বেঙ্গল''দের যে সকল গুণ সর্বদা দেখা যায়, এ লোকটিতে তার কিছুরই অভাব দেখলুম না। বেশ মিষ্টভাষী, সদালাপী। তিনি খৃষ্টান বটে, তবে খৃষ্টধর্মে তাঁর যে কিছু আস্থা আছে, তা বোধ হলো না; ধর্ম একটা থাকলেই হল, এই রকম তাঁর মনের ভাব। তবু যে কেন তিনি খৃষ্টান হয়েছেন, তা আমি বুঝতে পারলুম না। যদি পূর্বধর্ম বদলিয়ে নূতন কোন ধর্ম অবলম্বন করতে হয়, তবে আমাদের এই নবাবলম্বিত ধর্মের উপর প্রবল আগ্রহ থাকা উচিত, যার ফলে আমরা পাপ ও অন্যায়ের খানিকটে উপরে উঠতে পারি। তা না করে যদি ''যথাপূর্ব তথাপর''রকমেই কাল কাটাই, তবে ধর্মমত বদলানও যা, না বদলানও তাই। অনেক পর মাষ্টারজির নিকট হতে বিদায় নিয়ে আমরা সকলে ফিরে এলুম।

তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমার সঙ্গী সন্ন্যাসিদ্বয় আর ''পাদমেকং ন গচ্ছামি'' বলে বসে পড়লেন। চারিদিকে এত সুন্দর দৃশ্য আর চাঁদের উজ্জ্বল শুভ্র আলোকে তা এমন মধুর দেখাচ্ছিল যে, এমন চুপ করে ঘরে পড়ে থাকা আমার কিন্তু কিছুতেই পুষিয়ে উঠলো না। পণ্ডিত হরিকিষণের সঙ্গে আবার বের হয়ে পড়লুম। পণ্ডিতজীর সঙ্গে আমার এই নূতন পরিচয় নয়, – কিছুদিন আগে তাঁর সঙ্গে প্রায় এক বৎসর কাটিয়েছি। তাঁর পুরো নাম শ্রীযুক্ত পণ্ডিত হরিকৃষ্ণ দুর্গাদত্ত রুরোলা। তাঁর পাণ্ডিত্য অসাধারণ; কিন্তু পাণ্ডিত্য অপেক্ষা তাঁর কবিত্বশক্তি অনেক বেশী ছিল। তিনি তাঁর রচিত একখানা কবিতাপুস্তক মোক্ষমূলরকে উপহার পাঠিয়েছিলেন। মোক্ষমূলর প্রত্যুত্তরে লিখেছিলেন; ''আমি যদি মৃত্যুর পূর্বে এই প্রকার কবিতার একটি লাইনও লিখিয়া যাইতে পারি, তাহা হইলে জন্ম সফল মনে করিব''। – অবশ্য এতে অধ্যাপকবরের যথেষ্ট বিনয় প্রকাশ হয়েছে; কিন্তু যার কবিতা পড়ে তিনি এরকম একটা মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন, তার প্রতিভাও প্রশংসনীয়। আজ নির্জ্জন পথে এই জ্যোৎস্না রাত্রে তাঁর সঙ্গে আমার অনেক দিনের অনেক পুরাণো কথা উঠলো।

পশ্চিমদেশে দুই সম্প্রদায় আছে, – একদল হিন্দু আর এক দল আর্য্য হিন্দুর দল আমাদের দেশের মত; তাঁদেরও 'হরিসভা ' আছে, তবে সে সভার নাম 'ধর্মসভা'; ধর্মসভা ''হিন্দুধর্মসভা'', কিন্তু আমাদের দেশের হরিসভার অপেক্ষা এই ধর্মসভার আলোচনার প্রসার একটু বিস্তৃততর। আমাদের দেশের হরিসভায় হরিনাম কীর্ত্তন, পুরাণাদি পাঠ, ইত্যাদিই হ'য়ে থাকে ; বড় জোর বাৎসরিক উৎসবের সময় কোন কোন সনাতন–ধর্ম্মপ্রচারক বক্তৃতা উপলক্ষে সেই পবিত্র সভায় দাঁড়িয়ে অন্য ধর্ম্মের বাপান্ত করেন। কিন্তু পশ্চিমের ধর্ম্মসভায় এ সমস্ত ছাড়াও অনেক বিষয়ের আলোচনা হয়।

''ধর্ম্মসভার '' প্রতিদ্বন্দী সভার নাম 'আর্যসমাজ' – এই সমাজ দয়ানন্দস্বামীর প্রতিষ্ঠিত। আর্যসমাজিগণ শুদ্ধ বেদের অনুমোদন ক'রে চলেন; এবং বেদ অভ্রান্ত ব'লে মনে করেন। তাঁদের মধ্যে জাতিভেদ নেই, পৌত্তলিক ক্রিয়াকর্ম্মও তাঁরা মানেন না। ইংরেজী লেখাপড়া জানা এবং উদার মতাবলম্বী প্রায় অধিকাংশ লোকই আর্যা আর্য্যদের সঙ্গেই আমাদের কিছু বেশি মেশামেশি ছিল; তবে পণ্ডিত হরিকিষণ ধর্ম্মসভার সম্পাদক ও একজন দিগ্বিজয়ী বক্তা হ'লেও তাঁর সঙ্গে আমার বেশ বন্ধুতা হ'য়েছিল। যখন দেরাদুনে ছিলুম, তখন এই দুই দলের তর্ক–বিতর্ক ও বক্তৃতার জ্বালায় তিষ্ঠান ভার হ'ত। সে সমস্ত বক্তৃতায় শাস্ত্র–কথা থাক না থাক প্রতিপক্ষের উপর তীব্র বাক্যবাণ বর্ষণ ক'রতে উভয় দলই সমান মজবুদ। একবার আমি আমার দুর্ভাগ্যবশতঃ এই রকম একটা সভায় গিয়ে পড়েছিলুম। সেদিন আমাদের পাণ্ডিতজি বক্তৃতা ক'রবেন – অপর পক্ষে আর্য্য–সমাজের একজন প্রচারক বলবেন; সভায় উপস্থিত হ'য়ে দেখি, কুরুপাণ্ডবের মত দু দল দুদিকে সার দিয়ে বসে গিয়েছেন; আমরা কোন দিকে বসি প্রথমে ত এই ভাবনাতেই অস্থির – শেষে কিছু ঠিক করতে না পেরে বক্তার টেবিলের সুমুখে ব'সে পড়লুম। বক্তৃতা হিন্দিতে নয়, বিশুদ্ধ সংস্কৃতে ; বেদ বা ধর্মাশাস্ত্র নিয়ে যাঁরা তর্ক করার স্পর্ধা রাখেন , সংস্কৃতে তাঁদের বেশি দখল থাকাই কর্ত্তব্য, তবে আমাদের বাঙালী প্রচারক মহাশয়েরা সেটা অনাবশ্যক মনে করেন। ধর্ম্মসভায় প্রথমে এক একজন ক'রে বক্তৃতা ক'রলেন , শেষে বসে বসে উভয়পক্ষে ঘোর তর্ক আরম্ভ হ'লো। সুর পঞ্চম ছেড়ে সপ্তমে উঠ্‌লো তার পরেই হাতাহাতির জোগাড়। বেগতিক দেখে আমি পলায়নের পথ খুঁজতে লাগ্‌লাম। কিন্তু এক অচিন্ত্যপূর্ব্ব কারণে হঠাৎ সভা ভেঙে গেল। তর্ক ক'রতে ক'রতে আর্য্যসমাজের একজন বক্তা তাঁর বক্তৃতার মধ্যে একটা ব্যাকরণ–অশুদ্ধ কথা প্রয়োগ করেছিলেন; – তাই শুনে হিন্দুসভার দল হো হো করে চীৎকার করে উঠলো – এবং হাততালি দিয়ে ''ব্যাকরণ নেহি জান্তা , বেদ বিশার করণেকো আয়া'' ব'লে সভা ভেঙে দিলো। এই রকম হঠাৎ সভাভঙ্গ না হ'লে সেদিনকার প্রচারকার্য্য হয় ত শ্রীঘর পর্য্যন্ত পৌঁছত। এ রকম ঘটনা আমাদের দেশেও খুব বিরল নয়। অনেকদিন পরে পণ্ডিত হরিকিষণের সঙ্গে দেখা হওয়াতে দুই সমাজ কি রকম কাজ ক'রছেন, এ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করলুম। কথাবার্ত্তায় অনেক সময় কেটে গেল; আমরাও এক পা দু পা ক'রে কমলেশ্বরে গিয়ে উপস্থিত হলুম।

কমলেশ্বর শ্রীনগরের খুব নিকটে, এমন কি এক মাইলের মধ্যে। কমলেশ্বরের নাম আগেই শুনেছিলুম, – ভেবেছিলুম, – হয় ত পাহাড়ের উপর একটা শিবমন্দির ছাড়া এখানে আর কিছুই নেই; কিন্তু কাছে এসে বুঝলুম, এ শুধু মন্দির নয়, একটি ছোটখাট রাজবাড়ী। চারিদিকে সমুচ্চ প্রাচীর–বেষ্টিত সিংহদ্বার। দ্বারে ''ভীষণ মূরতি'' দ্বারবান; তাদের মুখে বিনয়ের অভাব এবং ঔদ্ধত্যের ভাব দেখে স্বঃতই মনে হয় এরা দেবমন্দিরের সংস্পর্শে আস্‌বারও সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। চারিদিকের ব্যাপার দেখে বুঝলুম, এটা কখন সন্ন্যাসীর আশ্রম নয়। মঠধারী যদিও সন্ন্যাসী কিন্তু এই মঠের ত্রিসীমায় সন্ন্যাসের কিছুই নজরে পড়ে না; সুতরাং তাঁরাও অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিকারী, এবং যদিও তাঁরা সন্ন্যাসী, তবু যে রকম বিলাস–লালসা ও প্রলোভনের মধ্যে তঁরা চিরজীবন ডুবে থাকেন, তাতে তাঁদের সন্ন্যাসধর্ম্মের বর্ণ–পরিচয়টুকুও হয় কিনা সন্দেহ। এই কমলেশ্বরের মহান্ত সম্বন্ধেও আমার এই রকম একটা বিশ্বাস দাঁড়িয়ে গেল; কিন্তু ভিতরের ব্যাপার জানবার জন্য আমার বিশেষ কৌতূহল হ'লো।

আমরা সিংহদ্বার পার হ'য়ে প্রকাণ্ড একটা দ্বিতল চকের প্রাঙ্গণে উপস্থিত হ'লুম; সেই প্রাঙ্গণের একপাশে শ্বেতপ্রস্তরনির্ম্মিত লোহার গরাদে দেওয়া এক অনতিদীর্ঘ শিবমন্দির; মন্দিরের মধ্যে মহাদেব লিঙ্গমূর্তিতে বিরাজমান। মন্দিরের বাইরে একটা প্রকাণ্ডকায় পিতলের ষাঁড়। প্রাঙ্গণটি পাথরে বাঁধান; পুরোহিত, ব্রাহ্মণ, অতিথি, অভ্যাগত ও যাত্রিদলে সেই প্রাঙ্গণ এবং টানা বারান্দাগুলি পরিপূর্ণ। আমরা গিয়ে শুনলাম, আরতির সময় হয়েছে, তাই এত জনতা। অন্যান্য দর্শকের মত আমরাও একপাশে দাঁড়ালাম, অবিলম্বে ঠাকুরের আরতি আরম্ভ হ'লো।

হঠাৎ চারিদিকে ''তফাৎ তফাৎ'' শব্দ পড়ে গেল। বুঝলাম মহান্ত বাবাজী আসছেন। তাঁর আগে তিনচারজন চাকর উগ্রমূর্তিতে দর্শকদের তফাৎ ক'রতে লাগলো। একজন বৃদ্ধা একটি ছোট ছেলের হাত ধ'রে আরতি দেখতে এসেছিল, মোহান্ত বাবাজীর পরিচারকদের ধাক্কায় ছেলেটি দর্শকদের পায়ের তলায় প'ড়ে গেল। বৃদ্ধা ভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল, – সেই ছেলেটিই তার অন্ধের নয়ন , বার্দ্ধক্যের যষ্টি। পরিচারকদের এই নিষ্ঠুর আচরণ দেখে, মোহান্ত বাবাজী যে কিছু অসন্তুষ্ট বা দুঃখিত হ'লেন, তা বোধ হ'লো না। তিনি কমলেশ্বরের সেবাইত; তাঁর পথের সম্মুখে দাঁড়ালে, এ রকম দু পাঁচটা খুন জখম হওয়া যেন নিতান্তই স্বাভাবিক। মহান্তের এ রকম ভাব দেখে মনটা বড়ই অপ্রসন্ন হয়ে উঠ্লো। পুরোহিত রঘুপতির আস্ফালন ও স্পর্দ্ধায় নিরাশ–ক্ষুব্ধ গোবিন্দমাণিক্যের মত আমার মনে হ'লো ––

''এ সংসারে বিনয় কোথায়? মহাদেবী,
যারা করে বিচরণ তোমার চরণ –
তলে, তারাও শেখে নি কত ক্ষুদ্র তারা !
তোমার মহিমা হরণ করিয়ে
আপনার দেহে বহে, এত অহংকার !''

যা হ'ক, যখন এসেছি, তখন শেষ পর্য্যন্ত দেখে যাওয়াই ঠিক ক'রে দাঁড়িয়ে রইলাম। মহান্ত প্রথমে কমলেশ্বরের উদ্দেশে প্রণাম করলেন, তারপর যতক্ষণ আরতি হ'লো, ততক্ষণ ধ'রে মন্দির প্রদক্ষিণ করলেন, অন্যান্য অনেক দর্শকও দূরে থেকে মন্দির প্রদক্ষিণ ক'রতে লাগলো। আরতি শেষ হ'লে মহান্ত ভিতরে প্রবেশ ক'রলেন। পণ্ডিতজি বললেন, মহান্ত এখন বৈঠকখানায় যাবেন – সেখানে আমাদের যাওয়ার কোন আপত্তি নেই; সুতরাং আমরাও তাঁর বৈঠকখানায় উপস্থিত হ'লুম। দেখলুম একটা প্রকাণ্ড ফরাশ বিছানো আছে; একপাশে একটা উঁচু গদি ও তাকিয়া খুব কারুকার্য্যখচিত এবং বেশ সুকোমল। বুঝলুম মহান্ত মহাশয়ের সেইটিই আসন, – সন্ন্যাসীর উপযুক্ত আসনই বটে।

আমরা যে সময় বৈঠকখানায় গেলুম, তখন মহান্ত মহাশয় হাত মুখ ধুতে বারান্দায় গিয়েছিলেন; আমরা ব'সে ব'সে ভিতরের দিকে আর একটা খুব জমকালো চক দেখলুম। সেটা মহান্তের অন্তঃপুর। এই অন্দরে অবশ্য পরিবারাদি কেউ নাই; সেখানে তাঁর শয়নকক্ষ, বিশ্রামকক্ষ ইত্যাদি আছে। অন্যান্য মহান্তের ন্যায় কমলেশ্বরের

মহান্তেরাও চিরকুমার থাকেন, মৃত্যুকালে চেলাদের মধ্যে কাকেও উত্তরাধিকারী ক'রে যান। বর্ত্তমান মহান্তের বয়স পঁয়ত্রিশ ও চল্লিশের মধ্যে ব'লে বোধ হ'লো, দেখতে বেশ হৃষ্টপুষ্ট। কোন মঠের মহান্তকেই ত এ পর্য্যন্ত কাহিল দেখলাম না; মহাদেবের সেবাইত ও ষণ্ড উভয়েই চিরকাল দিব্য সুগোল-দেহ।
কথাবার্ত্তায় মহান্তজি মন্দ নন। আমাকে দুই একটা কথা জিজ্ঞাসা ক'রলেন, বাঙ্গালা দেশ ভাল কি এদেশ ভাল, এ সম্বন্ধে আমার মতামত জান্‌তে চাইলেন। তিনি একবার তীর্থভ্রমণোপলক্ষে কাশীজি গিয়েছিলেন, সেখানে বিশুদ্ধানন্দ সরস্বতীর সঙ্গে তাঁর দেখা হ'য়েছিল, সে কথাও ব'ললো। তারপর তিনি নানারকমের গল্প আরম্ভ ক'রলেন - খোসামুদেরাও খুব প্রতিধ্বনি ক'রতে লাগলো। দেখ্‌লাম বাবাজির আধ্যাত্মিকতা ও ভগবদ্ভক্তি আমাদের চেয়ে বড় জেয়াদা নয়, অন্ততঃ কথাবার্ত্তায় ত এইরকমই বোধ হ'লো। যিনি সব ছেড়ে শুধু শ্মশান ও ভস্মমাত্র সার ক'রেছিলেন, তাঁর সেবাইতের এ রকম বিলাসপ্রিয়তা, এ রকম মোসাহেবের দল এবং এই প্রকার রাজভোগ কতটা ন্যায়সঙ্গত, সে বিষয়ের বিচার বাহুল্য। অতুল ঐশ্বর্য্যের মধ্যে থেকে মনটা খাঁটি ও নির্লিপ্ত রাখার বাহাদুরী আছে বটে, কিন্তু মানুষের দুর্ব্বল হৃদয়ের পক্ষে সে কাজটা বোধ হয় বিশেষ শক্ত। চারিদিকের অগণ্য স্তুতিবাদ ও দেশ বিদেশ হ'তে প্রেরিত বহুমূল্য উপহার-সামগ্রীর যথেচ্ছ ব্যবহার, যথার্থ বৈরগ্যাবলম্বী সন্ন্যাসীর কখনই প্রীতিকর নয়। কমলেশ্বরের মহান্তকে দেখে, তাঁর সম্বন্ধে এই সমস্ত আলোচনা আমার মাথায় আসছিল। তিনি কি জানতেন যে, চারিদিক হ'তে যখন তাঁর কথায় প্রতিধ্বণি উঠছে, অনুচরগণ শতমুখে তাঁর মহিমাকীর্তন ক'চ্ছে, সেই সময়ে তারই গৃহপ্রান্তে বসে একজন প্রবাসী অতি রূঢ়ভাবে তাঁর বিষয়ে আলোচনা ক'রছি ? - আমিও জানতাম না যে আমার সেই অসংযত সমালোচনা পুঁথিগত হ'য়ে অনেকের সম্মুখে উপস্থিত হবে।

যা হোক মহান্ত বাবাজির সেই সমস্ত বাজে গল্প ধৈর্য্যধারণপূর্ব্বক শোনা আমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব হ'য়ে উঠলো। আমি পণ্ডিতজিকে ইসারা ক'রে উঠবার জন্য ব'ললাম। আমাদের উঠবার উপক্রম দেখে মহান্তজি প্রসাদ পাবার জন্যে অনুরোধ করলেন; কিন্তু আমার সঙ্গে আরো লোক আছেন, তাঁর হয়ত খাবার প্রস্তুত ক'রে আমার জন্যে অপেক্ষা ক'চ্ছেন, এইরকম একটা কথা ব'লে তাড়াতাড়ি উঠে এলুম। বাস্তবিক সেখানে প্রসাদ পাবার তেমন কিছু প্রলোভন ছিল না, কারণ পণ্ডিতজি অপরাহ্নে এমন এক সিধে পাঠিয়েছিলেন যে, তাতে আমাদের পাঁচদিন বেশ সমারোহ ক'রে চলতে পারে। এর উপরে আবার আমাদের পরিচিত বন্ধুবান্ধবগণ দেখা করতে এসে যথেষ্ট মিষ্টান্ন উপহার দিয়ে গিয়েছেন। আমার সঙ্গী বৈদান্তিক ভায়া পৃথিবীটা মায়াময় বলে নস্যাৎ করতে কিছুতেই রাজী হন নি। বৈদান্তিকের দন্তের ক্রিয়া দেখে আমিও অবাক। আমার ভয় হ'য়েছিল সন্দেশগুলা বৈদান্তিকের যথেষ্ট মুখরোচক হলেও তাঁর পাকযন্ত্র সেগুলা হয় ত খুব সমাদরে গ্রহণ ক'রবে না।
কমলেশ্বরের মন্দির হ'তে যখন বাসায় ফিরলুম, তখন অনেক রাত হ'য়েছে। বাসায় এসে দেখি সেখানে দলে দলে লোক জমে গিয়েছে, আর পূজনীয় স্বামীজি সেখানে তুলসীদাসের পদ ব্যাখ্যা করছেন। পাউড়ী হ'তে একজন বন্ধুর আসার কথা ছিল, তিনি তখনও এসে পৌঁছন নি, সুতরাং পরদিন তাঁর জন্যে শ্রীনগরে অপেক্ষা করবো কি না, এই ভাবতে লাগলাম; এবং শেষে আর একদিন শ্রীনগরে থাকাই মনস্থ করলাম।

১৫ ই মে, শুক্রবার। – আজ শ্রীনগরে অবস্থিতি। সকালে কি দু' পুরে কোথাও বের হ'ইনি। বিকেলে নদী পার হ'য়ে অপর পারে পাহাড়ে বেড়িয়ে এলুম। দর্শনযোগ্য বিশেষ কিছু নেই, দু' তিনটে ভগ্নপ্রায় শিবমন্দির দেখা গেল। পাহাড়ের উপরেই মন্দির – খুব প্রাচীন; পাহাড়ের নাম ইন্দ্রাকিল পাহাড়। শ্রীনগরের গায়ে যে পাহাড় তার নাম অষ্টাবক্র পর্বত। স্থানীয় লোকের মুখে শুনলাম, অষ্টাবক্র মুনি এই পর্বতে দীর্ঘকাল তপস্যা করেছিলেন। তপস্যার উপযুক্ত স্থান তার আর সন্দেহ নাই, কিন্তু কোথায় অষ্টাবক্র ঠাকুরের আশ্রম বা তপোবন ছিল, তা বিশেষ চেষ্টা ক'রেও জানতে পারি নি। কারণ কারও মত এই যে, যেখানে ইংরেজরা ''পাউড়ী'' নগর স্থাপিত করেছেন,সেখানেই অষ্টাবক্র মুনির গুহা ছিল।
এখানকার রাজকার্য করবার জন্য একজন ''সুপারিন্টেনডেন্ট'' আছে। আমাদের দেশে ম্যাজিষ্ট্রেট কালেক্টার এবং পুলিসের যে কাজ তা এই সুপারিন্টেনডেন্টের হাতে। এতদ্ভিন্ন এখানে চারজন ডেপুটি ও চারজন তহবিলদার অর্থাৎ সবডেপুটি আছেন। এ ছাড়া কাজ বেশী পড়লে সময় সময় বাহিরের লোকও নেওয়া হয়। অন্যান্য অফিসের মত পাউড়ীতে একটা টেলিগ্রাফ আফিসও আছে। এক কথায় এই সুদূর দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে ইংরেজ তাঁদের সুখ–স্বচ্ছন্দতা ও আরাম বিরামের প্রয়োজনমত যতটুকু দরকার, সব ঠিকঠাক ক'রে নিয়ে বেশ নিরুদ্বেগে দিনগুলো কাটিয়ে দিচ্ছে।

রুদ্র প্রয়াগ

১৫ ই মে, শুক্রবার। –– আজ শ্রীনগরে আছি। বিকেলে নদী পার হ'য়ে অপর পারে পাহাড় দেখতে গিয়েছিলাম, সন্ধ্যার পূর্বে ফিরে আসা গেল। খানিক পরে পাহাড়ের পাশ দিয়ে চাঁদ উঠে সন্ধ্যার অন্ধকার দূর ক'রে দিলো। তখনও আলো তত উজ্জ্বল হয় নি; সেই অস্পষ্ট আলোকে বহুদূরে সমুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গগুলি যেন আকাশের পটে আঁকা ছবির মত বোধ হ'তে লাগলো। অনেকক্ষণ ঘুরে বেড়ানতে শরীর একটু পরিশ্রান্ত হ'য়েছিল, কিন্তু সে জন্যে চুপ ক'রে প'ড়ে থাকবার লোক আমি নই। খুব উৎসাহের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করলাম। এই নির্জ্জন পাহাড়ের কোলে ব'সে আমাদের দেশের ও সমাজের কথা চলতে লাগলো। জাতীয় মহাসমিতির উদ্দ্যেশ্যে, আশা ও আকাঙ্খা সম্বন্ধে যখন কথোপকথন হ'লো, তখন দেখি উৎসাহ ও আনন্দে বৃদ্ধ স্বামিজীর গম্ভীর এবং অচঞ্চল মুখকান্তি মধ্যে মধ্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠ্‌ছে। মহাসমিতিতে একটা শুধু রাজনৈতিক জীবনের প্রতিষ্ঠা দেখি, এবং নিদ্রামগ্ন জাতি যে দীর্ঘকালের জড়তা ত্যাগ ক'রে নিজের নিজের একটা অধিকার লাভের চেষ্টা করছে, এই ভেবে বিশেষ আনন্দ অনুভব করি; কিন্তু স্বামিজী এরমধ্যে শুধু প্রাণের নয়, প্রেমের প্রতিষ্ঠা দেখেছেন; সেই প্রেমের মূল্য সমস্ত রাজনৈতিক অধিকারের মূল্যের চেয়ে বেশী। স্বামিজীর সঙ্গে কথা কইতে কইতে – অচ্যুতবাবাজি এসে পাশে বসলেন, এবং একটা সামান্য কথা ধ'রে বেদান্তের তর্ক পাড়লেন। তর্কে আমি পশ্চাৎপদ নই, আর ইংরেজী প'ড়ে অনধিকারচর্চ্চা করবার ঝোঁকটাও আছে। স্কুলে কলেজে যে সব কৈতাব পড়া হয়, তাতে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল জিনিসের কথাই কিছু কিছু আছে। তার উপর আজকাল স্বাধীনচিন্তার দিন; সুতরাং আমাদের ক্ষুদ্র মতগুলিকে তর্কজালে গগনস্পর্শ করে বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানসিদ্ধ পূজনীয় ব্যক্তির উপর বর্ষণ ক'রতে আমাদের কিছু সঙ্কোচ হয় না। এ অবস্থায় যে বৈদান্তিকের

সঙ্গে তর্কক্ষেত্রে অবতীর্ণ হ'বো, তার আর আশ্চর্য্য কি।

আমাদের তর্কের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি দেখে স্বামিজী কম্বল মুড়ি দিয়ে শয়ন ক'রলেন। তিনি তর্ক সমুদ্র পার হ'য়ে এখন বিশ্বাসের তীরে এসে দাঁড়িয়েছেন; তাঁর এ সব ভাল লাগবে কেন ? তাই যখন আমরা কিঙ্কর্মা দুটি লোক ক্রমাগত বাক্যবর্ষণ ক'রে পৃথিবীর সৃষ্টিস্থিতি লয় ক'রতে প্রবৃত্ত হ'লাম, তখন তিনি নিদ্রার উদ্যোগ ক'রলেন; কিন্তু কানের গোড়ায় এ রকম কলরব হ'লে সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীরও নিদ্রাকর্ষণের পক্ষে বাধা জন্মে, সুতরাং তিনি কম্বল ছেড়ে উঠে একটি গান জুড়ে দিলেন; তার সবটা মনে নেই, দুটো লাইন এই :-
''গোলমালে মাল মিশে আছে;
ওরে, গোল ছেড়ে মাল লওরে বেছে।''
আমাদের তর্ক-বিতর্কের এর চাইতে আর কি ভাল মীমাংসা হবে। রাত্রি অধিক হ'লো দেখে সে দিনের মত বেদব্যাসের বিশ্রাম দেওয়া গেল।
শ্রীনগরের সব ভাল; মন্দের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র জীব, নাম বৃশ্চিক। এখানে বৃশ্চিকের ভয় অত্যন্ত বেশী, বিশেষ তার দংশনজ্বালা আজও আমার বেশ মনে আছে; সুতরাং যখন শয়ন করলাম, তখন বড় ভয় হ'তে লাগলো। সমস্ত রাত্রি এই ভয়ে পাশ পর্য্যন্ত ফিরি নি। ঘুমও ভাল হয় নি; স্বপ্নে সমস্ত রাত্রি বৃশ্চিক দেখেছি; আর বৈদান্তিকের তর্ক শুনেছি।

১৬ ই মে, শনিবার। - আজ প্রাতে শ্রীনগর ত্যাগ ক'রে ৯ মাইল রাস্তা চলে 'ধাড়ী' চটিতে এলাম। চটিতে এসে দেখি জনমানবের সম্পর্কশূণ্য অর্গলবন্ধ দু'তিনখানা পত্র-কুটীর পড়ে আছে। এখানে খাওয়া-দাওয়া হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই, ক্ষুধারও কিছুমাত্র অপ্রতুল নেই। গত দুদিন শ্রীনগরে যে সুখে ছিলাম, আজ তার প্রতিশোধ হ'লো। নিকটে এমন কোন গ্রাম নেই, যেখান থেকে খাবার যোগাড় ক'রে আনি, সুতরাং এ অবস্থায় সকলে যা করে আমরাও তাই করলাম; - বেশ পরিপূর্ণ রকম উপবাস করা গেল। ঘরে বসে উপবাস করার মধ্যে গুরুত্ব বিশেষ কিছুই নেই; কিন্তু এই পাহাড়ের মধ্যে নয় মাইল ''চড়াই ও উৎরাই'' শূণ্য পাকস্থলীতে পার হ'লে শরীরের যে কি দুর্দ্দশা হয়, তাহা ভুক্তভোগী ছাড়া আর কারো অনুভব করবার শক্তি আছে ব'লে বোধ হয় না। আমি যত কাতর হয়েছিলাম-আমার বোধ হ'লো আমার সঙ্গীদ্বয় তা অপেক্ষা একটু বেশী কাতর হ'য়েছিলেন। স্বামিজী বৃদ্ধ, তার উপর এই পথশ্রম; দীর্ঘকাল অনাহারে তাঁর কাতর হওয়া সম্ভব; কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া আমার অপেক্ষাও জোয়ান, তবু তাঁর এ রকম কাতরতার কারণ বোঝা গেল না; বোধ করি তাঁর পরিপাক-শক্তি ভোজনশক্তিরই অনুরূপ। ধর্মের কোন ধার ধারেন ব'লে বোঝা যায় না; খানিকটে শুষ্ক নীরস তর্ক পেলেই তিনি খুব পরিতৃপ্ত হন। আমাদের মত ডাল রুটি খাওয়ার পরিবর্তে যদি তিনি যোগীঋষির মত আমলা হর্ত্তকী খাওয়া অভ্যাস ক'রতেন, তা হ'লে কটা গাছ ফলশূণ্য ক'রতে পারতেন, তা আমি অনুসন্ধান ক'রে উঠতে পারিনে। অনাহারে ভায়ার মেজাজ বড় খিটখিটে হ'য়ে উঠলো, আজ আমার উপর তাঁর রাগটা কিছু বেশী, অবশ্য তার কারণও ছিল। শ্রীনগর হ'তে বে'র হ'বার সময় ভায়া আমাকে পুনঃ পুনঃ ব'লেছিলেন যে, রাস্তায় আর এমন সহর নেই; এখান হ'তেই কিছু খাবার সংগ্রহ ক'রে যাওয়া উচিত; বিশেষ পথে আজও চটি বসে নি; সুতরাং অনাহারে বড়ই কষ্ট পেতে হ'বে। সে সময় উদর পূর্ণ ব'লেই হোক-কি পুটুলি বেঁধে খাবার ঘাড়ে ক'রে

চলাটা ক্ষুধার সময় ছাড়া অন্য সময়ে প্রীতিকর নয় ব'লেই হোক – বৈদান্তিক ভায়ার সে প্রস্তাবে আমি কর্ণপাত করি নাই৷ সেজন্য আজ ভায়া আমার উপর গরম; এই সময়ে এই ক্ষুৎপীড়িত বৈদান্তিক প্রবরের জঠরানলে তর্কাহুতি প্রদানের ইচ্ছা আমার বিলক্ষণ প্রবল হ'য়ে উঠ্লো, কিন্তু স্বামিজীর ইঙ্গিত অনুসারে আমি নিরস্ত হলাম৷ উপায়ন্তর না দেখে একটা গাছতলায় পোড়ে নিতান্ত নিরুপায় ভাবে রৌদ্র ভোগ করা গেল৷

বেলা দুটো বাজতে না বাজতেই এখান হ'তে রওনা হ'বার জন্যে বৈদান্তিক ব্যতিব্যস্ত ক'রে তুললো৷ এত রৌদ্রে বের হ'তে কারো ইচ্ছ ছিল না, কিন্তু পাছে রাত্রিতেও অনাহারে আশ্রয়হীন হ'য়ে কাটাতে হয়, এই ভয়ে বেরিয়ে পড়া গেল৷ কিন্তু অদৃষ্টে কষ্ট থাকলে কে খণ্ডাতে পারে ? আজ কি শুভক্ষণেই পা বাড়ান গিয়েছিল, তা বলতে পারিনি৷ একটু যে না যেতেই এই বৈশাখ মাসের প্রবল রৌদ্র কোথায় চ'লে গেল এবং তার বদলে ভয়ানক ঝড় জল আরম্ভ হ'লো৷ কিন্তু এ রকম বিপদ আমাদের পক্ষে নূতন নয়৷ কোন রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে সেই বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে চার মাইল তফাতে একটা চটিতে উঠলাম৷ এ চটিটার নাম আমার ডাইরী থেকে মুছে গিয়েছে৷ এখানে একটা পাথরের কোঠা আছে, শুনলাম সেটা গবর্ণমেন্টের ধর্ম্মশালা৷ ছোট একটা কোঠা আর একটা ছোট বারান্দা৷ সেখানেই আড্ডা নেওয়া গেল৷ এখান হ'তে রাস্তায় মধ্যে মধ্যে এ রকম ধর্ম্মশালা না কি অনেক আছে৷ যা হোক এখানেই সেই রাত্রিবাসের আয়োজন করলাম; ভিজে কাপড়ে ও ভিজে কম্বলে কোন রকমে রাত্রি কেটে গেল৷

১৭ ই মে, রবিবার৷ খুব ভোরে রওনা হ'য়ে এগার মাইল পথ চ'লে রুদ্রপ্রয়াগে উপস্থিত হওয়া গেল৷ আমাদের দেশের লোক একটা প্রয়াগেরই নাম জানেন৷ তা ছাড়াও অনেক প্রয়াগ আছে৷ যারা বদ্রিকাশ্রম কি কেদারনাথ দর্শন ক'রতে গিয়েছেন, তাঁরা অবশ্য এ সকল দেখেছেন৷ কিন্তু এ সব কথা ছাপার অক্ষরে বড় একটা উঠে না, এ শুধু পুণ্যপ্রয়াসী তীর্থযাত্রীর মনে তীর্থের সুপবিত্র মহিমার সঙ্গে দীর্ঘ পথের স্মৃতি জড়িয়ে ভক্তির একটা অটল সিংহাসন প্রস্তুত ক'রে রাখে৷ সেই জন্যে সকল প্রয়াগের নাম সাধারণের জানার ততটা সম্ভাবনা নেই; কিন্তু কেদারখণ্ড নামক গ্রন্থে পাঁচটি প্রয়াগের উল্লেখ আছে৷ এলাহাবাদে বটপ্রয়াগ, কারণ সেখানে অক্ষয়বট আজও সশরীরে বর্তমান, তবে ক্রমাগত তেল সিন্দুর ঘর্ষণে বটপ্রবর এমন চেহারা বের ক'রেছেন যে, তিনি উদ্ভিদ কি আর কিছু, তা সহজে ঠাহর করা যায় না৷ বোধ হয় প্রলয়কালে বিষ্ণু বিশ্রাম কামনায় পত্রের অনুসন্ধানে এসে গুঁড়ি পর্য্যন্ত চিন্‌তে পারবেন না৷ বটপ্রয়াগের পর দেবপ্রয়াগ, সে কথা আগেই ব'লেছি; ক্রমে রুদ্রপ্রয়াগ, কর্ণপ্রয়াগ এবং নন্দপ্রয়াগ৷ ভারতবর্ষে সর্ব্বসমেত এই পাঁচটি প্রয়াগই ছিল; কিন্তু আরও একটি প্রয়াগের বৃদ্ধি হ'য়েছে, তার নাম বিষ্ণুপ্রয়াগ৷ ধীরে ধীরে সকলগুলির কথাই বল্‌বার ইচ্ছ আছে৷ পুরাণাদি গ্রন্থে এই অঞ্চলের নাম উত্তরাখণ্ড৷ ঐ সকল গ্রন্থে উত্তরাখণ্ডের অনেক মহিমার কথা লিপিবদ্ধ আছে৷ উত্তরাখণ্ডে বাস ক'রলে মহাপুণ্য সঞ্চয় হয়৷

রুদ্রপ্রয়াগে এসে আমরা বড়ই বিপদে পড়লাম৷ স্বামীজি জ্বরে পড়লেন; তবে সৌভাগ্য এই যে, গবর্ণমেণ্ট নির্ম্মিত ধর্ম্মশালায় আমাদের মাথা রাখার একটু জায়গা হ'লো৷ এই ধর্ম্মশালায় দু'টো ছোট কুটুরী আর একটা বারান্দা৷ এখানে অলকানন্দার পাড় অত্যন্ত

উঁচু। জলের ধারে যাওয়া অসম্ভব। এখান হ'তে মন্দাকিনী ও অলকানন্দার সঙ্গমস্থল অতি সুন্দর দেখতে পাওয়া যায়। এখানে একটা ছোট বাজার আছে, কিন্তু তা পাহাড়ের এমন জায়গায় যে, যদি একদিন নদীতে ভাঙন ধরে, ত সব এমন ভেঙে পড়বে যে, আর কাহারও কোন চিহ্নমাত্রও থাকবে না। আমার এ অনুমানটা হাতে হাতেই ফলে গিয়েছে। বদ্রীকাশ্রম হ'তে ফেরার সময় দেখি, সত্যসত্যই এখানকার বাজার নদীগর্ভে নেমে গিয়েছে। শুধু বাজার নয়, বাজার হ'তে দু তিন মাইল বদ্রীনারায়ণের রাস্তা পর্য্যন্ত অদৃশ্য হ'য়েছে। সে কথা ফেরবার সময় ব'লবো। আমরা যে পারে ছিলুম, সঙ্গমস্থল তার অপর পারে। পার হবার জন্য দেবপ্রয়াগের মত এখানেও একটা টানা সাঁকো আছে; সেই সাঁকো পার হ'য়ে সঙ্গমস্থলে আসতে হয়।
দেবপ্রয়াগে একটু সহরের গন্ধ আছে; এখানে তা কিছুই নেই, এমন কি পাণ্ডার গোলযোগ পর্য্যন্তও নেই। গ্রামে তিন চার ঘর গৃহস্থ; দোকানগুলি অতি যৎসামান্য; অনেক কষ্ট করেও একটু চিনি যোগাড় করতে পারলুম না।

স্বামীজির জ্বর ক্রমেই বাড়তে লাগলো। এই দূরদেশে তাঁর সঙ্গেই এসেছি। তাঁকে এ রকম অসুস্থ দেখে মনটা ভারি দমে গেল। তিনি গৃহত্যাগী সন্ন্যাসী ; সব ত্যাগ ক'রেছেন, কিন্তু মায়া ত্যাগ করতে পারেন নি। কম্বল ছাড়া সম্বল নেই, অথচ তার মধ্যে মায়া। ইহা মোহের নামান্তর নয়; ইহা আসক্তিশূণ্য, উদার, সর্ব্বত্র প্রসারিত প্রীতি। কিন্তু তার মাত্রাটা আমারই উপর একটু বেশী হ'য়ে উঠেছে। এ কয়দিন বোধ হয় তিনি তাঁর ধ্যান–ধারণা হ'তে খানিকটে সময় ক'রে নিয়ে, এই জঙ্গলে, পর্ব্বতের মধ্যে আমার যতটুকু সুখ বা আরাম লাভ হ'তে পারে, তারি জন্যে তা নিযুক্ত ক'রেছেন। এদিকে জ্বরে কাঁপছেন, শীতে দাঁতে দাঁতে বেধে যাচ্ছে, অথচ তারই মধ্যে বলা হ'চ্চে ; ''দেখ দেখি দোকানে দুটো চাল পাওয়া যায় কি না ? একটু দুধ যোগাড় ক'রে খাও।'' এই পর্ব্বতের মধ্যে রোগ শয্যাশায়ী সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসীর প্রাণের আগ্রহ দেখে হৃদয় বিগলিত হ'লো এবং বাল্যের পিতামাতার স্নেহ ও আদরের কথা মনে প'ড়লো। সমস্ত দিন স্বামীজির রোগশয্যার পাশে ব'সে থাকলাম। সন্ধ্যার খানিক আগে অস্তগামী সূর্য্যের স্বর্ণময় কিরণে যখন সঙ্গমস্থল, অনুপম শোভা ধারণ ক'রলো, তখন এক একবার ইচ্ছে হ'তে লাগলো যে, ছুটে গিয়ে এই মুক্ত প্রকৃতির সুন্দর শোভার মধ্যে ডুবে গিয়ে এই চিন্তাক্লিষ্ট, বিষণ্ণ মনটাকে খানিক প্রফুল্ল ক'রে নিয়ে আসি। কিন্তু স্বামীজি অত্যন্ত কাতর, তাঁকে ছেড়ে কোথাও যেতে পারলাম না; তবু যে তাঁর সেবা করতে পারলাম, এই একটা আনন্দের কারণ হ'লো। রাত্রি যত শেষ হ'তে লাগলো, রোগও তত বাড়তে লাগলো; ক্রমে আমি উত্থানশক্তি রহিত হ'য়ে প'ড়লাম; সমস্ত পথশ্রমের কষ্ট আমার বলহীন, নির্জ্জীব দেহটা আক্রমণ ক'রলে, হাত পা নাড়বার ক্ষমতা রইল না। শরীরের অবস্থা এ রকম হ'লেও আমার চিন্তাশক্তি তখন বেশ তীব্র ছিল। আমার মনে হ'লো ঊষার আলোকে চরাচর সুরঞ্জিত হবার আগেই হয় তো হিমালয়ের এই নির্জ্জন উপত্যকায় আমার ইহজীবনের ভ্রমণ পর্য্যবসিত হ'চ্চে। সন্ন্যাসী হ'য়ে বেরিয়ে মনে বড় অহঙ্কার হ'য়েছিল যে যখন মায়াজাল ছিন্ন করা এত সহজ, তখন লোকে তা পারে না কেন ? এই ত আমি পেরেছি; কিন্তু মৃত্যু যখন জীবনের পাশে এসে দাঁড়ালো, মৃত্যুর সেই উচ্চ অনাবৃত তটপ্রান্তে দাঁড়িয়ে যখন প্রতিমুহূর্ত্তে সেই বিস্মৃতিপূর্ণ , গভীর অতলে আমার পদস্খলণ হ'বার সম্ভাবনা দেখলাম, তখন সংসারের সমস্ত মায়ামোহ এসে আচ্ছন্ন ক'রলো। মনে হ'লো যাদের ফেলে এসেছি, সন্ন্যাসী ব'লেই যে তাদের ছেড়ে আসতে পেরেছি তা

নয়; তাদের একবার দেখার আশা আছে ব'লেই তাদের ছেড়ে আসতে পেরেছিলাম, বাঁধন ছিঁড়তে পারি নি। যখন এই সকল গভীর চিন্তা আমার মনে উদয় হ'য়েছিল, তখন স্বামীজি তাঁর রোগশয্যা ছেড়ে বহুকষ্টে একবার উঠে আমার ম্লানমুখ ও ক্লান্ত চক্ষুর দিকে অত্যন্ত ব্যাকুল স্নেহপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখ্‌ছিলেন। সন্ন্যাসজীবন আরম্ভ ক'রে, যে সব অনিয়ম ও অত্যাচার ক'রেছি, তাতে ক'রেই আজ এই বন্ধুহীন দেশে পর্ব্বতের মধ্যে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়েছি ব'লে স্বামীজি অত্যন্ত কাতর হ'য়ে পড়লেন। তাঁর কাতরতা দেখে তাঁকে একবার বলতে ইচ্ছা হলো, ''হে বৈরগ্যালম্বী পুরুষপ্রবর, বৃথা তোমার বৈরাগ্য, এখনো তোমার মনে দুঃখ শোক স্থান পায়, এখনও তুমি বন্ধনের দাস।'' কিন্তু তখনই মনে হলো, এ কাতরতা তাঁর নিজের জন্যে নয়, পরের; তাঁর এ অশ্রু – নিজের দুঃখে নয়, পরের কষ্টে। পৃথিবীর সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ত্যাগ ক'রেও যিনি সকলের প্রতি স্নেহপরায়ণ, তাঁরই যথার্থ বৈরাগ্য, নতুবা জন–মানবের সাড়া–শব্দশূণ্য জঙ্গলে বসে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে অলীক বলে নাসাগ্রে দৃষ্টিবদ্ধ করে কাল কাটানতে বিশেষ কিছু যে মহত্ত্ব আছে, তাহা আমার বোধ হয় না। বৈদান্তিক ভায়ার অবস্থা দেখে আমার একটু হাসি পেল। তিনি কম্বল মুড়ি দিয়ে কাত হয়ে ঘরের এক কোণে পড়েছিলেন এবং এক একবার উদাস দৃষ্টিতে আমার মুখপানে মিটমিট করে চাচ্ছিলেন। সেই দীপালোকে তার বিষণ্ন মুখের দিকে চেয়ে কিছুতেই মনে হয় না যে, সেই বৈদান্তিকের আমাদের এই বিপদকালে তাঁর Theory-র উপর নির্ভর করে নিশ্চিন্ত আছেন।

১৮ ই মে, সোমবার। – রাত্রি প্রভাত হলো। সকালের আলো ও বাতাসে আমার শরীর অনেকটা ভাল হতে লাগলো; পীড়ার বেগও অনেকটা কমে এল। স্বামীজির অবস্থাও অনেকটা ভাল। দুই প্রহরের সময় স্বামীজি আমাকে একটু জল খেতে দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় স্বামীজির একটু–আধটু তন্ত্রমন্ত্র ছিল; তাঁর মত লোকের ও সবের কি আবশ্যক, তা আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে ঠিক করে উঠতে পারতাম না। কিন্তু আজ দেখলাম তাঁর তন্ত্রমন্ত্রের মধ্যেও খানিকটে সত্য আছে। তিনি তাঁর কমণ্ডুল থেকে খানিক জল নিয়ে তার দিকে একদৃষ্টিতে একমনে চেয়ে থাকলেন, তারপর সেই জলের মধ্যে জোরে একটা ফুঁ দিয়ে আমাকে খেতে দিলেন। আমাদের দেশে শুনেছি সেকালে জলপড়া খেয়ে লোকের ব্যারাম সারতো; মধ্যে ইয়ংবেঙ্গলদের আমলে কিছুদিন সারতো না, এখন সেই জলপড়া বিলাত হতে মেসমেরিজম্‌ নাম নিয়ে এদেশে এসেছে; এখন আবার তাতে অসুখ সারছে। প্রাচীন যোগতত্ত্বের জায়গায় পাশ্চাত্য সাইকিক ফোর্স বাসা বেঁধে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অতীত ও ভবিষ্যতের খবর দিচ্ছে। শুনেছি, এ সকল থিওসফির কথা; এ সব তত্ত্ব জানিও নে, বুঝিও নে। তবে এইটুকু দেখলাম যে, স্বামীজির জল খেয়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই আমার শরীর বিশেষ সুস্থ বোধ হলো। অসুখ একটু নরম পড়তেই আমার ভয়ানক ক্ষিদে পেল। সে রকম ক্ষিদে বোধ হয়, আমার জীবনে আর কখনও পায় নি। একটা অসুখ কতকটা সেরেছে বটে, কিন্তু জ্বর তখনও পূর্ণ মাত্রায়। ক্ষিদের জ্বালায় ছটফট করলেও সে অবস্থায় কিছু খাওয়া উচিত নয়; কিন্তু আমি আর থাকতে পারলাম না। সঙ্গে একজন লোক ছিল, সেই রান্নার যোগাড় করে দিলে। তার কৃপায় ডাল–রুটি খাওয়া হলো। সে ডাল–রুটির যে কি চেহারা। তা যদি আমাদের ডাক্তার মহাশয়েরা দেখতেন – বিশেষ, আমার একটি অতি–সতর্ক, বয়ঃকনিষ্ঠ কিন্তু জ্ঞানবৃদ্ধ ডাক্তার বন্ধু আছেন – আমার এইরূপ পথ্য তাঁর চোখে পড়লে তিনি নিঃসন্দেহে আমার মৃত্যু নিশ্চয় বলে ঠিক করতেন। স্বামীজিও আমার পথ্যের পোষকতা করেন নি; কিন্তু আহারের পর আমি অনেকটা বল

পেলাম, জ্বরটা তখনও অনেক প্রবল। স্বামীজি বললেন, রাত্রে ঘুমালেই জ্বরটা ছেড়ে যাবে।

আজ বৈকালে বেড়াবার লোভ সংবরণ করা আমার পক্ষে একেবারে দুঃসাধ্য হয়ে উঠলো। সঙ্গমস্থলের কাছে গিয়ে সেখানকার শোভা দেখবার জন্য মনে অত্যন্ত আগ্রহ হতে লাগলো। কিন্তু এই অসুখের উপর ঘুরে বেড়ানতে স্বামীজি যদি অসন্তুষ্ট হন, এই ভয়ে অনেকক্ষণ চুপ করে থাকলাম; পরে যেই দেখলাম, স্বামীজি ধর্ম্মশালার ঘরে ঈষৎ তন্দ্রাভিভূত হয়েছেন, অমনি আমি বেরিয়ে পড়লাম। বাজারের ভিতর দিয়ে টানা সাঁকো পার হয়ে ঘুরতে ঘুরতে সঙ্গমস্থলের কাছে গিয়ে হাজির হওয়া গেল। এইটুকু পথশ্রমেই শরীর বড় কাতর ও অবসন্ন হয়ে পড়লো। জলের ধারে বসে আমি প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখতে লাগলাম। চারিদিকে সরল সমুন্নত পর্বত; সম্মুখে অলকানন্দা ও মন্দাকিনীর খরপ্রবাহ পরস্পরে মিশে গিয়েছে; সূর্য্যকিরণোদ্ভাসিত পর্বতের কনক কিরীট নদীজলে প্রতিফলিত হচ্ছে; রক্তরঞ্জিত মেঘের ছায়া ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে। জলের ধারে কত রকমের সুন্দর পাথর পড়ে আছে, বলে শেষ করা যায় না। আমি বসে বসে সেই উপলখণ্ড সংগ্রহ করতে লাগলাম। দেবপ্রয়াগে কতকগুলি সুন্দর পাথরের নুড়ি সঞ্চয় করেছিলাম, কিন্তু স্বামীজি তা ফেলে দিয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে, যদি ভাল পাথর দেখলেই কুড়িয়ে নিয়ে যেতে হয়, তা হলে আমাদের সঙ্গে দশ বিশটে হাতী আনা উচিত ছিল। দেবপ্রয়াগে সেগুলি ফেলে দিয়েছিলাম, কিন্তু এখানকারগুলি সব ফেলতে পারলাম না; এমন সুন্দর পাথর কি ফেলা যায় ? কেমন উজ্জ্বল, মসৃণ, বহুবিধ বর্ণ এবং আকারবিশিষ্ট। কোনটা ঘোর লাল, কোনটা দুগ্ধফেনবৎ শ্বেত, কয়েকটা গাঢ় কৃষ্ণবৎ – আবলুস কাঠে মত, কতকগুলি নয়নস্নিগ্ধকর হরিৎ, দু পাঁচটার বা কমলালেবুর রং। কতকগুলির একদিক একরকম বর্ণ, অন্যদিকে অন্য রকম; উভয়বর্ণ পরস্পরের মধ্যে মিশে গিয়েছে, অথচ সেই মিশ্রণের মধ্যে এমন একটা সুন্দর রেখা আছে, যা চিত্রকরের তুলিতে কিছুতেই অঙ্কিত হ'তে পারে না, অথচ তা কতই স্বাভাবিক দেখাচ্ছে; যেন তার মধ্যে কিছুমাত্র অসাধারণত্ব নেই। আবার সেই সমস্ত প্রস্তরখণ্ড যে কত আকারের সংখ্যা করা যায় না। গোল, চেপ্টা, ত্রিকোণ, চতুষ্কোণ; আকার যত রকমের হ'তে পারে, বোধ হয় তার সকল রকমেরই আছে। এই সকল প্রস্তরখণ্ড নদীর ধারে প্রচুর পরিমাণে বিক্ষিপ্ত। বোধ হ'তে লাগলো এ সব যেন সুরনদী মন্দাকিনীর সৈকতে প্রস্ফুটিত প্রবাহ– পুষ্প। আমি এক–একবার কতকগুলি সুন্দর নুড়ি কুড়িয়ে নিয়ে খানিকটা উপরে পাথরের উপর বসি; বসে থেকে তার মধ্যে থেকে সব ভাল দু'তিনটে বেছে রেখে বাকিগুলো সব জলে ছুড়ে ফেলে দিই; আবার কতকগুলি নিয়ে আসি, এবং তা থেকে দু একটি বেছে নিই। এই রকম করতে করতে ক্রমে সন্ধ্যা হয়ে এলো, অথচ আমার খেয়াল নেই। হঠাৎ উপর হ'তে স্বামীজির কণ্ঠস্বর শুনে আমার চৈতন্য হ'লো। চেয়ে দেখি, তিনি উপরের পাহাড় বেয়ে যেটুকু নীচে নামা যায় ততটুকু এসে একখানা পাথরের উপর ব'সে আমায় ডাকচেন। আমি তাড়াতাড়ি উঠে রাস্তা ঘুরে, ধর্ম্মশালায় যেতে বেশ অন্ধকার হ'য়ে এলো। স্বামীজি ততক্ষণ বাসায় পৌঁছেছিলেন।

আমি বাসায় প্রবেশ করবামাত্র তিনি আমার উপর স্নেহপূর্ণ তিরস্কার বর্ষণ করতে লাগলেন; তার মর্ম্ম এই যে, যদি আমি পথে–ঘাটে যেখানে সেখানে এ রকম নিবিষ্টচিত্ত হ'য়ে ব'সে থাকি ত, আমাকে বাঘে ভাল্লুকে ফলাহার করতে পারে, কিংবা আমি

পাথরচাপা পড়েও মরতে পারি। বিশেষতঃ আজ আমার রুগ্নদেহে এতটা ওঠা–নামা করা ভাল হয়নি। বৈদান্তিক আমায় বাসায় না দেখে, এখানে এসে প্রায় একঘণ্টা ধ'রে ঐ পাথরের উপর ব'সে আমার ছেলেখেলা দেখছিলেন। অচ্যুত বাবাজী আমাকে ডাকতে চাচ্ছিলেন, কিন্তু স্বামীজি ডাকতে দেন নি। আমার রকম দেখে তাঁর মনে অন্য এক প্রকার ভাবের উদয় হ'য়েছিল; তাই ভাবে গদগদ হ'য়ে বলেছিলেন, ''প্রকৃতি মায়ের কোলে এমনি ক'রে সকলেই বালক হ'য়ে যায়।'' রাত্রিটা আমার এক রকমে কাটিয়ে দিলুম; কিন্তু সঙ্গের লোকটার বড় জ্বর এলো।

১৯ এ মে, মঙ্গলবার। – আমাদের শরীর যদিও অনেকটা দুর্ব্বল ছিল, তবুও আজই এখান হ'তে রওনা হ'ব, এ রকম সঙ্কল্প করেছিলাম; কিন্তু সঙ্গের লোকটার জ্বর হওয়ায় আজও এখানে থাকতে হ'লো। আরো মনে করা গেল, আজকের দিনটা বিশ্রাম ক'রে শরীর আর একটু সুস্থ ক'রেই নেওয়া যাক। বৈদান্তিকের আর এক দণ্ড এখানে থাকতে ইচ্ছে নেই, তিনি বেরিয়ে পড়লেই বাঁচেন। কিন্তু কি বোলে আমাদের ফেলে যান ? কাজেই তাঁকেও চক্ষুলজ্জায় থাক্‌তে হ'লো।

এখান হ'তে দু'টো রাস্তা বের হয়েছে। যে টানা সাঁকো পার হ'য়ে আমি সঙ্গমস্থলে গিয়েছিলাম, সেই সঙ্গমস্থলের উপর দিয়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারনাথ যাওয়া যায়। আর একটা রাস্তা – আমরা যে পারে আছি – সেই পার দিয়ে বরাবর অলকানন্দার ধারে ধারে বদ্রীকাশ্রম পর্য্যন্ত গিয়েছে। অনেকেই এখান হ'তে অপর পারের পথ ধ'রে, প্রথমে কেদারনাথ দর্শন ক'রে, পরে ঐ দিক দিয়েই যে রাস্তা আছে, সেই রাস্তায় এসে খানিক উপর দিয়ে বদ্রীকাশ্রমে যে রাস্তা গিয়েছে, সেই রাস্তায় উপস্থিত হন। আমরা প্রথমেই বদ্রীকাশ্রম যাব, এই রকম স্থির ছিল।

পূর্ব্বেই বলেছি আমরা যে পারে আছি, এই পার দিয়েই – অলকানন্দার ধারে ধারে বদ্রীকাশ্রমের রাস্তা; কিন্তু রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পিপল চটি পর্য্যন্ত রাস্তাটা বড়ই ভয়ানক এবং দুর্গম। এখান হ'তে পাহাড় একেবারে সোজা, তার গায়ে একটা সঙ্কীর্ণ দুর্গম পথ। পাহাড়ের অংশে রাস্তা, সে অংশটা মধ্যে ভেঙে পড়ে, সুতরাং খানিকটে ঘুরে আবার একটা রাস্তা পড়ে। একবার একদিন এই রাস্তায় কতকগুলি যাত্রী যাচ্ছিলো, মাথার উপর পাহাড়ের ধস নামে, তারপর একটি যাত্রীরও চিহ্নমাত্র দেখতে পাওয়া যায় নি। এই ঘটনার পর গবর্ণমেণ্ট টানা সাঁকোর ওপার দিয়ে পিপলচটী পর্য্যন্ত একটা রাস্তা তৈয়ারী ক'রে দিয়েছেন। আবার পিপলচটীতে একটা টানা সাঁকো তৈয়ারি ক'রে ঐ রাস্তাটাকে এ–পারের রাস্তার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছেন।

রুদ্রপ্রয়াগ থেকে পিপলচটি পনর মাইল। ও–পারের নতুন রাস্তা ভাল বটে, কিন্তু এই পনর মাইলের মধ্যে কোন চটি নেই; এক টানেই এই পনর মাইল; কিন্তু রাস্তা চলা কষ্টকর ব'লে, সকলেই এ–পারের সঙ্কীর্ণ পথে চলে; কারণ, এখান হ'তে সাত মাইল তফাতে শিবানন্দী চটি। সরকারী লোকজন দু'পথেই চলে।

এক জায়গায় আজ তিন দিন বসে থেকে মনটা বড় ভাল নেই। বিকেল স্বামীজি বললেন, এখন হ'তে রাস্তা ক্রমেই খারাপ হবে, শুধু পায়ে তার উপর দিয়ে চলতে গেলে পা দু'খানাকে কিছুতেই আস্ত রাখা যাবে না; বিশেষতঃ এই দুর্গম রাস্তার মধ্যে এক

জায়গায় যদি পা যখম হ'য়ে পড়ে ত চক্ষুস্থির। সুতরাং এখান হ'তে এক এক জোড়া পাহাড়ী জুতা কিনে নেওয়া যাক। আমিই বাজারে জুতা কিনতে গেলাম। দেখি, জুতার দোকান নেই, একজন মুচি একটা জায়গায় ব'সে জুতা মেরামত করছে, আর তার পাশে দেবকন্যার মত সুন্দরী একটি মেয়ে ব'সে জুতা মেরামত করছে, এমন সুন্দর চেহারা সর্বদা আমাদের নজরে পড়ে না। তার যেমন রং, তেমনি সর্ব্বাঙ্গপূর্ণ সৌষ্ঠব। মেয়েটির বয়স পনর ষোল বছর, সতেজ উন্নত দেহ তার উপর যৌবনের লাবণ্য । সেই জায়গাটা যেন আলো করে ব'সে আছে। আমি বিহ্বলনেত্রে তার দিকে চেয়ে রইলাম। এ রকম জায়গায় আমি এমন সুন্দরীকে দেখবার প্রত্যাশা করি নি ব'লেই বোধ করি , আমার এত বিস্ময়। তারপর যখন শুনলাম সে মুচির কন্যা, তখন আর আমার বিস্ময়ের সীমা রইল না। আমি ভাবলাম, মুচির মেয়ে যেখানে এমন, ভদ্রলোকের মেয়েরা সেখানে না জানি কত সুন্দরী।

যা হোক, এই মুচিকে জুতার কথা জিজ্ঞাসা করায় সে বল'লে জুতা তৈয়ারী নেই, তবে আমি যদি খানিক অপেক্ষা করি ত সে জুতা তৈয়ারী ক'রে দিতে পারে। খানিক ব'সে থাকলে তিন চার জোড়া জুতা তৈয়ারি হবে, শুনে আমি অবাক। একটা দোকানে ব'সে তার কাণ্ডকারখানা দেখতে লাগলাম। সে আর তার মেয়েতে জুতা ক'রতে লাগলো – সেই সুন্দরীর ফুলের মত সুন্দর সুকোমল হাতে কঠিন চামড়া নড়াচাড়া বড়ই অমানান দেখাচ্ছিল।

শীঘ্রই জুতা তৈয়ারি হ'য়ে গেল – জুতা ত ভারি, পায়ের এপাশ ওপাশ দিয়ে বাঁধ্‌বার জন্য গোটাকত চামড়ার ফিতে। জুতা তৈয়ারি হোলো, মেয়েটি তা হাতে করে আমার আগে আগে ধর্ম্মশালা পর্য্যন্ত পয়সা নিতে এলো; মনে হলো, যেন কোন বনদেবী ছল ক'রে এই নির্জন পার্ব্বত্য প্রদেশে আমার পথপ্রদর্শিকা হ'লেন।

আজ রাত্রিতে সঙ্গের লোকটার অবস্থা অনেক ভালো। প্রত্যূষে রুদ্রপ্রয়াগ ত্যাগ ক'রবো – এই রকম স্থির করা গেল।

কর্ণপ্রয়াগ – পথে

২০–এ মে, বুধবার। – আজ খুব সকালে রুদ্রপ্রয়াগ ছেড়ে ধীরে ধীরে অগ্রসর হ'তে লাগলাম। আমরা যে কয়জন একসঙ্গে যাচ্ছি, এক বৈদান্তিক বাদে আর সকলেরই শরীর অসুস্থ; স্বামীজি ও ভৃত্যটি অত্যন্ত কাতর; আমার শরীরও বড় ভাল ছিল না; কিন্তু সে সব ভাব গোপন ক'রে বিশেষ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে চ'লতে লাগলাম। আমার একটা অভ্যাস আছে, কোন স্থানে যেতে হ'লে গন্তব্য জায়গায় পূর্বে আমি কিছুতেই পথের মধ্যে বিশ্রাম করি নে। একবার বিশ্রাম ক'রতে ব'সলে আমি বড় অবসন্ন হ'য়ে পড়ি, আর পথচলা হয় না; এই জন্যে আমি সর্ব্বদাই সঙ্গীদের আগে আগে চ'লতাম। কখন কখন আমার সঙ্গীগণ আমার অনেক পিছনে প'ড়ে থাকতেন। আজ শরীর খুব দুর্ব্বল থাকলেও সকলের আগে আগে হেঁটে বেলা আটটার সময় সাত মাইল দূরে শিবানন্দী চটিতে পৌঁছলাম। আজ পথ চ'লে এত সকালে এখানে এসে আজ সমস্ত দিন এখানে অপেক্ষা করার কিছুমাত্র ইচ্ছে ছিল না, কিন্তু আট মাইলের মধ্যে আর কোন চটী নেই, আর এই পার্ব্বত্য–পথ ভেঙ্গে সাত মাইল আসতেও পরিশ্রম কিছু কম হয় নি; হয় ত তাঁদের

আরো দু–তিন ঘণ্টা দেরী হ'বে মনে ক'রে শিবানন্দী চটীতেই আশ্রয় নিলাম। বেলা বেশী হয় নি; কিন্তু রোদের তেজ খুব প্রখর। পর্ব্বতের ধূসর দেহ উদ্ভাসিত ক'রে সূর্য্যদেব পূর্ব্ব গগনের অনেক ঊর্দ্ধে উঠেছেন এবং তাঁর উজ্জ্বল প্রভায় সমুচ্চ বৃক্ষরাজি হ'তে পথপ্রান্তস্থ নিতান্ত ক্ষুদ্র গুল্ম পর্য্যন্ত যেন খুব একটা সজীবতা অনুভব ক'রছে।

আমি পথের মধ্যে একটা গাছের ছায়ায় বসে চারিদিকে চেয়ে দেখতে লাগলাম। আমি যেন এ রাজ্যে একটিমাত্র প্রাণী, আর কোথাও জীবজন্তুর সম্পর্ক নেই; যেন এই নির্জ্জন প্রদেশে দিনের পর দিনগুলি অলসভাবে নিতান্ত বৈচিত্র্যহীন অবস্থায় কেটে যাচ্ছে। এখানে এসে মনে হয় এ জায়গাগুলি পৃথিবীর নিতান্তই বীজন নেপথ্য ; মনুষ্যজীবনের অতৃপ্ত আকাঙ্খা , বিপুল চেষ্টার সঙ্গে এদের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। ব্যর্থ–মনোরথ হ'য়ে কেউ যে এখানকার পথিপ্রান্তে আপনার অবসন্ন জীবনের শেষসীমায় পৌঁছিয়েছে, কি প্রবলবিক্রমে এই দুর্ভেদ্য শিলাতলে আপনার গৌরবপতাকা প্রোথিত করেছে, এখানে ব'সে তা কিছুতেই বিশ্বাস করা যায় না। তবু শিবানন্দী চটীতে মানুষের ক্ষুদ্র হস্তের অনেক কাজ এখনও দৃষ্টিগোচর হয়; আর এই জন্যেই বোধ হয় সকল চটী অপেক্ষা শিবানন্দী চটী বেশী মনোরম বোধ হয়েছিল।

যে সময়ে প্রাতঃস্মরণীয়া রাণী অহল্যাবাঈ হরিদ্বার হ'তে বদ্রীকাশ্রমের এই রাস্তা অনেক অর্থব্যয়ে তৈয়ারি ক'রে দেন, সেই সময় তিনি এই স্থানের প্রাকৃতিক দৃশ্যে মোহিত হয়ে এখানে এক শিব প্রতিষ্ঠা করেন এবং অনেকগুলি কোঠাঘর প্রস্তুত ক'রে এই দুর্গম স্থানটিকে পথশ্রান্ত পথিকের যথেষ্ট বাসোপযোগী ক'রে দেন। সেই হ'তে এখানকার নাম শিবানন্দী হ'য়েছে। এখনো অসংখ্য ধর্ম্মপিপাসু যাত্রী এই পথে যেতে যেতে রাণী অহল্যাবাঈয়ের পবিত্র নামে জয়ধ্বনি করে, তাঁর আত্মার মঙ্গলোদ্দেশে আশীর্ব্বাদ করে। তিনি কতদিন স্বর্গে চ'লে গিয়েছেন; এমন দিন নেই যেদিন এখানে তাঁর নাম ভক্তিভরে উচ্চারিত না হয়।

সে অনেককালের কথা – যখন শিবানন্দী চটী প্রতিষ্ঠিত হ'য়েছিল। জনশূণ্য পর্ব্বতের একটি জনশূণ্য সঙ্কীর্ণ উপত্যকায় একটি পবিত্র তুষার–ধবল দেবমন্দির, আর আশে–পাশে ভক্ত যাত্রীদের জন্যে ক্ষুদ্রক্ষুদ্র বিশ্রামকক্ষ। কত দীর্ঘকাল ধ'রে কত পর্য্যটক এই পান্থনিবাসে তাঁহাদের পথশ্রম অপনীত ক'রেছে; তাঁদের সুখ–দঃখময় , সন্দেহ ও ভক্তিমিশ্রিত ক্ষুদ্র জীবনের অতীত কাহিনী এই সমস্ত অট্টালিকার চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন ক'রে রেখেছে। যে ভক্তি ও বিশ্বাস নিয়ে তারা এই দুর্গম পর্বতের সুদূর তীর্থযাত্রায় অগ্রসর হ'য়েছিল, জানি না, তাতে তাদের মনে কতখানি শান্তি প্রদান করেছিল।

সেই প্রাচীন শিবানন্দী চটী এখনও আছে কিন্তু পূর্ব্বের সেই গৌরব এবং শোভা–সমৃদ্ধি আর নেই। অট্টালিকার অনেকগুলিই ভেঙে গিয়েছে; যেগুলি এখনো একটু ভাল আছে, তাও বাসোপযোগী নয়; তবে নিরুপায় যাত্রীর দল কোন রকমে এখানে এক রাত্রি দুই রাত্রি বাস করে, এবং রান্নাবান্না ক'রে কিন্তু চটী ত্যাগ করবার সময় আর তা পরিষ্কার ক'রে যাওয়া দরকার মনে করে না। এইজন্যে সঙ্কীর্ণ ঘরগুলি ক্রমেই বেশী অপরিষ্কার হ'চ্ছে। এই অপরিষ্কার ঘরে আর একদল যাত্রীর খাওয়ার আয়োজন করতে গেলে, তারা যে কতখানি বিরক্ত বোধ করে, তা বলাই বাহুল্য; তারাও উপায়ন্তর না দেখে একটুখানি

জায়গা পরিষ্কার ক'রে নেয় এবং খাওয়া-দাওয়ার পর তা পরিষ্কার না করেই চ'লে যায়; সুতরাং আবর্জ্জনার পর আবর্জ্জনা স্তুপাকার হ'য়ে উঠে।

শিবানন্দী চটীর সম্মুখে পাথরে বাঁধান বটগাছের তলে বসে এই সকল কথা ভাবছি; পায়ের কাছ দিয়ে অলকানন্দা ললিত-তরল-গতিতে কুলকুল ক'রে ব'য়ে যাচ্ছে এবং নদীজলে উজ্জ্বল সূর্যকিরণ প্রতিফলিত হ'য়ে পাষাণময় উচ্চ উপকূলে মনোরম ক'রে তুলেছে। এমন সময় শিবানন্দীর শিবের পূজারী ঠাকুর আমার কাছে উপস্থিত হ'লেন। শিব এবং পূজারী উভয়ের দুরাবস্থাই সমান। শিবের এখন প্রত্যহ দুই বেলা দূরের কথা, এক বেলা জোটে কিন না সন্দেহ। আমাদের দেশের দুর্গোৎসবের সময় ব্রাহ্মণেরা যদি চণ্ডী পাঠ করতে করতে একেবারে দুই তিন পৃষ্ঠা উল্টাইতে পারেন, তবে এ নির্জ্জন প্রদেশে শিব যে সপ্তাহান্তে পূজা পাবেন, তার আর আশ্চর্য্য কি ? পূজারীর সঙ্গে আলাপ ক'রে জানলাম, এখানে তিনি সপরিবারেই আছেন। অনেকগুলি ছেলে-মেয়ে; সংসার এক রকম অচল, তাই তাঁকে পৌরহিত্য ছাড়াও নানা রকমে অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টা করতে হয়। মন্দিরের কাছে যে অল্প জমি আছে, তাতে মোটেই কিছু জন্মায় না, অন্য যে একটু আধটু জমি আছে, তাতে অল্প কয়েক কাঠা গম হয়। কিন্তু তাতে সংসার চালান দুষ্কর হয়। তাই তিনি অনেকগুলি ব্যবসা অবলম্বন ক'রেছেন। শিবানন্দিতে দোকান খুলেছেন; দূরবর্তী গ্রাম হ'তে গম এনে ময়দা ও আটা প্রস্তুত ক'রে, রুদ্রপ্রয়াগ কি কর্ণপ্রয়াগে বেচে আসেন; তিনি ছাগল পোষেন, তাও বিক্রি করেন, কিন্তু কিছুতেই বেচারীর কুলিয়ে উঠে না। এতগুলি কাজ যার হাতে, তাকে দিয়ে নিত্য নিয়মিত শিবপূজার আশা দুরাশা মাত্র। আমাদের দেশের অনেক ঠাকুরবাড়ীর পূজারি রাঁধুনী বামুন, তারা তাড়াতাড়ি পূজা শেষ ক'রেই রাঁধতে যায়, সুতরাং পূজা করবার সময় পূজার মন্ত্রের কথা তাদের মনে হয়, কি তরকারীর কথা মনে হয়, তা অনুমানসাধ্য। সুতরাং পর্ব্বতবাসী এই দরিদ্র পুরোহিত যদি পূজার্চনায় অবহেলা প্রকাশ করে, ত সে অপরাধ মার্জনীয়।

প্রায় দু'ঘণ্টা পরে সঙ্গীরা এসে জুটলেন। কোন্ ঘরে চাট্টি খাওয়া-দাওয়া করা এবং একটু মাথা রাখ্বার জায়গা হ'তে পারে, তাই অনুসন্ধান করতে লাগলাম। বহু অনুসন্ধানে ঠিক নদীর উপরে একটা দ্বিতল কোঠা আবিষ্কার করা গেল। অন্যান্য ঘরগুলি অপেক্ষা এইটি একটু প্রশস্ত ও পরিষ্কার। আমরা সেখানেই আড্ডা ফেললাম। আজ সকালে সঙ্গী ভৃত্যটিকে বলেছিলাম যে, যদি তার শরীর অসুস্থ বোধ হয় ত আজও আমরা রুদ্রপ্রয়াগে থাকি; কিন্তু সে বোধ হয়, আমাদের অসুবিধা ভেবে নিজের প্রকৃত অবস্থা গোপন ক'রে চলতে চেয়েছিল। এই সাত মাইল রাস্তা এসে সে একেবারে হাঁপিয়ে পড়লো,- না পারে উঠতে না পারে বসতে। রুদ্রপ্রয়াগে অনেক বিলম্ব হয়ে গেল, এখানে ভৃত্যটির এইরকম অবস্থা; এখানেই বা আর কয়দিন বিলম্ব হবে ভেবে বৈদান্তিকভায়া বড়ই বিরক্ত হ'লেন। হায় মায়াবাদী বৈদান্তিক। তোমার এই মায়াবাদ কি স্বার্থপরতার নামান্তর মাত্র। তুমি দুঃখ-দারিদ্র্য পদদলিত করে তীর্থস্থানে যেতে চাও দরিদ্র প্রজার সর্ব্বস্ব লুণ্ঠন করে কাশীতে দেবালয় প্রতিষ্ঠা করতে চাও; ভগবানের অজস্র করুণা ও চিরন্তনের মঙ্গলেচ্ছাকে ত্যাগ করে, বৈরাগ্যের হৃদয়হীনতাকেই সার পদার্থ বলে মনে কর। সকলে তোমার মত হলে পৃথিবী এত দিন শ্মশান হ'তো। অথবা তোমারই বা দোষ কি, আমাদের দেশের অনেক সাধুপুরুষের বৈরাগ্যই তোমার মত। তোমরা পিতা-মাতার গভীর স্নেহ উপেক্ষা কর, পত্নীর ব্যাকুল প্রেম-বন্ধন ছিন্ন কর। সে অতি কঠিন কাজ

সন্দেহ নেই; কিন্তু তোমাদের এই ব্রত সার্থক হ'তো যদি তোমরা তোমাদের এই ক্ষুদ্র প্রেম প্রসারিত করতে পারতে; পিতা-মাতা স্ত্রী পুত্র ছেড়ে যদি পৃথিবীর লোককে আপনার করতে পারতে। কিন্তু তাও পারলে না এবং যা অল্প প্রেম তোমাদের ঐ রুদ্ধ নয়ন আলো করেছিল, তা চিরদিনের জন্যে নিবিয়ে ফেললে। – আমার মনের কথা মনেই রাখলাম; বৈদান্তিককে বলা আর আবশ্যক বোধ করলাম না; শুধু বললাম, বদ্রীনারায়ণ যাওয়া হ'ক, আর না হ'ক এই রোগীর পাশে অনাহারে মরি, তাতেও আপত্তি নেই, কিন্তু এ রকম হৃদয়হীনতা দেখিয়ে চলে যেতে পারবো না। স্বামীজিও অবশ্যই আমার মতে মত দিলেন।

বৈদান্তিক ভায়া অবশেষে বিরক্ত হয়ে আমাদের ছেড়ে যাবার উদ্যোগ করলেন। আমি তাঁকে পথ-খরচের জন্য চার পাঁচ টাকা দিতে চাইলাম কিন্তু তিনি নিলেন না। আমি তাঁকে অনেক বুঝালাম, – বললাম এ ভয়ানক পথে বিনা সম্বলে চল্‌তে নেই, চারিদিকে দুর্ভিক্ষ। এদিকে আসতে সকলেই প্রায় সঙ্গে কিছু অর্থ নিয়ে আসে। যারা বিনা সম্বলে আসে তারা হরিদ্বারে হৃষিকেশে বসে থাকে। কোন ধনী শ্রেষ্ঠী বদ্রীনারায়ণ দর্শন করতে এলে তিনি এইরকম সম্বলহীন একশ দুইশ – এমন কি, তিনশ পর্যন্ত সাধুকে নিজব্যয়ে নারায়ণ দর্শন করান। প্রতি বৎসরই পশ্চিম দেশ হতে পনের জন শ্রেষ্ঠী এই রকম তীর্থযাত্রা করেন।

বৈদান্তিক আমাদের উপর বিরক্ত হয়ে চলে গেলেন। যাবার সময় সঙ্গে নিলেন একটা কল্‌কে, কিন্তু শুধু কল্‌কে ত আর কারো কাজে লাগে না; লজ্জায় আমাকেও সে কথা বলতে পারছিলেন না, কিন্তু আমি তাঁর বিপদ বুঝে একটা দোকান থেকে এক সের মাখা তামাক কিনে দিলাম। যাওয়া সময় বোধ হয় আমাদের ছেড়ে যাচ্ছেন বলে তাঁর একটু লজ্জা হয়েছিল; তাই বেশী কিছু বলতে পারলেন না। লোকটা নিতান্ত যখন চলে যাচ্ছে, আমার তার প্রতি একটু মায়া হলো – এতদিন একসঙ্গে থাকা গিয়েছিল। – আমি তাহার হাত ধরে বললাম, ''কত সময় কত অন্যায় কথা বলেছি; আমার জন্য কত কষ্ট সহ্য করেছেন, সে জন্য কিছু মনে করবেন না। আবার কতকালে দেখা হবে কি না, কে জানে ?'' তিনি চলে যাওয়াতে আমার বড়ই কষ্ট হতে লাগলো, কয়দিন একসঙ্গে দু'জনে বেশ ছিলাম। পথশ্রমের পর অনেকে হাত-পা ছড়িয়ে নিদ্রা দিয়ে সুখ ও আরাম পান, কিন্তু আমি এই বৈদান্তিকের সঙ্গে আজগুবি তর্ক করে পথশ্রম দূর করতাম।

রুদ্রপ্রয়াগ হতে অলকানন্দার অপর পার দিয়ে যে নূতন পথ বের হয়েছে, তা এখানে শেষ হলো। এখানে একটা টানা সাঁকো দিয়ে রাস্তাটাকে এ পারের রাস্তার সঙ্গে যোগ করে দেওয়া হয়েছে।

বৃদ্ধ স্বামীজি খানিক বিশ্রাম করবার আশায় কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়েছিলেন, কিন্তু তাতেও মাছির হাত থেকে পরিত্রাণ নেই। কম্বলের যে একটু আধটু ফাঁক ছিল তারি মধ্য দিয়ে গিয়ে তারা তাঁকে আক্রমণ করতে লাগলো। এই দারুণ পথশ্রমের পর কোথায় একটু আরাম করবো, না মাছির জ্বালায় অস্থির হয়ে পড়লাম। শেষে যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় বেলা তিনটে না বাজতেই পিপলচটী হতে বের হওয়া গেল।

কিছুদূর যেতে না যেতেই, আকাশে অল্প অল্প মেঘ দেখা গেল; আমরা সে দিকে প্রথমে বড় লক্ষ্য করলাম না, কিন্তু মেঘ ক্রমে সমস্ত আকাশ ঢেকে ফেললে; চারিদিকে খুব অন্ধকার হয়ে এলো, এবং একটু পরেই বেশ বাতাস উঠলো। ঝড় জলে রাস্তায় বিপদে পড়া অসম্ভব নয় ভেবে, স্বামীজি নিকটস্থ একটা গহ্বরে আশ্রয় নিতে বললেন, কিন্তু বৈদান্তিক ভায়ার সবই উল্টো। যা কিছু ভাল যুক্তি, তিনি তার মধ্যে নেই। তাঁর পন্থা সকল কাজেই স্বতন্ত্র, এমন কি বিপদের সময়েও । তিনি বললেন, যখন বাতাস উঠেছে, তখন মেঘ এখনই উড়ে যাবে। এমন সামান্য সামান্য কারণে পথ চলা বন্ধ করা কোন কাজের কথা নয়।
কাজেই আমরা অগ্রসর হলাম। রাস্তায় জনমানবের সাড়া-শব্দ নেই। আকাশের অবস্থা ক্রমেই খারাপ হতে লাগলো; কিন্তু নিকটে আমরা যে পাহাড়ে উপর দিয়ে যাচ্ছি, তার গাছগুলি ছোট ছোট, কোন দিকে একটাও বড় গাছ নজরে পড়ে না।

ক্রমেই বাতাস বেশী হতে লাগলো, শেষে রীতিমত ঝড় আরম্ভ হলো। প্রতি মুহূর্তেই মনে হতে লাগলো, পর্বতশৃঙ্গ বুঝি মাথার উপর ভেঙে পড়ে। আকাশ অন্ধকার, আর শন্ শন্ শাব্দ; আমরা চারিটি প্রাণী সেই প্রলয় কাণ্ডের ভিতর দিয়ে চলছি, পদস্খলন হয়ে নীচে পড়বার সম্ভাবনা অত্যন্ত বেশী। খানিক পরেই অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে লাগলো, আমরাও প্রাণের দায়ে যতদূর সাধ্য দ্রুতপদে আশ্রয়ের সন্ধানে চলতে লাগলাম। কিন্তু পাঁচ মিনিটের মধ্যে বৃষ্টি বন্ধ হয়ে মুষলধারে শিলাপাত আরম্ভ হলো; তখন আমরা হতাশ হয়ে পড়লাম। এই পার্বত্য দেশে যে রকম বড় বড় শিলাবর্ষণ হয় , আমাদের সমতল প্রদেশের লোকেদের তা বুঝিয়ে উঠা যাবে না। এক একটা শিলা এক একটা বেলের মত; সুতরাং তা মাথায় পড়া দূরের কথা , শরীরে পড়লে শরীরের কি রকম দুর্দশা হতে পারে তা কল্পনায় উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করা কঠিন নয়। আমরা উপায়ন্তর না দেখে তাড়াতাড়ি পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়ে আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিলাম, কিন্তু তাতে মাথা বাঁচান কঠিন দেখে কম্বলখানায় কয়েক ভাঁজ দিয়ে মাথা ও মুখ ঢেকে রাখলাম। গায়ের উপর দুই একটা শিল পড়তে লাগলো, এবং তাতে আমাদের অত্যন্ত ব্যতিব্যস্ত করে তুলল; কিন্তু উপায়ন্তর নেই, তবু আমাদের পরম সৌভাগ্য যে, মাথাটা কোন রকমে রক্ষা হলো; কিন্তু বোধ হতে লাগলো, শীতে বুঝি বুকের রক্ত জমে যায়।

শিলাবৃষ্টি ছেড়ে গেলে আমরা আবার উঠলাম। দেখতে দেখতে আকাশ বেশ পরিষ্কার হয়ে গেল, এমন কি, শেষে রোদও উঠলো। সেই সন্ধ্যাতপনের কনককিরণসিক্ত পার্বত্য প্রকৃতি এক আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করেছিল। ছোট ছোট গাছগুলি হতে টোপে টোপে বৃষ্টি পড়ছে; পাহাড়ের গা বেয়ে নানা জায়গা হতে নালা বের হয়ে হু হু শব্দে নীচের দিকে যাচ্ছে; আর আকাশ পরিষ্কার দেখে পাখীর দল আনন্দে কলরব করছে এবং ভিজে পাখা ঝেড়ে ফেলছে; – এ দৃশ্য অতি সুন্দর। কিন্তু কম্বল সর্বাঙ্গে জড়িয়ে এক গা বেদনা নিয়ে পথ চলতে চলতে আমরা এই পাহাড়ী প্রদেশের একটা বৈচিত্র্য বেশ লক্ষ্য করেছি। কোথাও কিছু নেই; দেখতে দেখতে আকাশ মেঘে ঢেকে গেল, চারিদিক অন্ধকার করে তুমুল ঝড়বৃষ্টি আরম্ভ হলো; তারপরেই দশ মিনিটের মধ্যেই সব পরিষ্কার। এই বৃষ্টি, এই রোদ। আমাদের দেশের প্রকৃতিতে এমনতর চাঞ্চল্য প্রায়ই দেখা যায় না।

পিপলচটী হতে কর্ণপ্রয়াগ পর্য্যন্ত রাস্তা সবে তিন মাইল মাত্র কিন্তু এই তিন মাইল আসতেই একেবারে আমাদের প্রাণান্ত পরিচ্ছেদ! একে ঝড়বৃষ্টি, শিলাপাত, তার উপর রাস্তা আগাগোড়া চড়াই; সে চড়াইও এক এক জায়গায় ঠিক সোজা। একে ত সহজ অবস্থাতেই তা বেয়ে উপরে উঠা কঠিন, তার পর বৃষ্টি হয়ে পাথর ভিজে গিয়েছে; বেলা প্রায় তিনটের সময় পিপলচটী হতে বের হয়ে এই তিন মাইল পথ অতিক্রম করে শীতে কাঁপতে কাঁপতে যখন কর্ণপ্রয়াগে উপস্থিত হলাম, তখন বোধ হয় বেলা ছয়টা। একটা মাটির কোঠার দ্বিতলে বাসা নেওয়া গেল।

কর্ণপ্রয়াগ

২২–এ মে শুক্রবার। – কোন দুই নদীর সঙ্গম না হলে প্রয়াগ হয় না। কর্ণপ্রয়াগে দুই নদীর সঙ্গম হয়েছে; একটি অলকানন্দা , অপরটি কর্ণগঙ্গা। কর্ণগঙ্গাকে ঠিক নদী বলা যায় না, এ একটি বড় রকমের বেগবতী ঝর্ণা মাত্র। এখানে নদীর মত স্রোত বয়ে জল আসে না। নদীর পরিসর দেড়শ' হাত, কি কিছু বেশী হবে; কিন্তু তার নীচে বড় বড় জলধারা। পাহাড়ে খুব বৃষ্টি হলে হু হু শব্দে জল নেমে সমস্ত ডুবে যায়। এই নদীর নাম কর্ণগঙ্গা কেন হ'লো, তার একটা সন্তোষজনক কৈফিয়ৎ এখানকার পাণ্ডাদের মুখে শুনতে পাওয়া যায়। মহাবীর কর্ণ এখানে কিছুকাল তপস্যা করেন। মধ্যে একদিন তার অবগাহনেচ্ছা অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠে, এবং কিরূপে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হয়, সেই চিন্তাতেই তিনি কিছু ব্যস্ত হয়ে পড়েন; কিন্তু তপোবলে তিনি দেবতাদের এত বাধ্য করে রেখেছিলেন যে, প্রয়াগে স্নান করবার জন্যে তাঁকে আর কোথাও যেতে হলো না। পতিতপাবনী গঙ্গা সেখানেই এসে অলকানন্দার সঙ্গে মিশলেন। কর্ণের ক্ষুদ্র কুটীরদ্বারে প্রয়াগ হলো; কর্ণজী সেই সঙ্গমস্থলে স্নান করে দেহ শীতল ও পবিত্র করলেন। সেই থেকে এই নদীর নাম কর্ণগঙ্গা হয়েছে। পর্বতবাসী সরলচেতা বিশ্বস্তহৃদয় বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ যখন এই পুরাণ–কাহিনী গভীর বিশ্বাসের সঙ্গে আমার কাছে বিবৃত করলেন, তখন এমন একটা ভক্তি ও নির্ভরের ভাবে তার উদার মুখমণ্ডল উজ্জ্বল হয়ে উঠলো যে তা দেখে আমার মনেও খুব আনন্দ হলো। শেষে গল্পের উপসংহারকালে যখন বললে, '' বাবুজি এইসা কাম ভগবান ভকত কি ওয়াস্তে হর ওয়াক্ত করতে হেঁ'' – এবং সঙ্গে সঙ্গে দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করলে, তখন বোধ হলো, ব্রাহ্মণ একালের অভক্তি ও বিশ্বাসহীনতা মনে করেই খানিকটে হতাশ হয়ে পড়েছে। বাস্তবিকই '' এইসা কাম ভগবান্ ভকতাকা ওয়াস্তে হর ওয়াক্ত করতে হেঁ'' – এটা তাঁর প্রাণের কথা; যুক্তি–তর্কের জঞ্জাল হতে অনেক দূরে থেকে, এই রকম একটা কথার উপর নির্ভর করে এরা কত শান্তি ও সান্ত্বনা উপভোগ করে। আমাদের সরল বিশ্বাসটুকু অন্তর্হিত হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে আমরা মনের শান্তিটুকুও হারিয়েছি।

আজ কর্ণপ্রয়াগে অবস্থান করা যাবে স্থির করা গেল। বাজারের মধ্যে একটা দোকানঘরের উপরতলায় আমরা বাসা নিলাম। বাজারে দোকান খুব বেশী নয়; তবে মোটামুটি জিনিস এখানে প্রায় সবই পাওয়া যায়, এমন কি একটা দোকানে ছানার মুড়কিও পাওয়া গেল। দোকানগুলি সমস্তই পাহাড়ের গায়ে। আমরা যে দোকানে বাসা নিয়ে কোঠাবাড়ি দেখলাম, বাড়িটি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। আমার প্রথমে মনে হয়েছিল

এ বুঝি কোন ইংরেজের বাসস্থান, কিন্তু পরে জানতে পারলাম এটি ''দাতব্য-চিকিৎসালয় ''। এই দুর্গম পাহাড়ের মধ্যে রোগীর চিকিৎসা ও সেবার জন্য গবর্ণমেণ্ট এই ডাক্তারখানা তৈয়ারী করে দিয়েছেন, এতে যে কত যাত্রীর উপকার হয় তার সংখ্যা নেই। ডাক্তারখানা বারমাসই খোলা থাকে, কিন্তু বছরের সকল সময় এখানে রোগী দেখা যায় না। তীর্থভ্রমণোপলক্ষে এই সময়েই কিছু বেশী রোগীর আমদানী হয়। একবার ডাক্তারখানাটা দেখতে যাব ইচ্ছে করলাম, কিন্তু সকালে আর ঘটে উঠলো না, চাকরটাকে চিকিৎসার জন্যে পাঠিয়ে দিলাম, খানিক পরে সে কয়েকটা কুইনাইনের বড়ি নিয়ে ফিরে এলো।

আমাদের দেশ হতে বদ্রীকাশ্রম যেতে হলে হরিদ্বারের পথে কেউ চলে না। বাঙলা, বিহার, কি উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার লোক এখন অন্য একটা ভাল রাস্তা পেয়েছে। হাওড়া থেকে যে গাড়ী দিল্লী যায়, সেই গাড়ীতে চড়ে কাশীর যাত্রীদের আগে মোগলসরাই নামতে হতো। সেখান হতে গঙ্গা পার হ'লেই কাশী। এখন আর মোগলসরাই নেমে নৌকায় গঙ্গা পার হ'য়ে কাশী দর্শন করতে হয় না; অযোধ্যা ও রোহিলখণ্ড রেলওয়ে মোগলসরাই হতে বের হয়েছে, এবং কাশীর নীচেই প্রকাণ্ড পুল হয়েছে; তাই পার হয়ে রাজঘাট ষ্টেশনে নেমে গাড়ী বা নৌকায় লোকে কাশী যায়। কাশীর বিশ্বেশ্বরের মন্দির সেখান হতে প্রায় এক মাইল হবে। তার পরেই ''বেনারস সিটি ষ্টেশন।'' অফিস আদালত সাহেবপাড়া সমস্তই সিকরোলের কাছে। এই সিকরোলের ভিতর দিয়ে অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়ে বরাবর চলে গিয়েছে এবং অযোধ্যা পার হয়ে লক্ষ্ণৌ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে একেবারে সাহারাণপুরে গিয়ে উত্তর-পশ্চিম রেলওয়ের সঙ্গে মিশেছে। এই অযোধ্যা-রোহিলখণ্ড রেলওয়েতে বেরেলীর একটা শাখা রেলওয়ে আছে। কাঠগুদাম পর্যন্ত সোজা উত্তরেও একটা শাখা রেলওয়ে আছে। কাঠগুদামে নেমে আল্‌মোড়ার মধ্য দিয়ে হাঁটা-পথ পাওয়া যায়। এ পথটাও মন্দ নয়। এই পথ দিয়ে চলে এসে কর্ণপ্রয়াগে বদ্রীনারায়ণের রাস্তায় পড়তে হয়।এখান হতে যারা পরিক্রমণ করবে অর্থাৎ প্রথমে কেদারনাথ দর্শন করে তারপর বদ্রীকাশ্রমে যাবে, তারা কর্ণপ্রয়াগ হতে নীচে নেমে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত যায়; এবং সেখান হতে কেদারের পথে চলে যায়, কেদার দর্শন করে আর সে পথে ফেরে না। সেই জায়গা হতে আর একটা পথ এসে লালসাঙ্গা নামক একটা জায়গায় বদ্রীকাশ্রমের রাস্তার সঙ্গে মিশেছে। যারা এ পথ ধরে যায়, তাদের শ্রীনগর কি দেবপ্রয়াগ দেখা হয় না।

আমরা কর্ণপ্রয়াগের সাঁকো পার হয়ে অপর পারের সঙ্গমস্থলে স্নান করলাম। শীতের ভয়ে রাস্তায় আমি স্নানকে যতদূর সম্ভব পরিহার করেছিলাম; কিন্তু এখানে এসে যদি নিদেন একটা ডুবও না দিয়ে এ জায়গাটা ছেড়ে যাই, তা হলে কাজটা বড়ই খারাপ দেখাবে; আর যাই হোক, যমের কাছে ন্যায়সঙ্গত কোন কৈফিয়ৎ দিতে পারবো না। অতএব অনেক আয়োজনের পর স্নান করা গেল। জল দারুণ ঠাণ্ডা, তবু এখন জৈষ্ঠ্যমাস শীতকালে কি অবস্থা হয়, তা কল্পনাতেও আনতে পারা যায় না।

সঙ্গমস্থলের উপরেই কর্ণবীরের এক প্রকাণ্ড জীর্ণ মন্দির। মহাবীর কর্ণ দ্বাপরের লোক, অন্ততঃ তাঁর ক্রিয়াকাণ্ড দ্বাপর ও কলির সন্ধিস্থলেই ঘটেছিল; কিন্তু এ মন্দির দ্বাপরযুগের চেয়ে আধুনিক বলে বোধ হলো না। এ পর্যন্ত যে সকল পতনোন্মুখ জীর্ণ

মন্দির দেখেছি, তাদের যে কেউ সংস্কার করাবে, সে আশা কিছুমত্র নেই, সুতরাং সে সমস্ত মন্দিরের অধিকাংশই দু'পাঁচ বৎসরের মধ্যেই ভুমিসাৎ হবে, এমন সম্ভাবনা দেখা যায়। এই কর্ণের মন্দিরেরও সে সম্ভাবনা যথেষ্ট আছে। মন্দিরের পুরোহিত বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের কিন্তু এর দায়িত্বের প্রতি অগাধ বিশ্বাস। তিনি বললেন যে, তাঁর বাল্যকাল হতে মন্দিরের এই অবস্থা তিনি দেখে আসছেন; যতটুকু ফাটা ছিল, এই দীর্ঘকালে তার আধ ইঞ্চি বেশীও বাড়ে নি। মন্দিরটি পাথরের, চৌকাঠও পাথরের, দ্বার লোহার। মন্দিরের মধ্যে একটা প্রকাণ্ড ঘণ্টা ঝুলান আছে, সেই ঘণ্টাটি নেড়ে যাত্রীদের মন্দিরে প্রবেশ করতে হয়। ঘণ্টা নাড়া যদি অবশ্য কর্তব্য হয়, তা হলে আমি আমার ম্যালেরিয়াগ্রস্থ যকৃৎ-প্লীহাধারী বঙ্গীয় ভ্রাতাদের সাবধান করছি, তাঁরা যেন এখানে এই মন্দিরে প্রবেশ করবার দুঃসাহস প্রকাশ না করেন। যা হোক, আমি বহু কষ্টে মন্দিরে প্রবেশ করতে সমর্থ হয়েছিলাম।

মন্দিরের মধ্যে মহাবীর কর্ণ ও তাঁর মহিষীর মূর্তি বর্তমান। মূর্তি প্রস্তরনির্ম্মিত, খুব পুরাণ; তাতে কিন্তু শিল্পীর ভাস্কর-বিদ্যার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বহুমূল্য অলংকারাদি কিছুই নেই; শুনা গেল পূর্বে ছিল, নেপালযুদ্ধের সময় তা অপহৃত হয়েছে। বীরবরের অবস্থা বড়ই শোচনীয়। যাত্রীদের কাছ থেকে যা কিছু পাওয়া যায়, তারই উপর তাঁকে ও তাঁর পুরোহিতকে নির্ভর করতে হয়। যাত্রীরা অনেকে সঙ্গমস্থলে শ্রাদ্ধ তর্পণাদি করে, তাতে পুরোহিত ঠাকুরের অল্পবিস্তর লাভ হয়।

কর্ণপ্রয়াগে অধিবাসীর সংখ্যা বেশী নয়। সকলেই বড় গরীব, অতি কষ্টে দিনপাত করে। আমাদের দেশের আউট পোষ্টের মত এখানে একটা ছোট থানা আছে। থানায় হেডকনেষ্টবল ও চার পাঁচজন কনেষ্টবল আছে, কনেষ্টবলেরা রাত্রে চৌকি দেয়। আমাদের দেশের কনেষ্টবল ও এখানকার কনেষ্টবল কিছুই তফাৎ দেখলাম ন। আমাদের দেশের প্রভুদের মত এরাও শিষ্টের দমন ও দুষ্টের পালন করে থাকেন, এবং দু'পয়সা লাভের আশায় একজন নিরীহ ব্যক্তির সর্বনাশ করতে কিছুমাত্র আপত্তি বোধ করেন না। এখানকার কনেষ্টবলদের যে রকম মেজাজ দেখা গেল, তাতে যে তারা কষ্ট স্বীকার করে প্রতি রাত্রিতে চৌকি দেয় এমন মনে হলো না; তবে আমরা এখানে যে দু'রাত্রি ছিলাম, সে দু'রাত্রিতেই এদের হাঁক দু'তিনবার করে শুনেছিলাম। পাঠক মহাশয় অনুগ্রহ করে মনে করবেন না যে, তারা আমাদের চোর বিবেচনা করে এতখানি সতর্কতা অবলম্বন করেছিল। তারা যদি সেই সিদ্ধান্ত করে এ রকম সতর্ক হতো, তবে তাদের প্রশংসা করবার কারণ ছিল; কিন্তু তারা এতখানি সতর্ক হয়েছিল তার কারণ, সেদিন ঐ বিভাগের পুলিশ ইনস্পেক্টর পরিদর্শন উপলক্ষে এখানে উপস্থিত ছিলেন। তাঁকে একটু কার্যপটুতা দেখান এরা অনাবশ্যক বলে মনে করে নি।

অপরাহ্নে একাকিই ডাক্তারখানা দেখতে গেলাম। ডাক্তারবাবুটি নূতন লোক, সবে তিন দিন হ'লো এখানে এসেছেন। এই অশিক্ষিত লোকের মধ্যে নিঃসঙ্গ প্রবাসে তাঁর দিন যে কেমন করে কাটছে, তা আমি ঠিক করে উঠতে পারলাম না। এই তিন দিন একা থেকে বোধ হলো তিনি খানিকটা দোমে গিয়েছেন। তাঁর কাছে যেতেই তিনি আমাকে মহা সমাদরে গ্রহণ করলেন। দুই একটি কথাতেই বুঝলাম, লোকটি বড় বিনয়ী। ডাক্তারবাবুর বয়স ত্রিশ বৎসরেরও কম বলে বোধ হলো। এঁর বাড়ী মুরাদাবাদের কাছে

একটি গ্রামে, লাহোর মেডিকেল স্কুল থেকে ডক্তারী পাশ করেছেন; আজ সাত বছর গবর্ণমেন্টের চাকুরী করছেন। ইংরেজী ভাল না জানলেও কথাবার্তা চলনসই বলতে পারেন। আমার সঙ্গে অনেকক্ষণ পর্যন্ত ইংরাজীতেই আলাপ করলেন; শেষে যখন আমার মুখে শুনলেন যে,আমি অনেকদিন থেকে পশ্চিমাঞ্চলে আছি, তখন ইংরেজী ছেড়ে হিন্দুস্থানীতে কথা আরম্ভ করলেন।

খানিক পরে তাঁর হাসপাতাল দেখতে গেলাম। সেদিন সেখানে দশবারো জন রোগী ছিল, তার মধ্যে একজনও বাঙালী দেখা গেল না। রোগীদের উপর ডাক্তারবাবুর বড় যত্ন। শুধু কর্তব্য বলে যে তাঁর যত্ন তা বোধ হলো না; বাস্তবিক তাদের জন্য তাঁর একটু প্রাণের আগ্রহ দেখা গেল।

হাসপাতাল দেখা হলে পুনর্ব্বার তার বিশ্রামকক্ষে এসে বসলাম। তাঁর টেবিলের উপর তিন চারখানা খবরের কাগজ দেখলাম, তার মধ্যে লাহোরের Tribune ও কলিকাতার অমৃতবাজার পত্রিকা ছিল। অনেকদিন পরে অমৃতবাজার হাতে পড়ায় মনে বড় আনন্দ হলো। এই দুর্গম পাহাড়ের মধ্যেও অমৃতবাজার আসে! আমাদের দেশের কাগজের এ রকম বিস্তৃতি লক্ষ্য করে মনের মধ্যে একটু অহঙ্কার জন্মালো। অমৃতবাজার সম্পাদক মহাশয়ের উপর ডাক্তারবাবুর গভীর ভক্তি; তিনি তাঁকে এতদূর উচ্চ মনে করেন যে অনায়াসে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, ''Is there any like him in Bengal ?'' আমি উত্তরে তাঁকে বাবু সুরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নরেন্দ্রনাথ সেনের নাম বললাম। সুরেন্দ্রবাবুর বক্তৃতা তিনি লাহোরে একবার শুনেছিলেন, তাঁকে Prophet of India বলে উল্লেখ করলেন, আমি যে সুরেন্দ্রবাবুর নাম করলাম, তিনি সেই বক্তা সুরেন্দ্রবাবু কি না ! আমি উত্তর দিলে তিনি বললেন সুরেন্দ্রবাবু যে সংবাদপত্রের সম্পাদক, তা তিনি ইতিপূর্বে জানতেন না। যাহোক আমার কাছ থেকে তিনি বেঙ্গলী ও মিররের ঠিকানা লিখে নিলেন এবং বললেন তিনি শীঘ্রই স্থানান্তরে বদলী হবেন, সেখানে গিয়েই এই পত্রিকা দু'খানা নেবেন।

আমাদের কথাবার্তা হচ্ছে এমন সময় আর একটি ভদ্র যুবক সেখানে উপস্থিত হ'লেন। ডাক্তারবাবু তাঁকে সমাদর করে তাঁর সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। ইনি পূর্বকথিত পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর। এঁর বাড়ী আম্বালায়, লাহোর কলেজে বি.এ পর্যন্ত পড়েছিলেন। কথাবার্তায় যতদূর বুঝলাম, দেখলাম লোকটির বেশ পড়াশুনা আছে। তিনি খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ''সন্ন্যাসী চোর নয় বোচকায় ঘটায়'' – এ প্রবচনটা আমার পক্ষে বেশ খেটে গেল। তিনি পুলিশের লোক, সুতরাং যে কথাটার অর্থ ভাল হয়, তিনি তার কুটর্থ টেনে আনবেন এর আশ্চর্য কি ? – তিনি সিদ্ধান্ত করলেন যে, আমি নিশ্চয়ই কোন ''পলিটিক্যাল অবজেক্ট'' নিয়ে বের হয়েছি; এমন কি আমার ''অবজেক্টটা'' কি তাও জানবার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করলেন; কিন্তু বলা বাহুল্য কৃতকার্য হতে পারলেন না; তবে সে আমার দোষ কি তাঁর দোষ তা নিশ্চয় বলা যায় না। আমি কিন্তু তাঁকে যৎপরোনাস্তি আয়াসের সঙ্গে বুঝাতে চেষ্টা করলাম যে , সেই জনহীন পাহাড়ের মধ্যে আমার মত একজন বাঙালীর কোন ''পলিটিক্যাল অবজেক্টই'' সিদ্ধ হতে পারে না। অবশেষে তিনি বললেন, ''I can not bring myself to beleive that a man of culture like you has been taking so much trouble to go to see a shrine'' . আমি কি শুধু ভাঙা মন্দিরে কতকগুলি বহু পুরাতন দেবমূর্তি দেখবার জন্যে অনাহারে অনিদ্রায় কঠোর পরিশ্রম করে পাহাড়ে পাহাড়ে বেড়াচ্ছি ? – এরা কি আমার কঙ্কালসার হৃদয়ের গভীর বেদনা ? পার্বত্য–নগ্ন–সৌন্দর্য, প্রকৃতির বিচিত্র দৃশ্য খরতোয়া বঙ্কিম গিরিনদীর রজতপ্রবাহ ও সুশীতল সমিরণের অবারিত হিল্লোল, এরাই যে আমার জীবনের উপাস্য দেবতা , ইন্‌স্পেক্টর তা বুঝতে পারলেন না।

যাহোক ইন্‌স্পেক্টর বাবুর সঙ্গে অন্যন্য বিষয়েও অনেক কথা হলো। ক্রমে বৃটিশ পার্লিয়ামেণ্ট, আইরিশ হোমরুল ও জাতীয় মহাসমিতি হতে আরম্ভ করে আমাদের প্লীহাবৃদ্ধি ও তার সঙ্গে সাহেবদের ঘুঁসির নৈকট্য প্রভৃতি সমস্ত বিষয়েই আলোচনা করা গেল। ইন্‌স্পেক্টর বাবু সেইদিনই চলে যাবেন। তিনি তাঁর ঠিকানা আমাকে দিয়ে গেলেন এবং বললেন যদি রাস্তায় কোন অসুবিধা হয় এবং কোনখানে থানাওয়ালা কোনো যাত্রীর উপর অত্যাচার করে তা হলে আমি যেন অবিলম্বে তাঁকে সে কথা জানাই। তাঁকে এ সমস্ত কথা জানালে, তিনি অত্যন্ত বাধিত হবেন এবং প্রতিকারের যথেষ্ট চেষ্টা করবেন। ইন্‌স্পেক্টর বাবুর ভদ্রতায় আমি খুব আনন্দ লাভ করলাম।

ইন্‌স্পেক্টর বাবু চলে গেলে আমি উঠবার যোগাড় করলাম।, কিন্তু ডাক্তারবাবু আমার জন্যে প্রচুর জলযোগের আয়োজন করেছিলেন; সুতরাং তাঁকে একটু বাধিত করা দরকার হলো। তাঁর কাছে বিদায় নেবার সময় তিনি আমার সঙ্গে কতকগুলি কুইনাইনের বড়ী, আমাশয়ের বড়ী প্রভৃতি তিন চার রকম দরকারী ঔষধ দিলেন। আমার নিজের কিছুই দরকার ছিল না, সে কথা তাঁকে বললে তিনি উত্তর দিলেন যে, সেগুলি সঙ্গে থাকলে অন্ততঃ রাস্তাতেও কোন পীড়িত বিপন্ন ব্যক্তিকে সাহায্য করা চলবে। এর পর আর কোনো কথা নেই। আমি তাঁকে হৃদয়ের সঙ্গে ধন্যবাদ করে ঔষধগুলি নিয়ে বাসায় ফিরে এলাম। এখন অপরাহ্ন পাঁচটা।

বাসায় এসে দেখি, সকলেই যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। আমাদের নন্দপ্রয়াগের দিকে খানিকটে অগ্রসর হযে থাকা দরকার; কারণ আগামীকাল চন্দ্রগ্রহণ। গ্রহণের ন্যায় শুভদিনে রাস্তায় কোন চটিতে না পড়ে থেকে একেবারে নন্দপ্রয়াগে পৌঁছতে সকলেরই আগ্রহ। সঙ্গীদ্বয় যদি এই অভিপ্রায় কিছুক্ষণ আগে ব্যক্ত করতেন, তা হলে অনায়াসে আরও দু'ঘন্টা আগে বের হওয়া যেত। যা হোক সেই অপরাহ্নেই নন্দপ্রয়াগ ছেড়ে চলতে আরম্ভ করলাম। বৈকালে বেশী পথ চলা যায় না, তার উপর পথ খুব খারাপ, পরপর শুধু চড়াই আর উৎরাই। কাজেই সন্ধ্যা লাগতে লাগতে কর্ণপ্রয়াগ থেকে তিন মাইলের বেশী যেতে পারি নি। যেখানে এসে সন্ধ্যা লাগলো সে জায়গাটার নাম কাঙ্কা চটি।

আমরা কাঙ্কা চটিতেই রাত্রি কাটান স্থির করলাম। এই চটিতে একখানি মাত্র ঘর; তবে ঘরখানি একটু বড় – এই যা কথা। ঘর পাতা দিয়ে ছাওয়া, কোনো দিকে বেড়া নেই। চটিওয়ালা বড় ভাল মানুষ, দোকানদার হলেও তার ব্যবহার বড় ভদ্র। এ দেশের চটিওয়ালারা ঘর ভাড়া নেয় না, অধিকন্তু যাত্রীদের থালা, ঘটি, কড়াই প্রভৃতি দিয়ে সাহায্য করে। প্রত্যেক চটিওয়ালার দোকানেই এ রকম সাত আট প্রস্থ জিনিস থাকে। রাস্তা যে রকম দুর্গম, তাতে নিজের শরীরকেই সময় সময় ব'য়ে নিয়ে যেতে হয়, তা

হলে শুধু আমাদের মত দুর্বল বাঙালী কেন , অনেক কষ্টসহিষ্ণু হিন্দুস্থানীকেও এই পথে যাওয়ার অভিপ্রায় ত্যাগ করতে হয়। তবু হিন্দুস্থানীরা কখন কখন দুই একটা অবশ্য-ব্যবহার্য্য জিনিস সঙ্গে নিয়ে আসে। চটিওয়ালাদের একটা নিয়ম আছে, তাদের দোকান থেকে যদি আবশ্যক খাদ্য দ্রব্যাদি না কিনে সঙ্গে নিয়ে আসা যায় তা হলে চটিওয়ালা থালি বর্ত্তন (থালা বাটী ইতাদি বাসন) দেওয়া ত দূরের কথা, সে যাত্রীকে তাদের ঘরেই বসতে দেবে না; কারণ নারায়ণযাত্রীদের কাছ থেকে আশ্রয়-স্থানের ভাড়া নেওয়া তাদের মতে মহাপাপ, অথচ নারায়নযাত্রী যে তাদের আশ্রয় অভাবে গাছের তলায় পড়ে শীতে মারা যাবে তাতে তাদের অপরাধ হবে না। চটিওয়ালারা বলে যে, তাদের দোকান থেকে জিনিস কিনলে যে লাভ হয়, তাতেই তাদের দোকানের ভাড়া ইত্যাদি পুষিয়ে যায়; তারা ত আর ঘরের পয়সা ব্যয় করে সদাব্রত খোলে নি। এ কথার কোন বৈষয়িক উত্তর দেওয়া শক্ত। চটিতে কোনও বিছানা পাবার যো নেই; নিজের কম্বলই একমাত্র সম্বল।

তবু আমরা এখানে বেশ সুখে ছিলাম। চটিওয়ালা সকাল সকাল আমাদের খাওয়া দাওয়ার যোগাড় করে দিলে, এবং পুদিনা ও তেঁতুল দিয়ে সে নিজে এমন সুস্বাদু চাটনি তৈয়ারি করলে, যার কথা বহুদিন আমাদের মনে থাকবে।

আমরা পথশ্রমে কাতর হয়েছিলাম, আহারাদির পর শয়ন করা গেল। কিন্তু আর সকল গুণ থাকলেও চটিওয়ালার এক মহৎ দোষ ছিল, সে কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় ধর্ম্মালাপী। সে আমাদের পাশে বসে ধর্ম্মালাপ ও ভীমসেনের আহারের পরিমাণ প্রভৃতি অসাধারণ বিষয়ে প্রশ্ন করতে লাগলো। বলা বাহুল্য, আমাদের দ্বারা তার কৌতূহল নিবৃত্তির বড় সুবিধে হয় নি। বিশেষতঃ কানের গোড়ায় যে বক্ বক্ করাতে বৈদান্তিক ভায়া যে রকম অশান্তভাবে উঃ! আঃ! করতে লাগলেন, তাতে আমার ভয় হলো, হয় ত বা নিদ্রাকাতর অসহিষ্ণু বৈদান্তিক কিছু গোলযোগ বাধাবেন। যা হোক, ক্রমে আমাদের সকলকে নিদ্রামগ্ন দেখে চটিওয়ালা বোধ করি ভগ্নোৎসাহে শুতে গিয়েছিল। শেষরাত্রে জেগে দেখি, আকাশ ভয়ানক অন্ধকার, মেঘে চতুর্দ্দিকে আচ্ছন্ন, অল্প অল্প বৃষ্টিও পড়ছে। মেঘের গতিক দেখে সঙ্গীগণ বের হবেন কি না, তাই ইতস্ততঃ করতে লাগলেন। আমি কথাবার্তা না বলে কম্বল মুড়ি দিয়ে রাস্তায় নেমে পড়বার উদ্যোগ করতে লাগলাম।

২৩ মে, শনিবার। কয়েকদিন আগে বৈদান্তিক ভায়া শিলাবর্ষণের সুখ মর্ম্মে মর্ম্মে উপলব্ধি করেছিলেন, আজ আকাশে এই রকম ঘোর ঘনঘটা দেখে চটি ত্যাগ করা সম্বন্ধে তাঁকে কিঞ্চিৎ উদাসীন দেখা গেল, এবং তিনি তাঁর ধুলিলাঞ্ছিত কম্বলখানিতে সর্বশরীর ভাল করে ঢেকে এই গুরুগম্ভীর মেঘগর্জ্জন ও ঝুপ-ঝাপ বৃষ্টিপতনের মধ্যে আর একবার দীর্ঘনিদ্রার আয়োজন করতে লাগলেন। আজ তাঁকে কিঞ্চিৎ শিক্ষা দেওয়া আমি বাহুল্য বোধ করলাম না। টানাটানিতে তাঁর কম্বলখানির ''নতুনত্ব'' আরও একটু বাড়িয়ে তাঁকে আমাদের সঙ্গে যাত্রা করতে বাধ্য করলাম এবং বৃষ্টির মধ্যেই চলতে আরম্ভ করা গেল, কিন্তু মেঘের অবস্থা দেখে কারও বুঝতে বাকী রইল না যে, আজ গ্রহণ দেখা অসম্ভব। তবু যতটা পথ এগিয়ে থাকা যায়, সেই ভাল মনে করেই আমরা দুর্যোগের মধ্যেও চলতে লাগলাম; বৈদান্তিক আমার পশ্চাতে পশ্চাতে নীরবে পথ

অতিক্রম করতে লাগলেন। আমার মস্তকে আশু বজ্রপাতের প্রার্থনা ছাড়া সে সময়ে যে তিনি অন্য কোনও চিন্তায় মনোনিবেশ করেছিলেন , এমন মনে হয় না।

রাস্তায় খানিকদূর এসে আমরা একটা পরিত্যক্ত দোতলা বাড়ী ও বাগান দেখতে পেলাম। বাড়িটি একে পরিত্যক্ত, তার উপর বহু প্রাচীন। তার পূর্বেকার শোভা ও সম্পদ এখন সম্পূর্ণ অপসৃত হয়েছে, কিন্তু এই নির্জন পার্বত্য–প্রদেশে, বৃক্ষরাজি–সমাচ্ছন্ন এই ভগ্ন অট্টালিকা আমার ন্যায় কল্পনাজীবীর পক্ষে এক নূতন কল্পনার রাজ্য খুলে দিলে। সেই বহুপূর্বে যখন এই অট্টালিকা সমৃদ্ধ ও জনপূর্ণ ছিল, সেই সময়ের একটা পবিত্র ও প্রশান্ত দৃশ্য আমার সম্মুখে বিকশিত হলো। যেন কোন তেজঃপুঞ্জ যোগিবর ঐ সম্মুখের বাঁধান বটমূলে বসে প্রভাত সূর্যের দিকে চেয়ে হৃদয়ের অন্তস্থল হতে বিশ্বপিতার স্তুতিগান করছেন এবং সেই গভীর মহান সঙ্গীতের প্রতি বর্ণ প্রভাতরাগরঞ্জিত স্তব্ধ বনস্থলীতে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে। সাধুর অগণ্য শিষ্যবৃন্দ চারিদিকে নানা কার্যে ব্যস্ত। কেহ কেহ প্রজ্জ্বলিত অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে মৃগচর্মে বসে উর্ধমুখে সামগান করছেন, কেহ অপেক্ষাকৃত অল্পবয়স্ক যুবক সাধুকে তত্ত্বোপদেশ দিচ্ছেন, কেহ বা স্নানান্তে সর্বশরীরে বিভূতি মেখে সুদীর্ঘ জটাপাশ রৌদ্রে ছেড়ে দিয়ে বসে আছেন। বশিষ্ঠের আশ্রম, বিশ্বামিত্রের তপোবন, শান্তরসাস্পদ সকল জায়গার কথা ধীরে ধীরে আমার হৃদয় অধিকার করলে। অতীত গৌরবের জীর্ণ সমাধি বুকের মধ্যে নিয়ে এই বিস্তীর্ণ অট্টালিকার বিদীর্ণপ্রায় পঞ্জরগুলি কতকাল থেকে এই নির্জন প্রদেশে একটা বিমল শান্তির উৎস খুলে দিয়েছে। কিন্তু তীর্থযাত্রীর মধ্যে কয়জন লোক এই পুণ্যাশ্রমের ভগ্নাবশেষ দেখে মুগ্ধ হয় ? যে সব যাত্রী এই রাস্তায় চলে, তাদের মধ্যে বোধ করি অতি অল্প লোকই এই অট্টালিকায় প্রবেশ করে আপনাদের মূল্যবান সময় নষ্ট করেছে। আমাদের আগে আগেও দুই একদল যাত্রী যাচ্ছিল; এই অট্টালিকার কাছে এসে উদাসীনভাবে তারা একবার এর দিকে চাইলে, তারপর ''মালুম হোতা কি হিঁয়া কে স্বামিজীকা আশ্রম থা।'' এই পর্যন্ত বলেই সেই স্থান ত্যাগ করলে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই আশ্রমের প্রত্যেক বৃক্ষলতার সঙ্গে শান্তি, আনন্দ ও প্রেমের এমন একটা মাধুর্য বিজড়িত রয়েছে, এই ভগ্ন অট্টালিকার প্রত্যেক প্রাচীর এবং কক্ষগুলিতে এমন একটি নীরব ইতিহাস অঙ্কিত আছে, যা দৃষ্টিপথে না পড়েই থাকতে পারে না।

বেলা তখন প্রায় নয়টা। বৃষ্টি একটু একটু থেমে গিয়েছে, রৌদ্রও উঠেছে। আমি সেই বাঁধা বটতলায় বসে নানা কথা ভাবচি, মাথার উপর টুপ্‌টাপ্‌ করে বৃক্ষপল্লবচ্যুত জলবিন্দু পড়াতে একটা পুরাতন গান মনে পড়ে গেল, –

> ''আবার বল্‌ রে তরু প্রভাতকালে,
> ধরা ভেসে যায় তোর নয়নজলে,
> না জেনে লোকে বলে শিশিরপড়া জল রে।''

বাস্তবিক এ জায়গাটাতে এমন একট স্নিগ্ধ সৌম্য ভাব মনের মধ্যে জাগিয়ে দেয়, যে ভগবানের করুণা ও প্রকৃতির বিশ্বব্যাপী সুশোভনত্ব স্বতঃই হৃদয় অধিকার করে।

আমার সঙ্গীরা আমার পিছনে পিছনে আসছিলেন। আমার অস্বাভাবিক গতি-বৃদ্ধি বশতঃই হোক কি তাঁদের স্বাভাবিক ধীরতা বশতঃই হোক, তাঁরা অনেক পিছিয়ে পড়েছেন। তাঁদের পথ চেয়ে আমি এতক্ষণ এই ভগ্ন অট্টালিকার ভিতর প্রবেশ করিনি; ভাবছিলাম সকলে একসঙ্গেই যাব; কিন্তু একঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন তাঁদের দেখতে পেলাম না, তখন একাই সেই নির্জন অট্টালিকায় প্রবেশ করলাম। দেখলাম অট্টালিকা জঙ্গলে পরিপূর্ণ হয়ে গিয়েছে; কিন্তু এখনও দেয়ালে কোনও ব্রহ্মপরায়ণ সাধুর অনুষ্ঠিত পবিত্র হোমাগ্নির চিহ্ন অঙ্কিত করে রেখেছে। এই যজ্ঞধুমের সুগন্ধ এখনও যেন চারিপাশের বায়ুস্তর আমোদিত করছে। প্রত্যেক ঘরেরই মাঝখানে এক একটা অগ্নিকুণ্ড; ধর্মানুষ্ঠানের জন্যেই ইহা তৈয়ারি হয়েছিল বলে মনে হলো। নীচের পাঁচটা ঘরে কিছু নেই। উপরে উঠবার জন্য সিঁড়ির সন্ধান করতে লাগলাম। বহু অনুসন্ধানে প্রায় গলদঘর্ম হয়ে অনেকক্ষণ পরে একটা সিঁড়ি আবিষ্কার করা গেল। ধাপগুলি কতক বা ভেঙে গিয়েছে , আর কতকের উপর বড় বড় গাছ জন্মেছে। যা হোক বিশেষ সতর্ক হয়ে উপরে উঠলাম। সম্মুখেই দেখি একটা প্রকাণ্ড হল, ও তার যে পাশে নদী, সেইদিকে দুটি ঘর; প্রত্যেক ঘরে নদীর দিকে চার পাঁচটা জানালা। জানালার শুধু ফুকোর বর্তমান, কপাট-চৌকাঠ অনেক পূর্বেই অন্তর্হিত হয়েছে।

উপরে হলটি আজও বেশ পরিষ্কার আছে। দেওয়ালে নানারকম ছবি আঁকা; দুই একটা ছবি মুছে গিয়েছে, কোন কোনটার রঙ ময়লা। কিন্তু অনেক ছবির রঙই বেশ উজ্জ্বল আছে। সকল চাবিই হিন্দুস্থানী ধরনের, এবং যে সকল রঙে আঁকা হয়েছে, সেগুলি অতি উৎকৃষ্ট। চিত্রকরও যে সুনিপুণ, তা ছবিগুলি লক্ষ্য করে দেখলেই বুঝতে পারা যায়।

আমি ছবি দেখতে লাগলাম। প্রথমেই দেবাসুরের সমুদ্রমন্থন নজরে পড়ল। নাগরাজ শেষকে মন্থনরজ্জু করে দেব ও দানবে মহোৎসাহে সমুদ্র-মন্থন আরম্ভ করেছে; কোন দিকে দেবতার দল আর কোন দিকে দানবের দল, তা চিনে নেওয়া একটু শক্ত। তবে দেব-দানবের চেহারার মধ্যে এইটুকু পার্থক্য দেখা গেল যে, দেবতাদের নিতান্ত ভাল মানুষের মত, তাঁরা প্রায় সকলেই মুকুটধারী; আর দানবের চেহারা অনেকটা ডাকাতের মত; গাট্টাগোট্টা শরীর , মোটা-মোটা চোখ, এবং ঝাঁকড়া চুল; যেন তাদের শরীরের প্রত্যেক মাংসপেশী হতে একটা জাগ্রত উৎসাহ ও কার্যতৎপরতার আভাস পাওয়া যাচ্ছে; মুখে যেন দৃঢ় প্রতিজ্ঞার চিহ্ন সুস্পষ্ট অঙ্কিত। কিন্তু সবচেয়ে প্রধান বিশেষত্ব আমার বোধ হলো, তাদের আকৃতির ও পরিচ্ছেদের; - দুইই হিন্দুস্থানী ধরণের। আমাদের সেই সমতল বঙ্গভূমির ইন্দ্রের চেহারা কেমন বরের মত; কিন্তু পার্বত্য প্রদেশে এই বাড়ীর দেওয়ালে ইন্দ্র যে মূর্তিতে বিরাজ করছেন, তাতে আমার দূরের কথা, ইন্দ্রাণী স্বয়ং বাঙলা মুলুক হতে এখানে এসে দেবরাজকে খুঁজে নিতে পারেন, নিতান্ত চাক্ষুষ প্রমাণ ছাড়া এ কথা বিশ্বাস করতে পারি নে।

সমুদ্র মন্থনের পরবর্তী চিত্র সীতার বিবাহ। নবজলধরকান্তি সৌম্যমূর্তি রামচন্দ্র হরধনু ভেঙে বরের বেশে সভাতলে দাঁড়িয়ে আছেন। নতমুখ; কিন্তু বিনয় এবং সমাগত রাজা,

ঋষি ও ব্রাহ্মণদের প্রতি এক সুগভীর সম্মানের ভরে সেই সুন্দর মুখ এক আশ্চর্য্য শোভা ধারণ করেছে; সীতাদেবী পুষ্পমালা হস্তে সেই বিবাহসভায় অগ্রসর হচ্ছেন; সঙ্গে সুহাসিনী সুন্দরী সখীর দল। এই আনন্দপূর্ণ দিনে, বিপুল উৎসাহের মধ্যে তাদের অসীম আনন্দ যেন তাদের হৃদয় মধ্যে আর বেঁধে রাখতে পারছে না। বর্ষাকালে নদীর জল যেমন নদীর পরিসর পরিপূর্ণ করে দুই কূল প্লাবিত করে, এদের হৃদয় পূর্ণ করে তেমনি সর্বশরীরে একটা দুর্দ্দমনীয় চাঞ্চল্য উপস্থিত করেছে, এবং সেই জন্যে তাদের আরও সুন্দর লাগছে। লজ্জায় সীতাদেবীর মুখখানি শুকিয়ে গিয়েছে, এবং শত শত সভাসদ্‌বর্গের কৌতূহলপূর্ণ স্থির দৃষ্টি সেই লজ্জামণ্ডিত কোমল মুখখানির উপর যুগপৎ বর্ষিত হয়ে তাঁকে আরও বিপন্ন করে তুলেছে; কিন্তু তবু যেন হৃদয়ের প্রসন্নতা মুখে প্রতিফলিত হচ্ছে। বিবাহ–সভার একবার লক্ষণ, ভরত ও শত্রুঘ্ন উপবিষ্ট। উচ্চ গৃহচূড়া থেকে উর্মীলা, মাণ্ডবী এবং শ্রুতকীর্তি অলক্ষিতভাবে তাঁদের দেখে অতিকষ্টে প্রবল হাস্যবেগ সংবরণ করছেন। এঁদের তিন ভাইয়ের আকার প্রকার ও বেশভূষায় আমি এমন কিছু দেখলাম না, যাতে করে হঠাৎ এইরকম অপর্য্যাপ্ত হাসির আমদানী হতে পারে; তবে কথা এই যে; তরুণীদের হাস্যের সর্বদা সন্তোষজনক কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না। এ সম্বন্ধে আমার বিশেষ অভিজ্ঞতা নেই, এবং আশা করি যাঁদের সম্বন্ধে আমি হঠাৎ একটা মন্তব্য প্রকাশ করে ফেলেছি, তাঁদের সদয়–হৃদয় আমাকে ক্ষমা করতে কুণ্ঠিত হবে না।

সীতার বিবাহের পরই শিবের বিবাহের ছবি। স্ত্রী–আচার হচ্ছে; এয়োরা বরকে চারিদিকে ঘিরে হুলাহুলি করচে; বর কিন্তু প্রশান্তভাবে দঁড়িয়ে আছেন, এ আনন্দস্রোতে তাঁকে কিছুমাত্র চঞ্চল করতে পারে নি। বরের বিবাহ–সাজ কিছুই দেখলাম না; কারণ তিনি বিয়ে করতে এসেও ''ইউনিফর্ম'' ছাড়েন নি। এখনও পরণে সেই বাঘছাল, গায়ে বিভূতি ও মস্তকে পিঙ্গলবর্ণ জটার উপর উদ্যতফণা সর্প। বর দেখে, কোন কোন পুরনারী ভারি নিরাশ হয়ে স্থানান্তরে দাঁড়িয়ে দুঃখ করছেন। এই বিবাহের ঘটক নারদ। বৃদ্ধের বড়ই সাধ , তিনি একটু অন্তরালে থেকে স্ত্রী–আচারটি এক নজরে দেখে নেন, কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য তিনি রমণীদের সর্বত্রগামী দৃষ্টি এড়াতে পারেন নি। তিনটি কুমারী ছুটে এসে একজন তাঁর কাপড়, একজন উত্তরীয় এবং একজন তাঁর আবক্ষবিলম্বিত শুভ্রদাড়ীটি চেপে ধরেছে। বুড়োর সখও মন্দ নয়, বীণাযন্ত্রটি পর্য্যন্ত হাতে করে এসেছেন। নিজেকে নিতান্ত নিঃসহায়ভাবে কুমারীদের হাতে ছেড়ে দিয়ে, বীণাযন্ত্রটি যাতে এ–যাত্রা রক্ষা পায়, সেই জন্য যন্ত্রসমেত দক্ষিণ হস্তখানি ঊর্ধে তুলেছেন, এবং অন্য দুটি কুমারী বীণাযন্ত্রটি কেড়ে নেবার জন্য চেষ্টা করছে। নারদ বেচারীর ব্যতিব্যস্ত ভাব দেখে আমার বড়ই হাসি এল।

তার পরই দ্রৌপদীর স্বয়ম্বরের ছবি দেখতে পেলাম। অর্জ্জুন লক্ষ্য ভেদ করেছেন; দ্রৌপদী তাঁকে বরমাল্য দিতে যাচ্ছেন। মধ্যপথে যেতে না যেতেই সমাগত ক্ষত্রিয় রাজগণ একযোগ হয়ে যে যার অস্ত্র নিয়ে অর্জ্জুনের দিকে ছুটে চলেছেন, যেন তাঁদের প্রজ্বলিত ক্রোধ–বহ্নি তৃণের ন্যায় অখনই অর্জ্জুনকে দগ্ধ করবে। অর্জ্জুনের কিন্তু সেদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই, তিনি শান্তমুখে ধীরভাবে যুধিষ্ঠিরের আদেশ প্রতীক্ষা করছেন। সুদীর্ঘ হস্তে বিশাল ধনু ও সুতীক্ষ্ণ বাণ, যেন অগ্রজের সামান্য অঙ্গুলি সঙ্কেতমাত্র এই অগণ্য শত্রুসমষ্টি নিপাতে প্রবৃত্ত হতে পারেন। ধন্য সেই চিত্রকর, যে তুলিকার সামান্য চালনায় এই ছবি এঁকেছেন। একদিকে অচঞ্চল বীর্য ও গাম্ভীর্য, অন্যদিকে ভ্রাতার প্রতি

অসাধারণ নির্ভর। সম্মুখে মৃত্যুস্রোত গভীর গর্জনে অগ্রসর হচ্ছে, সে দিকে লক্ষ্য নেই; শুধু জ্যেষ্ঠভ্রাতা কি অনুমতি করেন, তাই জানবার জন্যে তাঁর দিকে বদ্ধদৃষ্টি।

দ্রৌপদী যেন এই আকস্মিক বিপদে কিঞ্চিৎ ভীত হয়েছেন; কিন্তু তিনি বীরের কন্যা, বীরকে পতিত্বে বরণ করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন, ভয় তাঁর সাজে না; তাই তাঁর মুখে ভয় অপেক্ষা কৌতূকের আবেশই বেশী পরিমাণে অঙ্কিত হয়েছে। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে সেই ক্রুদ্ধ রাজন্যবর্গের দিকে চেয়ে আছেন। এই বিপ্লব বহ্নির মধ্যে তাঁকে একাকী দেখে পাঞ্চাল-কুমার ধৃষ্টদ্যুম্ন ত্রস্তপদে ভগিনীর দিকে অগ্রসর হচ্ছেন, যেন তাঁর বীর-হৃদয়ের দুর্ভেদ্য বর্মে ছোট বোনটির নবীন সুকোমল দেহখানি ঘোর বিপদের মধ্যে রক্ষা করেন।

আর একদিকে মল্লবেশে বীর বৃকোদর। প্রচণ্ড সমরোল্লাস যেন তাঁর বিরাট দেহকে অধীর করে তুলেছে। তিনি একা প্রকাণ্ড গাছ উপড়ে নিয়ে, তার আগার দিকটা ধরে শত্রুমণ্ডলীর উপর নিক্ষেপ করবার উপক্রম করচেন। ভয়ে রাজগন ইতস্ততঃ পলায়নপর। সকলের পশ্চাতে এক প্রকাণ্ড হস্তী; মাহুত তাকে ভীমের সম্মুখীন করবার জন্যে যথাসাধ্য বলে তার মাথায় ডাঙস মারছে; কিন্তু গজরাজ বোধকরি বৃকোদরের হাতের সেই তরুবরের এক আধটা গুরুগম্ভীর প্রহার আস্বাদন করে থাকবে, সুতরাং হস্তীপকের অঙ্কুশ-তাড়না তার চেয়ে অনেক শ্রেষ্ঠ ভেবেই ঊর্ধশ্বাসে ছুটছে। একপাশে একখানি রথ, এই বৃক্ষের আঘাতেই চূর্ণমান। রথী ও সারথি বিপদ বুঝে পূর্বেই চম্পট দিয়েছিলেন, কিন্তু কিয়দ্দুরে যেতে না যেতেই পরস্পরের ধাক্কায় ভূতলে গড়াগড়ি দিচ্ছেন। রথীর শিরস্ত্রাণের উপর সারথির নাগরজুতা শোভা পাচ্ছে। পলায়ন করেও সম্পূর্ণ নিরাপদ হবার সম্ভাবনা নেই দেখে দুজন ব্রাহ্মণ গলার পৈতা হাতে করে ধরে ভীমসেনকে দেখাচ্ছে; তাদের ভয়চকিত মুখ ও কম্পমান দেহ, দেখলেই মনে হয় যেন, তারা বলছে, ''মেরো না বাবা, এই দেখ আমরা ব্রাহ্মণ, আশীর্বাদ করছি, তোমার ভাল হবে।'' – শেষের দৃশ্যটা দেখে না হেসে থাকা যায় না।

আরো কতকগুলো পৌরাণিক ছবি আছে। তার সমস্ত বেশ স্পষ্ট বোঝা যায় না। যেগুলি মুছে গিয়েছে, অনেক কষ্টে তাদের অর্থবোধ হলো না। সেই হল-ঘরের পাশের নদীর দিকের কুঠুরীর দেওয়ালে আমি যে একখানি পট দেখলুম, সেখানা কিন্তু আমার সবচেয়ে ভাল লেগেছিল। হলের যে ছবিগুলির কথা উপরে বলেছি, তাতে নানারকম রঙের যোগাড় করতে হয়েছিল এবং তুলিকার দরকার হয়েছিল; কিন্তু আমি এখন যে ছবিখানার কথা বলছি, তাতে সে সবের কিছুরই দরকার হয়নি। সন্ন্যাসীর আশ্রম, এখানে কয়লার অভাব ছিল না। একখানি কয়লা দিয়ে দেওয়ালে মহাদেবের মূর্তী এঁকে রেখেছে মহাদেবের ঘাড় হেঁট করে কোলে উঠতে উদ্যত-বাহু গণেশকে দুই হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরেছেন, আর পাশে দাঁড়িয়ে পার্বতী প্রসন্নমুখে পিতাপুত্রের এই স্নেহ-সম্মিলন দেখছেন। কয়লা দিয়ে আঁকা বটে, কিন্তু তার প্রত্যেক টানে কতখানি মাধুরী, স্নেহ ও প্রেম ফুটে উঠেছে, তা হৃদয় দিয়ে অনুভব করা ছাড়া কালি-কলমে লেখা যায় না। কোন সন্ন্যাসীরই অবশ্য এ ছবি আঁকা। হলের চিত্রের সঙ্গে এ ছবির যখন কোন সম্বন্ধই নেই, তখন আর কোন্ গৃহী-ব্যক্তি এই সুদূর তীর্থে এসে ছবি আঁকতে বসবে ? কিন্তু সে যে একজন সুদক্ষ চিত্রকর ও সহৃদয় ব্যক্তি, তার আর সন্দেহ নেই। এ ছবি আঁকবার সময় হয় ত তার স্নেহভালবাসাপূর্ণ সংসারের কথা মনে পড়েছিল; সে হয় ত

প্রিয়তমার প্রেমপূর্ণ দৃষ্টি ছেড়ে এসেছে; হয় ত প্রাণাধিক পুত্রের স্নেহবন্ধন–পাশ কাটিয়ে এসেছে; তাই তার ব্যথিত হৃদয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস এই দেওয়ালে অঙ্কিত করেছে এবং সন্ন্যাসী–জীবনের দীর্ঘ সঞ্চিত স্নেহ ও প্রেমের উন্মুক্ত স্মৃতি এই ছবির প্রত্যেক টানে বিন্দু বিন্দু করে ঢেলে দিয়ে তাকে সুশোভিত করে তুলেছে। হয় ত শুধু মহাদেব আঁকতেই তার ইচ্ছে ছিল, কিন্তু তার হৃদয় অজ্ঞাতসারে তার জীবনের ছবি এঁকে ফেলেছে; নতুবা গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর সাধনভবনে এ পূর্ণ সংসারীর আলেখ্য কেন। আবার মনে হোল সন্ন্যাসী হয় ত এই মন্ত্রেরই উপাসক। মহাদেবের ন্যায় নির্লিপ্ত সংসারী হবার জন্যে তার যোগ–সাধন; কিন্তু এ নির্জন স্থান তার উপোযোগী নয়; এখানে পার্বতী–হস্ত–চিহ্ন কিছুই দেখা গেল না। যে বাড়ীতে একদিন রমণীর পদার্পণ হয়েছে, সে বাড়ীতে গৃহলক্ষীদের কোন না কোন চিহ্ন থাকেই। অবিবাহিতের গৃহ–কক্ষে যদি কোন রমণী প্রবেশ করেন, তবে তাঁর সুকোমল কর সেই গৃহের বহুকালের যত্নে রক্ষিত বিশৃঙ্খলা বিদূরিত করে; কিন্তু এই পার্বত্যগৃহে কখন যে কোন গৃহলক্ষ্মীর অধিষ্ঠান হয়েছে, তা আমার বোধ হলো না। এই কয়লার আঁকা সেই ছবির সম্মুখে দাঁড়িয়ে আমার কত অতীত কথা মনে এল; একটি ক্ষুদ্র বালিকার কোমল স্মৃতি বুকের মধ্যে একটা কথা জাগিয়ে তুললে। হায়, সে যদি আজ এই পৃথিবীতে থাকতো।

আমি এখানে দাঁড়িয়ে নিবিষ্টচিত্তে এই সকল কথা ভাবছি, হঠাৎ বৈদান্তিকের উচ্চ কণ্ঠস্বর আমার কানে প্রবেশ করল। এমন একটা জায়গায় আমি আড্ডা নিয়েছি ঠিক করে, বৈদান্তিক বাহির থেকে আমাকে ডাকাডাকি করছিলেন। তাড়াতাড়ি নীচে গিয়ে দেখি ভায়া গাছতলায় বসে রয়েছেন। আমাকে দেখে বললেন, সকালে তাড়াতাড়ি বেধেছিল, এই দারুণ শীতে দস্তুরমত ভিজোলে, তবে ছাড়লে। এখন যে যাবার কথাও নেই। অভিপ্রায়টা কি? – আমি বললাম, আমার আর অভিপ্রায় কি থাকবে ? আপনারা যে রকম গজগমনে আসছেন তা তীর্থ–ভ্রমণের উপোযোগী নয়; আমি ত আর আপনাদের ফেলে যেতে পারি নে, তাই এখানে এই বাড়ীটির ভিতর একটু অপেক্ষা করছিলাম। আসুন চলতে আরম্ভ করি। চলতে আরম্ভ করবো কি স্বামীজির দেখা নেই। একটু অপেক্ষা করে তাঁর খোঁজে বাহির হওয়া গেল। কোথাও তাঁকে খুঁজে পাওয়া গেল না। শেষে দেখি তিনি খানিকদূরে একটি পঞ্চবটীবেষ্টিত লতামণ্ডপ আবিষ্কার করে তার মধ্যে থেকে ভিজে পাতাগুলি সরিয়ে ভিজে মাটিতেই শুয়ে রাজার মত আরাম উপভোগ করছেন। তিনি বললেন, এমন সুন্দর স্থান অল্পই দেখা যায়। তাঁর এই কথার প্রতিবাদ করবার কিছু ছিল না। কিন্তু এখানে শুয়ে তাঁর আরামভোগের রকমটা আমার বড়ই হাস্যজনক বলে বোধ হয়েছিল।

কলকাচটি থেকে নন্দ–প্রয়াগ সাত মাইল। এ সাত মাইল রাস্তা বেশ ভাল, এর মধ্যে বেশী চড়াই উৎরাই নেই। অমরা চলতে আরম্ভ করে খানিক দূরে একটা আশ্রম দেখলাম। আশ্রমটি রাস্তার উপরে; কয়েকটা কুটীর; তাতে অনেকগুলি সন্ন্যাসী। কিছুদিন আগে আমার বাসার চোর চাকরটা সন্ন্যাসী সেজে খুব আড়ম্বরের সঙ্গে ''বম্ বম্'' করছিল, সে কথা পাঠকেরা জানেন; এ সন্ন্যাসীগুলোও সেই দলের। তারা সেখানে বসে কেউ কেউ জটলা করছে, কেই নিজেকে খুব উঁচু গলায় কোন বিখ্যাত সাধুর চেয়ে বড় প্রতিপন্ন করে বিলক্ষণ আত্মপ্রসাদ অনুভব করছে; কেউ বা সমস্তই বৃথা ভেবে যৎপরোনাস্তি উৎসাহের সঙ্গে গঞ্জিকাদেবীর সেবা করছে। বলা বাহুল্য আমরা সেখানে

দাঁড়ালাম না; তারা আমাদের সাধু দেখে অভ্যর্থনার ত্রুটি করলে না; দু-তিনটে গাঁজার কল্কে আমাদের দিকে এগিয়ে দিয়ে গঞ্জিকাপানে ''জবাকুসুমসঙ্কাশং'' লোহিত চক্ষু কপালে তুলে বললে ''খোরা তামাকু পি জে!'' আমরা ত ''পিজের'' মধ্যেই নেই; এক বৈদান্তিক তামাকখোর; কিন্তু গাঁজার গন্ধে তিনি দশ হাত তফাতে সরে দাঁড়ালেন; সুতরাং আমাদের কারও দ্বারা এই সন্ন্যাসীদের খাতির রইল না। সধু হয়ে আমরা এ রকম করে গাঁজার কল্‌কের অপমান করবার সাহস করলাম দেখে, বেচারীদের বিস্ময় ও বিরক্তির সীমা রইল না। চল্‌তে চল্‌তে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, তারা একবার আমাদের দিকে কটাক্ষপাত করছে, আর কি যেন বলছে; অনুমান হলো আমরা যে ''ভণ্ড সাধু'' এই কথা নিয়ে তাদের মধ্যে একটা আলোচনা চলছে।

বেলা এগারটা সময় আমরা নন্দ-প্রয়াগে পৌঁছিলাম। এখানে নন্দর সঙ্গে অলকানন্দার সঙ্গম হয়েছে। কারো কারো মযে অলকানন্দার সঙ্গে গঙ্গার সঙ্গম হয়েই এখান হতে অলকানন্দা নাম হয়েছে। এ সব নন্দা যে সশরীরে এই পৃথিবীতে বিদ্যমান আছে, আমাদের সে জ্ঞান ছিল না। ছেলেবেলায় ভূগোল পড়বার সময় এ সকল নামের সঙ্গে পরিচয় না হওয়ায় এগুলিকে স্বর্গরাজ্যের সামিল ধরে রেখেছিলাম, এখন দেখছি সেগুলি স্বর্গের নয়, এই মর্ত্তেরই জলধারা। বাস্তবিকই আমাদের দেশ যদি পৃথিবী হয়, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের অনুর্বর ক্ষেত্র যদি পৃথিবী হয়, মাড়োয়ারের দগ্ধ মৃত্তিকা যদি পৃথিবী হয়, তা হলে যাঁরা এ স্থানকে স্বর্গ বলে উল্লেখ করে গেছেন, তাঁরা অন্যায় করেন নি। মানুষের কর্মফল যদি মৃত্যুর পর স্বর্গে যাত্রার কারণ হয়, তা হলে আমার পক্ষে তার বড় একটা সম্ভাবনা দেখছি নে। তবে আমার সান্ত্বনা এই , আমি মনে করি আমার এ জীবনেই স্বর্গবাস হয়ে গিয়েছে। এ সব দেশে যা আছে, স্বর্গে তার চেয়ে আর বেশী কি থাকবে ? কিন্তু আমি ঢেঁকী, স্বর্গেও ধান ভেনেছিলুম, আর সে জন্যেই বুঝি, স্বর্গভ্রষ্ট হয়ে এখানে এসেও আবার ধান ভানতে আরম্ভ করেছি। জীবনটা ধান ভানতেই গেল। তবে যে মধ্যে মধ্যে 'শিবের গীত' গাই, সে কেবল দশজনের অনুরোধে, কিন্তু দুঃখ তাও ভাল করে গাওয়া হয় না।

নন্দায় তখনো জল ছিল, কিন্তু বেশী নয়, তবে তাতে নদীর মধ্যেকার পাথরগুলি ডুবিয়ে রাখতে পারে। আমরা যেখানে পার হয়ে নন্দপ্রয়াগ বাজারে পৌঁছিলাম, সেখানে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড আছে, তারই পাশ দিয়ে জলের ধারা কল কল শব্দে অতি বেগে ব'য়ে চলেছে। যেখানে বড় পাথর নেই, সেখানে জলধারা বেশ দেখা যাচ্ছে। যেখানে জলধারা পাথরের আড়ালে প'ড়ে দেখা যাচ্ছে না, সেখান হতেই অবিশ্রান্ত কল কল শব্দ উত্থিত হচ্ছে। আমরা এখান থেকে আর একটা পাথরে অতি সাবধানে পা ফেলে, জলে পা ঠেকিয়েই, নন্দা পার হয়ে বাজারে উপস্থিত হলাম। বর্ষাকালে কিন্তু এ রকম করে নন্দা পার হওয়া যায় না। অল্প দূরে যে একটা সাঁকো আছে, তখন তারই উপর দিয়ে নদী পার হয়ে বাজারে ও সঙ্গমস্থলে আসতে হয়।

বাজারে একটা দোতলা ঘরে বাসা করা গেল। নীচে দোকান, উপরে আমাদের বাসা। আগাগোড়া কাঠের ঘর, কেবল মাথার উপরে শ্লেট পাথর দিয়ে ছাওয়া। আমরা সেই বারান্দা দখল করে বসলাম। আমরা কিছু খাওয়া দাওয়া করলাম না। বৈকালে বাজার দেখতে বাহির হওয়া গেল। অনেকগুলি দোকান, আর তাতে অনেকগুলি জিনিসপত্র বিক্রি

হচ্ছে। বলতে গেলে শ্রীনগরের পর আর এমন বাজার এ পথের মধ্যে দেখিনি। বাজারে প্রায় সকল জিনিসই পাওয়া যায়। আমরা রাত্রের জন্য খাওয়া দাওয়ার একটু বিশেষ বন্দোবস্ত করলাম।

খানিক পরে আবার বাহির হয়ে পড়া গেল। স্বামীজি ও বৈদান্তিক বাসায় থাকলেন। বাজারের মধ্য দিয়ে যাচ্ছি, দেখি দু'জন বাঙালী পুরুষ এবং তিন চার জন স্ত্রীলোক একটা দোকানে বসে আছেন। তাঁদের দেখেই আমার মনে এমন একটা আনন্দ উথলে উঠলো, তা যাঁরা দূরপ্রবাসে দীর্ঘকাল পরে একজন আত্মীয়কে দেখেছেন, তাঁরাই শুধু বুঝতে পারবেন। আমি তাঁদের কাছে যেতেই তাঁরা পরম আগ্রহে আমাকে বসতে বললেন। তাঁদের মুখে শুনলাম, তাঁরা আগের বৎসরে নারায়ণ দর্শন করবার জন্যে এসেছিলেন; রাস্তায় অনেকে নিষেধ করেছিল, কিন্তু তাঁরা কারও কথা না শুনে এতখানি রাস্তা এসেছিলেন। শুনলাম তাঁরা কাটগুদামের পথে এসেছিলেন। এখানে এসে আর অগ্রসর হতে পারেন নি, কারণ শীতও অসম্ভব, আর তাদের বিশ্বাস জন্মেছিল যে, সেবার নারায়ণের দ্বার খোলা হয়নি। দুর্ভিক্ষের জন্য যাত্রী আসা বন্ধ করে দেওয়াতেই বোধ হয় তাঁদের এ রকম ধারণা হয়েছিল। তাঁরা নারায়ণ দর্শন করতে এসেছেন, এত অর্থব্যয়, কষ্ট সহ্য করে এতটা পথ এসে পড়েছেন, সম্মুখে আর আট নয়দিনের রাস্তা বাকী; এ রকম অবস্থায় যদি তাঁরা ফিরে যান, তা হলে হয় ত জীবনে আর নারায়ণ দর্শন নাও ঘটতে পারে। এই সমস্ত কথা ভেবে এই এক বৎসর এখানে অপেক্ষা করেছিলেন, এবং সংবাদ লিখে বাড়ী হতে ডাকে খরচপত্র আনিয়ে এই দোকানঘরে বাস করছিলেন; অভিপ্রায় একটিবার মাত্র নারায়ণ দর্শন করবেন। কি ভক্তি ! স্বীকার করি, তাঁদের ভক্তি স্বার্থপরতামিশ্রিত, হয় ত পরকালে অক্ষয় স্বর্গলাভের প্রলোভনেই তাঁর এই কষ্টকর অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন; কিন্তু বাঞ্ছিতের প্রতি এমন অসাধারণ একনিষ্ঠা, এ শুধু প্রশংসনীয় নয়, অনুকরণীয়।

এবার যখন পাণ্ডারা সর্বপ্রথম নারায়ণের দ্বার খুলতে যান, তখন এই কয়জন লোকও তাঁদের সঙ্গে গিয়েছিলেন। নারায়ণ দর্শন করে কাল তাঁরা এখানে ফিরে এসেছেন, আজ এখানে বিশ্রাম করে আগামীকাল দেশে ফিরে যাবেন। তাঁরা বললেন যে, তাঁদের যাবার সময় সমস্ত বদ্রীকাশ্রম বরফে ঢেকে ছিল, এমন কি নারায়ণের প্রকাণ্ড মন্দিরের চূড়া অতি অল্পই দেখা যাচ্ছিল এই জন্যে দিনকতক তাঁদের খানিকটা দূরে অপেক্ষা করতে হয়েছিল। বরফ গলতে আরম্ভ হলো; দু চারদিন পরে তাঁরা অগ্রসর হয়েছিলেন। কিন্তু তবুও পাণ্ডাদের ও তাঁদের মন্দির পর্যন্ত যেতে জায়গায় জায়গায় বরফ কেটে রাস্তা করতে হয়েছিল।

তাঁরা আগামীকাল বাঙলাদেশে যাবেন শুনে, আপনা হ'তেই প্রাণের মধ্যে কেমন করে উঠলো। – সেই বাঙলাদেশে – যেখানে আমার ঘরবাড়ী আছে, এবং আজন্মের বন্ধু-বান্ধবেরা যেখানে বিচরণ করছেন। তখন মনে পড়লো – কত কি ছেড়ে এসেছি! মায়ার বন্ধন কি কঠিন।

এই স্বদেশীয়দের সঙ্গে অনেকক্ষণ ধরে কথাবার্তা কহার পর সেখান থেকে উঠলাম। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। আমাদের বাসার সম্মুখে রাস্তার পরপারেই এক প্রকাণ্ড মহাদেবের

মন্দির। সন্ধ্যার সময় সেখানে কাঁসর ঘণ্টা বেজে উঠলো; অনবরত দামামা বাজতে লাগলো, মধ্যে মধ্যে সুন্দর বাঁশী বাজতে লাগলো এবং মন্দির মধ্যে ও প্রাঙ্গনে বাজারের সব লোক একত্রিত হলো। স্ত্রী– পুরুষ দেবতা সম্মুখে নিঃসঙ্কোচে গায় গায় এসে দাঁড়ালো। আমি অপরিচিত পথিক, এক পাশে দাঁড়িয়ে এই পবিত্র দৃশ্য দেখতে লাগলাম। কি তাদের সুন্দর মুখশ্রী , কি তাদের প্রবল নিষ্ঠা; এক সুগভীর ধর্মভাব যেন তাদের সরল হৃদয়কে পরিপূর্ণ করে ফেলেছে। যখন সন্ধ্যার আরতি শেষ হলো, শঙ্খ ঘণ্টার রব ধীরে ধীরে, সেই নৈশ আকাশে বিলীন হয়ে গেল এবং '' ব্যোম কেদার'' বলে সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করল, তখন এক অতি অনির্বচনীয়ভাবে হৃদয় পূর্ণ করে আমি ধীরে ধীরে বাসায় ফিরে এলাম। আসতে আসতে একটা কবিতা আমার মনে পড়ে গেল, --

''যোগী নই পাই নাই পরমার্থ জ্ঞান ,
বেদান্তের প্রতিপাদ্য চিনি না চিন্ময়ে,
আস্তিকের নাস্তিকের শুনিনি বিধান,
জানি না কি লেখে তন্ত্র পুরাণ নিচয়ে।
জানি এই যোগী যারে ধেয়ায় হৃদয়ে,
সরলা বালিকা পূজে পুষ্প অর্ঘ দিয়া,
সেই বিশ্বপতি দেবে সায়াহ্নে সময়ে,
সুখী হই, ভক্তিভাবে হৃদে আরাধিয়া ॥''

সন্ধ্যার পর বাজারের মধ্যে আর একটু ঘুরে দেখা গেল। বাজারের অধিকাংশ দোকানের সঙ্গেই যাত্রীদের বাসের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঘর আছে; কেহ বা দোকানঘরের মধ্যে ও দ্বিতলে যাত্রীবাসের জন্য ঘর রেখেছে; দেখলাম সমস্ত বাজারে তিন চারশতের বেশী যাত্রী থাকতে পারে না।

সন্ধ্যা পর্যন্ত আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল; সন্ধ্যার পর একটু একটু করে চারিদিকে মেঘ জমা হতে লাগলো। যারা গ্রহণ দেখবার আশায় বসেছিল, তাদের অদৃষ্টে আর গ্রহণ দেখা হ'লো না। খানিক পরে খুব মেঘ করে বৃষ্টি এল। অনেকদিন পরে একটু ভাল রকম আহার হ'লো, বৈদান্তিক ভায়া এই কয়দিনের অর্দ্ধাশন পরিপূর্ণ মাত্রায় পুষিয়ে নিলেন। আহারাদির পর সেই ঝুপঝাপ বৃষ্টির মধ্যে যখন কম্বলখানা গায়ে জড়িয়ে শয়ন করা গেল, তখন বোধ হলো এমন আরাম বহুদিন উপভোগ করা হয়নি।

যোশীমঠের পথে

২৪ মে রবিবার। – অন্যান্য দিনের চেয়ে আজ আমাদের উঠতে একটু বেশী দেরী হয়েছে। তখন সূর্য উঠেছে, কিন্তু তখনও চারিদিকে মেঘ বেশ ঘন হয়েছিল; আর সেই মেঘের মধ্য দিয়ে অল্প অল্প সূর্য–কিরণ জলসিক্ত পার্বত্য–প্রকৃতির উপর এক একবার প্রতিফলিত হচ্ছিল; সে এমন সুন্দর যে, সহজেই একটু কিছুর সঙ্গে উপমা দেবার ইচ্ছা হয়, কিন্তু যার সঙ্গে উপমা দেওয়া যেতে পারে এমন কিছু খুঁজে পাওয়া গেল না।

আমার মনে হলো কোন সুন্দরীর বড় বড় জলভরা চোখের উপর মুখে যদি একটুখানি হাসি ফুটে উঠে, ত সে অনেকটা এইরকম দেখায়। প্রভাত-সূর্যের এই সতেজ, প্রদীপ্ত রশ্মির চেয়ে এই মেঘাবৃত প্রভাত কেমন মধুর ও সরস। বাজারের উপর সেই গোল বারাণ্ডায় বসে গিরিপ্রাচীরবেষ্টিত এই সুন্দর ক্ষুদ্র নগরটির প্রভাতিক শোভা দেখে, আমার চক্ষু জুড়িয়ে গেল; কিন্তু বেশীক্ষণ এ শোভা উপভোগ করবার অবসর পেলাম না; স্বামীজি ও বৈদান্তিক সুসজ্জিত হয়ে আমার পাশে এসে দর্শন দিলেন; সুতরাং বাঙ্‌নিষ্পত্তি না করে নেমে পড়া গেল, দোকানদারের প্রাপ্য চুকিয়ে দিতে আর বেশী বিলম্ব হ'ল না।

রাস্তায় বেরিয়ে দেখি চারিদিক থেকে কল কল করে ঝর্ণা ছুটছে, সুতরাং অনুমান করা কঠিন হলো না যে রাত্রিতে অসম্ভম রকম বৃষ্টি হয়ে গিয়েছে এবং সেই সঙ্গে বুঝলাম গত রাত্রে আমরা কুম্ভকর্ণের এক্‌টিনী করেছিলাম। একটু অগ্রসর হয়েই দেখি সেই বাঙালী যাত্রীদের দল নন্দপ্রয়াগের বাজারে তাঁদের এক বৎসরের ঘর-দুয়োর ছেড়ে রওয়ানা হবার জন্য প্রস্তুত হয়েছেন। তাঁদের বিদায় নেবার জন্যে বাজারের অনেক লোক সেখানে জমা হয়েছেন। দশদিন যেখানে বাস করা যায় সেখানকার লোকজন, এমন কি গাছপালার উপরেও একটা স্নেহ জন্মায়; আর এই পাঁচটি বাঙালী স্ত্রী-পুরুষ এক বৎসরকাল এই পর্বতে ক্ষুদ্র একটা বাজারের মধ্যে বাস করে সকলেরই পরিচিত এবং অনেকের আত্মীয় হয়ে উঠবেন, এ আর আশ্চর্য কি ? আমি সেই দোকানের সম্মুখ থেকে সহজে চলে যেতে পারলাম না, আমার মনে নানা ভাবের উদয় হ'লো। স্ত্রীলোক তিনটির মধ্যে কেউ কোন পাহাড়ীর ধুলোমাটিমাখা মেয়েকে কোলে নিয়ে মুখচুম্বন করছেন; মেয়েটা এতখানি আদরের কোন কারণই খুঁজে না পেয়ে অবাক হ'য়ে রয়েছে, কারণ সে বুঝতে পাচ্ছে না, এক বৎসর কাল ধরে তাঁদের কাছে আদর পেয়েছে, আজ এই তাদের শেষ আদর; আর তাঁরা এ জীবনে তাদের দেখতে আসবে না। একজন বাঙালী রমণী একটি যুবতীর গলা ধরে চক্ষের জল ফেলছেন; তাঁর এই এক বৎসরের সঞ্চিত স্নেহ মমতা যেন চোখের জলে উথলে উঠছে। যুবতীও তার দেশগত কাঠিন্য ভুলে স্নেহশীলা বালিকার মত রোদন করছে। কোথায় সেই সুদূর পূর্বের শস্যশ্যামল সমতল বঙ্গের অন্তঃপুরচারিকা, আর কোথায় এই হিমালয়ের ক্রোড়স্থ পাষাণ-প্রাচীরবেষ্টিত একটি ক্ষুদ্র নগরের হিন্দুস্থানী যুবতী। পরস্পরের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, কিন্তু ভালবাসা এমন দু'টি বিসদৃশ প্রাণীকে এই এক বৎসরের মধ্যেই কি দৃঢ়রূপে একসঙ্গে বেঁধে ফেলেছে। তাই আজ তারা দেশকাল ভুলে পরস্পরের জন্যে অশ্রু বিসর্জন করছে, আমি এই দৃশ্যে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গেলাম; এই দৃশ্য আমার কতকাল মনে থাকবে। আমরা তিনজন একটু তফাতে দাঁড়িয়ে দেখছি ছেলের দল আমাদের সম্মুখে সার দিয়ে দাঁড়িয়েছে; বাঙালীর জন্যে, আমাদেরই যারা ভাই বোনের মত তাদের জন্যে এই পাহাড়ীদের এত স্নেহ, এত আগ্রহ; কে জানে পাহাড়ের অনুর্বর কঠিন প্রদেশে আমাদের জন্যও হয় ত করুণার কোমল উৎস শতমুখে প্রবাহিত হতে পারে।

পাহাড়ীদের কাছে বিদায় নেওয়া শেষ হলে, তাঁরা আমাদের কাছে বিদায় নিতে এলেন। তাঁরা ছেড়ে যাবেন, আমার প্রাণের মধ্যে কেমন করে উঠলো। জানিনে বিদেশে দেশের লোকের সঙ্গে দেখা হ'লে তাদের প্রতি এমন টান হয় কেন ? বোধ হয় দেশের একটা লুপ্তস্মৃতি মনের মধ্যে হঠাৎ জেগে প্রীতিপ্রবাহে হৃদয় ভাসিয়ে দেয়; তাই তখন আমরা

আত্মপর ভুলে যাই; শুধু মনে হয় এরা যে দেশের আমিও সেই দেশের; এরা আমার স্বদেশবাসী, আমার আত্মীয়। তাই সঙ্গে সঙ্গে আমার সেই প্রিয়তম জন্মভূমির কথা মনে হ'লো। কোথায় আমরা কোন অজানিত, বিষাদপূর্ণ বরফের রাজ্যে যাচ্ছি, আর এরা চিরবাঞ্ছিত জন্মভূমিতে আত্মীয়-বন্ধুগণের মধ্যে ফিরে যাচ্ছেন। এ যাত্রা শেষ করে' যে এ জীবনে ফিরে আসবো, সে কথা কে বলবে ? মনে পড়লো, সেই বহুদিন আগে যখন কল্‌কাতায় থেকে পড়াশুনা করতাম, সেই সময় মধ্যে মধ্যে বন্ধুবান্ধবদের গাড়ীতে তুলে দিতে শিয়ালদহ স্টেশনে যেতাম। তাঁরা যখন গাড়ী চড়ে বসতেন, গাড়ী ছাড়ে ছাড়ে, সে সময়ে দেশে যাবার জন্যে প্রাণে কেমন একটা ব্যাকুলতা উপস্থিত হ'ত। সে-দিন সমস্ত দিন আর কোন কাজেই মন লাগতো না, শুধু বাড়ীর স্নেহকোমল স্মৃতি নিরাশপূর্ণ চপল-চিত্তকে অধীর করে তুলতো। আজ অনেক বৎসর পরে, বহুদূরে এই পর্বতের মধ্যে কয়জন বাঙালী স্ত্রীপুরুষকে দেশে যেতে দেখে মনে সেই ভাব জেগে উঠলো। এখন ঘরে, মা নেই, বাপ নেই, স্ত্রী নেই, পুত্র নেই; গৃহ অরণ্যের ন্যায় বিজন; তবু সেই প্রাচীন স্মৃতির সমাধিমন্দিরে ফিরে যেতে মন অস্থির হ'য়ে উঠলো। অনাহারে ফল মূল মাত্র আহার করে কত দীর্ঘ দিন কাটিয়ে দিয়েছি। সঙ্গে কম্বল ভিন্ন সম্বল নেই, তার উপর কত বিনিদ্র রাত্রি অতিবাহিত হয়েছে। পরিশ্রমেও কাতর নই; কিন্তু হায়, কোথায় সন্ন্যাসীর সংযম, কোথায় মনের দৃঢ়তা! মনুষ্যহৃদয় যৎপরোনাস্তি দুর্বল ও অত্যন্ত অসার।

কাতর হৃদয়ে অশ্রুপূর্ণচক্ষে এক রাত্রির পরিচিত বাঙালী যাত্রীদের বহুদিনের পরিচিত আত্মীয়দের ন্যায় বিদায় দিলাম এবং যতক্ষণ তাঁদের দেখা যায়, ততক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইলাম। সঙ্গীদ্বয়ের মনে যে কোন রকম ভাবান্তর উপস্থিত হয়েছিল, তা বোধ হ'ল না। কারণ তাঁরা আজ খুব তেজে চলতে লাগলেন। আমার মনই আজ উৎসাহশূন্য; আমি সকলের পিছনে পড়ে রইলাম।

ছ'মাইল এসে একটা টানা-সাঁকো পার হয়ে লালসাঙ্গায় পৌঁছান গেল। যারা রুদ্রপ্রয়াগ হ'তে কেদারনাথ দর্শন করতে যায়, তারা এখানে এসে বদ্রীনারায়ণের পথে মেশে। রুদ্রপ্রয়াগ হতে আমরা অলকানন্দার ধারে এসেছি; কেদারযাত্রীগণ রুদ্রপ্রয়াগে অলকানন্দা পার হ'য়ে মন্দাকিনীর ধারে ধারে কেদারের দিকে যায়। কেদার দর্শন করে আবার চারদিনের রাস্তা নেমে এসে ডাইনের রাস্তা ধরে এই লালসাঙ্গায় বদ্রীকাশ্রমের রাস্তায় পড়ে।

লালসাঙ্গায় দোকানের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। গঙ্গা অনেক নীচে, সেখানে নামা উঠা করা বড় কঠিন ব্যাপার, এবং সকলে এই কষ্টসাধ্য কাজে প্রবৃত্ত হয় না, কারণ পাহাড়ের গায়ে যে তিনটে উৎকৃষ্ট জলের ঝর্ণা আছে , তাতেই সকলের কাজ চ'লে যায়।

লালসাঙ্গায় এসে আমরা একটা ছোট দোকানঘরে বাসা নিলাম। জায়গাটা তেমন নির্জন নয়। কেদারনাথ এবং বদ্রীকাশ্রম উভয় পথের যাত্রীই এখানে সমবেত হয়, সুতরাং প্রায় সর্বদাই এ স্থানটা সরগরম থাকে। এখানেও একটা থানা ও একটা দাতব্য চিকিৎসালয় আছে। এই দুইটি বেশ বড় রকমের। প্রথমে থানা দেখে পরে চিকিৎসালয়টি দেখতে যাব, এ রকমের ইচ্ছা ছিল; কিন্তু এখানে পৌঁছিয়ে যে এক ব্যাপারের গল্প শুনা গেল, তাতে আর কোথাও যেতে প্রবৃত্তি হলো না। ব্যাপারটা আবার আমাদেরই নিয়ে;

আমাদের অর্থাৎ সন্ন্যাসীদের। পাঠক হয় ত গল্পটি শুনবার জন্যে একটু উদগ্রীব হয়েছেন, সুতরাং সাধু-সন্ন্যাসীদের পক্ষে গৌরবজনক না হলেও আমাকে এখানে ব্যাপারটি খুলে বলতে হচ্ছে। ব্যাপারটা আর কিছু নয়, এক স্বামীজি - অবশ্য অনেক তীর্থভ্রমণ করে প্রচুর ডাল রুটির সর্বনাশ করেছেন - সেইদিন সকালে চোর বলে ধৃত হয়েছেন। চুরির জিনিসও বড় বেশী নয়। এক দোকানদারের এক জোড়া ছেঁড়া নাগরা-জুতা। স্বামীজির স্কন্ধবিলম্বিত ঝোলার মধে শ্রীমদ্ভগবদগীতার পাশে শততালিবিশিষ্ট ধূলিধূসরিত সেই অনিন্দ্য-সুন্দর নাগরা জুতা শোভা পাচ্ছিল। বেচারা রাত্রিতে এক দোকানে ছিল; অনেক রাত্রি পর্যন্ত গীতাদি পাঠ হয়েছে , দোকানদার সাধু-সৎকারের ত্রুটি করে নি। কিন্তু সাধুর নিতান্তই গ্রহের ফের; সকালে চলে যাবার সময় সে দোকানদারের নাগরা জোড়াটা ভুলে ঝোলার মধ্যে তুলে নিয়ে ''যঃ পলায়তি স জীবতি'' ক'রছিল। এ দিকে দোকানদারেরও সকালে উঠে কোথায় যাবার আবশ্যক হয়। সে দেখে জুতা নেই। ঐ সন্ন্যাসী ছাড়া তার দোকানে আর কেউ ছিল না, কিন্তু এই ঘোর কলিকালে জুতা যে সন্ন্যাসী অনুগ্রহে একরাত্রে হঠাৎ জ্যান্ত গরু হয়ে মাঠে চরতে যাবে, নিতান্ত ছাতুখোর হ'লেও দোকানদারের মনে এমন সম্ভাবনা কিছুতেই স্থান পায় নি। সুতরাং সেই সন্ন্যাসীকে ধরে লালাসাঙ্গার থানায় উপস্থিত করলে। শুনলাম, অনেক লোক সেখানে একত্র হয়ে স্বামীজির যৎপরোনাস্তি লাঞ্ছনা করছে এবং সন্ন্যাসীজাতির উপরও অনেক ভদ্রতাবিরুদ্ধ অপরাধ আরোপিত হচ্ছে। অতএব সে অবস্থায় সেখানে যাওয়া হয় নি; সুতরাং চোর সন্ন্যাসী ''পূরবীয়া'' অর্থাৎ পূর্বদেশবাসীকে - কাশী, অযোধ্যা, বিহার, বাঙ্গলা এই সকল দেশের অধিবাসীকে এ দেশের লোক পূরবীয়া বলে, সুতরাং এই চোর সন্ন্যাসীর বাড়ী এই সকল দেশের কোথাও হ'লে সে আমার এক দেশবাসী কারণ আমরা দু'জনেই পূরবীয়া; অকারণ কে এমন 'চোরের জাতভাই' হবার অপবাদ ঘাড়ে করতে যায় ? বিশেষ আমরা যখন দোকান বসে চোরের গল্প শুনছিলাম সেই সময় দু'তিনজন লোক - দেখে বোধ হলো পাঞ্জাবী, আমাদের দোকানের সুমুখ দিয়ে চোরের কথা বলতে বলতে যাচ্ছিল। আমাদের দেখেই হোক, কি কথাপ্রসঙ্গেই হোক, একজন বললে, ''তামাম পূরবীয়া আদমী চোট্টা হ্যায়।'' কথাটা অম্লান বদনে হজম করা গেল। একে বিদেশ, তাতে রাস্তার লোকের কথা, এ কথার আর কে প্রতিবাদ করবে ? কিন্তু দেখলাম, হুজুগে এরাও আমাদের থেকে কিছু কম নয়। দুপুরবেলা যতক্ষণ ছিলাম, সকলের মুখেই সেই চোর সন্ন্যাসীর কথা। বোধ হ'লো এরা এই পাহাড়ের মধ্যে এক ভাবেই জীবন কাটিয়ে কিছু নূতনত্বের অভাবে দারুণ বিমর্ষ হয়ে পড়েছিল। আজ এই এক 'নতুন হুজুগ' জোটায় এই ভয়ানক শীতে এরা দিনকতক একটু বেশ সজীবতা অনুভব করবে।

বেলা থাকতে থাকতেই সেখান হ'তে বের হয়ে তিন মাইল দূরে 'বওলা' চটিতে উপস্থিত হওয়া গেল। তখন সন্ধ্যা গাঢ় হয়ে আসছিল; আকাশ পরিষ্কার; দূরে দূরে দু'পাঁচটা বড় বড় নক্ষত্র; পশ্চিম আকাশে অস্তমিত তপনের লোহিতরাগ অতি সামান্য প্রকাশ পাচ্ছিল এবং আমাদের আগে পাছে চারিদিকে ধূসর পর্বতশ্রেণী বিরাট পাষাণ প্রাচীরের মত দাঁড়িয়েছিল। সেই গগনস্পর্শী স্তূপাকার অন্ধকাররাশির দিকে তাকিয়ে ভয় ভক্তিতে হৃদয় পূর্ণ হয়ে যায়। জগতের কোন গভীর রহস্যে পাষাণবক্ষ পূর্ণ ক'রে কত যুগ-যুগান্তর হ'তে এরা এমনিভাবে এখানে দাঁড়িয়ে আছে, কে বলতে পারে ? আমার

মত সংসারতাপক্লিষ্ট পথিক কতদিন হয়ত এমনি সময়ে এখানে দাঁড়িয়ে এই গভীর দৃশ্য দেখে এই কথাই চিন্তা করেছে।

চটিতে বিশ্রাম করবার জন্যে অল্প জায়গা পাওয়া গেল, কিন্তু রাত্রে আর কিছু আহার জুটলো না। শয়ন করা গেল বটে, কিন্তু রাত্রি বৃদ্ধির সঙ্গে শীতে হৃৎকম্প বৃদ্ধি হতে লাগলো। কি ভয়ানক শীত! আমরা একদিনও এমন শীতের হাতে পড়িনি। কম্বলের সাধ্য কি এ শীতকে দমন করে! স্বামীজি ও বৈদান্তিক একটু গরম হবার অভিপ্রায়ে আগাগোড়া কম্বল মুড়ি দিলেন। আমার আবার সে অভ্যাস নেই, নিতান্ত পক্ষে যদি নাক বের না করে রাখি ত দম আটকে মারা যাবার উপক্রম ঘটে। কিন্তু নাক খুলে রাখতে বোধ হ'তে লাগলো, রাজ্যের জমাট শীত আর কোনখান থেকে সুবিধা না পেয়ে সেই পথেই বুকের মধ্যে প্রবেশ করছে। চটিওয়ালা আবার এর উপর জানিয়ে দিলে যে, আজ শীতের আরম্ভ মাত্র। এই যদি আরম্ভ হয়, তবে শেষ না জানি কি রকম, আমার কল্পনাশক্তি সে কথা ভাবতে দেহখানির মতই আড়ষ্ট হয়ে পড়লো। অত্যন্ত কষ্টে রাত্রি কেটে গেল। এই প্রবল শীতে আমার ভাল রকম ঘুম হয়নি, কিন্তু বৈদান্তিক ভায়ার নাসিকাগর্জনে সমস্ত রাত্রি অপ্রতিহত ভাবে চলেছিল।
২৫ মে, সোমবার – খুব সকালে উঠে রওনা হওয়া গেল। কনকনে শীত, দুইপাশে উঁচু অসমান পাহাড়, পহাড়ের গা দিয়ে আঁকাবাঁকা অপ্রশস্ত রাস্তা। সেই রাস্তা ধরে আমরা চলতে লাগলাম। এদিকে ক্রমেই গাছপালা সমস্ত কমে আসছে; আমরা আজ যে রাস্তায় চলছি, তাতে গাছপালা নেই বললেই হয়; খালি নীরস কঠিন ধূসর পর্বতশ্রেণী অভ্রভেদী হয়ে পথরোধ করে দাঁড়িয়েছে। দুই একটা জায়গায়, বরফ জমাট বেঁধে রয়েছে। অন্যান্য দিন কদাচ বরফ দেখতে পাওয়া যেত, কিন্তু আজ অনেক জায়গাতেই শ্বেত বরফের স্তূপ দেখা যাচ্ছে। সেই নিষ্কলঙ্ক শুভ্র বরফ–স্তূপের দিকে চাইলে মনে হয়, এমন পবিত্র দৃশ্য বুঝি জগতে আর কিছু নেই।

বেলা প্রায় নয়টার সময় আমরা যে পথ দিয়ে যাচ্ছিলাম, সেটা ছেড়ে একটা পরিষ্কার পথে এসে পড়লাম। এতক্ষণ দেখতে পাইনি, কারণ সম্মুখের পাহাড়ে আমাদের দৃষ্টিরোধ হয়েছিল, কিন্তু এখানে উপস্থিত হওয়া মাত্র কি অপূর্ব সুন্দর মহান ও গম্ভীর দৃশ্য আমাদের সম্মুখে উন্মুক্ত হলো। বিস্ময়–বিস্ফারিত নেত্রে দেখলাম, আমরা এক সুবিশাল বরফের পাহাড়ের সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছি; তার চারিটি সুদীর্ঘ শৃঙ্গ আগাগোড়া আচ্ছন্ন। তখন সূর্য আকাশের অনেক উচ্চে উঠেছে; তার উজ্জ্বল কিরণ এসে সেই সমুন্নত সুন্দর পর্বতশৃঙ্গগুলির উপর পড়েছে; প্রাতঃসূর্যকিরণ সেই তুষার ধবল আর্দ্র পর্বতশৃঙ্গ হিল্লোলিত হওয়াতে বিভিন্ন বর্ণের সমাবেশ প্রতিক্ষণে কি যে অপূর্ব সৌন্দর্য প্রতিফলিত হচ্ছিল, বর্ণনা করে তা বুঝিয়ে দেওয়া যায় না; পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম চিত্রকরের তুলিকাতে সেই অপূর্ব দৃশ্যের অতি সামান্য প্রতিকৃতিও অঙ্কিত হতে পারে না। মানুষের দুখানি হাত আশ্চর্য কাজ করতে পারে, প্রকৃতিকে লজ্জা দেবার চেষ্টাতেই বুঝি মানুষের ক্ষুদ্র দু'খানি হাতে আগ্রার জগদ্বিখ্যাত সৌধ নির্মিত হয়ে পথিকের নয়ন মন মুঘধ করেছে। তাজমহল আমি অনেকবার দেখেছি;– সে সৌন্দর্য, সে ভাস্কর–নৈপুণ্য নিষ্কলঙ্ক শুভ্র মার্বেল প্রস্তরের সেই বিচিত্র হর্ম্ম্য প্রকৃতির স্বহস্তের কোন রচনা অপেক্ষা হীনবল বলে বোধ হয় না; কিন্তু আজ আমার সম্মুখে সহসা যে দৃশ্য উন্মুক্ত হয়েছে, এ অলৌকিক। মানুষের ক্ষমতা ও ক্ষমতার গর্ব্ব এই বিরাট বিশাল নগ্ন সৌন্দর্যের পাদদেশে এসে

স্তম্ভিত হয়ে যায়; প্রতি মুহূর্তে নূতন বর্ণে সুরঞ্জিত অভ্রভেদী শৃঙ্গের দিকে তাকালে আমাদের ক্ষুদ্রতা ও দুর্ব্বলতা মর্মে মর্মে অনুভব করতে পারি; সৃষ্টি দেখে আমরা স্রষ্টার মহান্ ভাব কতক পরিমাণে হৃদয়ে ধারণা করবার অবসর পাই।

খানিক দূর আর অন্য দৃশ্য নেই। বামে দক্ষিণে সম্মুখে পশ্চাতে সকল দিকেই শুভ্রকায় তুষারাচ্ছন্ন পর্বতশ্রেণী। এ সকল দৃশ্য দেখবার আগে জায়গায় জায়গায় বরফের স্তূপ দেখেই মনে কি আনন্দ হচ্ছিল, কিন্তু এখন এই বরফের রাজ্যের মধ্যে এসে পড়াতে সেই গভীর আনন্দ অব্যক্ত বিস্ময়ে পরিণত হয়েছে। এক একবার আমার মনে হতে লাগলো, সেই শস্যশ্যামল, সমতল, ধনধান্যপূর্ণ প্রদেশ, আর এই চিরহিমানীবেষ্টিত, বৃক্ষলতাশূন্য নির্জন উপত্যকা, এ কি একই পৃথিবীর অন্তর্গত ?
প্রায় পাঁচমাইল যাবার পর আবার যেন একটু লোকালয়ের আভাস পাওয়া গেল ? আমরা আর একটা পর্বতের উপর এসে পড়লাম। এটায় তত বরফ দেখা গেল না, স্থানে স্থানে বরফ আছে মাত্র; এ ছাড়া এদিকে ওদিকে দু'পাঁচটা গাছপালাও দেখা গেল। এ পাহাড়টা সেই বরফের পাহাড়ের একটি ক্ষুদ্র-মস্তক দরিদ্র প্রতিবেশী। আরও খানিক দূর যাবার পর শুনলাম, নিকটেই একটা বাজার আছে, বাজারের নাম ''পিপল কুঠি ''। এই পাহাড়ের মাথায় খানিকটে জায়গা সমভূমি, সেখানেই বাজার অবস্থিত। আমরা রাস্তা ছেড়ে খানিক উপরে উঠে তবে বাজারে পৌঁছলাম। বাজার নিতান্ত মন্দ নয়; আট দশখানা দোকান আছে, খাদ্যদ্রব্যও মোটামুটি সকল রকমই পাওয়া যায়। বাজারে অবস্থিতি-স্থানই কিন্তু আমার সবচেয়ে মনোহর বোধ হল। চারিদিক অত্যন্ত নীচু, কেবল মাঝখানে পাহাড়ের মাথার উপর বাজার। নীচের দৃশ্য বড়ই সুন্দর। আমরা একটা দোকানে আড্ডা নিলাম। আমাদের সেই দোকান বাজারের একপ্রান্তে। দোকান হতে নেমে দাঁড়িয়ে নীচের দিকে তাকিয়ে দেখলাম; মাথা ঘুরে উঠলো।

''পিপলকুঠি''তেই সে-বেলা বাস করতে হবে শুনে, আমাদের আত্মাপুরুষ উড়ে গেল। পাঠকদের বোধ করি স্মরণ আছে, রাস্তায় একদিন 'পিপল-চটিতে' মাছির উৎপাতে বিব্রত হয়ে দুপুরের রৌদ্র মাথায় করেই আমাদের চটি ত্যাগ করতে হয়। বাঙলায় একটা প্রবাদ আছে ''ঘর পোড়া গরু সিঁদুরে মেঘ দেখলেই ভয় পায়'' - আমাদেরও সেই দশা। ''পিপলকুঠি'' নাম শুনেই ''পিপলচটির'' কথা মনে পড়লো এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই অগণ্য মক্ষিকাকুলের সাদর সম্ভাষণের সম্ভাবনায় প্রাণে দারুণ আশঙ্কা উপস্থিত হলো। সঙ্গী স্বামীজি অচ্যুত ভায়াকে ডেকে বললে, ''অচ্যুত! দেখ কি আজ মহাসংগ্রামে। চটিতে যদি আজ হাজার সৈন্য থাকে, তবে কুঠিতে যে লক্ষাধিক সৈন্য থাকবে, তার আর সন্দেহ নেই।'' যা হোক, খানিক পরেই বুঝলাম, আমাদের ভয় অমূলক; এখানে মাছির কোন উপদ্রব নেই, কিন্তু মাছির বদলে আমাদের আর এক উৎপাত সহ্য করতে হলো। আমাদের দোকানদারের বাড়ী আর দোকান একই ঘরে। সেই ঘরের যে অংশে আমাদের থাকবার জায়গা হলো, তারই আর এক অংশে দোকানদারের পরিবারগণ বাস করে। তার পরিবারের মধ্যে তার স্ত্রী, একটি ষোল সতের বছর বয়সের ছেলে, আর চারটি ছোট ছোট মেয়ে দেখতে পেলাম। বড় ছেলেটি দোকানের কাজে বাপের সাহায্য করে; আর ছোট ছেলেমেয়েগুলি বাপমায়ের দোকান আর গৃহস্থালীর এলোমেলো বাড়িয়ে দেয়। আজ তাদের দোকানে এই নূতন যাত্রী কয়টি দেখে, তাদের আনন্দ দেখে কে ? আমাদের বন্ধুতা স্থাপনের জন্য তারা বড়ই উৎসুক

হয়ে উঠলো। অচ্যুত ভায়ার গম্ভীর মুখভঙ্গী ও বিজ্ঞের ন্যায় আকার ইঙ্গিত দেখে তার কাছে বড় ঘেঁসতে সাহস করলে না; কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই স্বামীজি ও আমার সঙ্গে বিশেষ ঘনিষ্ঠতা করে নিলে। তিন চার বৎসরের একটি মেয়ে আমার ডায়েরীখানা নিয়ে গম্ভীর মুখে তার পাতা উল্টে পাল্টে পড়তে আরম্ভ করলে; শেষে পড়া হলে আমার পেন্সিলটি দখল করে ডায়েরির একখানা সাদা পৃষ্ঠায় দেব-অক্ষরে নানা কথা লিখতে লাগলো। আমাদের মত লোকের সাধ্য কি সে সব হরফের অর্থ আবিষ্কার করি। আজ কতদিন চলে গিয়েছে, সেই বালিকার কথা ভুলে গিয়েছিলাম; বালিকাটিও এতদিন না জানি কত বড় হয়ে উঠেছে; হয়তো তার সেই শৈশবচাপল্য এতদিনে ভুলে গিয়েছে। কিন্তু আজ আর এই বাঙলাদেশের এক প্রান্তে এক ক্ষুদ্রগৃহে বসে যখন ডায়েরী খুলে সব লিখছি, তখন তাহার এক পৃষ্ঠায় বালিকাহস্তের হিজিবিজি দেখে, সেই সুদূর পর্বত শিখরের দোকানীর সেই ছোট্ট মেয়েটির কথা মনে হলো। পেন্সিলের দাগ, আমার মনের মধ্যে তার সেই সুন্দর মুখখানি, দুটি মোটা মোটা চোখ, কোঁকড়া কোঁকড়া বিশৃঙ্খল চুলের রাশের কথা জাগিয়ে দিলে। আমার প্রবাসের অন্যান্য স্মরণ চিহ্নগুলির মধ্যে সাদা কাগজে বালিকাহস্তের পেন্সিলের লেখা একটু; কিন্তু এর মধুরত্ব আর কেউ বুঝতে পারবে না, শুধু আমার চিঠিতেই এর ক্ষুদ্র ইতিহাস সন্নিবদ্ধ। পেন্সিলের দাগগুলি ক্রমেই মুছে যাচ্ছে, আমিও হয় ত একদিন সেই ছোট্ট মেয়েটির কথাও ভুলে যাব।

মেয়েটি যখন আমার ডাইরীতে এইরকম পাণ্ডিত্য প্রকাশ করছিল, সেই সময় তার একটি বড় ভাই, বয়স প্রায় ছয় বৎসর হবে, আমার পর্বত ভ্রমণের সুদীর্ঘ যষ্টিখানা evolution theory জোরে অশ্বরূপে পরিণত করে তাতেই সোয়ার হয়ে চাবুক লাগাচ্ছিলেন। এই রকমে আদরের ক্ষুদ্র সঙ্গীগুলির সঙ্গে যে কত অনর্থক বাক্যব্যয় করতে হয়েছিল, তার সংখ্যা নেই। তাদের যে সমস্ত প্রশ্ন, তার সদুত্তর দেওয়া আমাদের কাজ নয়। কিন্তু যা হয় একটা উত্তর পেয়েও তাদের সন্তোষের লাঘব হয়নি। তবে একটি ছেলের একটি প্রশ্ন আমার বহুকাল মনে থাকবে। তার বয়স বছর আষ্টেক। সে আমাদের তীর্থ ভ্রমণ সম্বন্ধে নানা কথা জিজ্ঞাসা করতে করতে অবশেষে বললে, ''বাপ্‌জী নে বোলা কি স্বামী লোগোকি সাথ্‌ নারায়ণজী বাতচিত করতা হ্যায়, তুমহারা সাথ নারায়ণজীকা কেয়া বাৎ হুয়া?'' - প্রশ্ন শুনে আমার চক্ষু স্থির। ভেবে চিন্তে বললাম, ''হামারা সাথ আবিতক্‌ নারায়ণজীকা মূলাকাত নেই হুয়া।'' আমার এই কথা শুনে বালক কিছু বিরক্ত হ'য়ে বললে, ''আরে, তব কাহে ঘর ছোড়কে সাধু হুয়া?'' কথাটা বালকের বটে; কিন্তু তার মধ্যে কি গভীর ভাবই লুকান ছিল। ভগবানের সঙ্গে সম্পর্ক নেই, কিন্তু ধার্মিক সাধু বটে অনেক। আমি ধার্মিকও নই সাধুও নই। কেবল সাধুর দলে পড়ে এইসব নিগ্রহ ভোগ করছি। আগে জ্ঞান ছিল, কেবল অসাধুর সঙ্গে বেড়ালেই কৈফিয়তের তলে পড়তে হয়, এখন দেখছি সাধুর সহচর হলেও সকল সময় কৈফিয়ৎ এড়ান যায় না।

আজ বৈকালে আর বের হবার ইচ্ছা ছিল না। একে ত বেলা বেশী নেই, তারপর এমন কন্‌কনে শীত, বেলা থাকতে কম্বলের ভিতর থেকে হাত পা বের করা শক্ত। আমরা রওনা হতে একটু ইতস্ততঃ করাতে সকলেই বললেন, এখান থেকে এই বরফ ভেঙে চলা সহজ নয়। আমাদের গতিশক্তি ক্রমে কমে আসছে, আবার এ সময় যদি আমরা দু'বেলার বদলে একবেলা চলতে আরম্ভ করি তা হলে বদ্রীকাশ্রমে পৌঁছুতে আমাদের

আরও বিলম্ব হয়ে যাবে। সুতরাং আমরা চলতে আরম্ভ করলাম। দু'মাইল দূরে 'গড়াইগঙ্গা' চটি পর্যন্ত আসতে আসতেই সন্ধ্যা হয়ে গেল, কাজেই সেখানে রাত্রিবাস করতে হ'ল।

২৬ মে, মঙ্গলবার। – খুব সকালে চলতে আরম্ভ করলাম। আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দিয়ে তিনটি প্রাণী চলছি। জৈষ্ঠ্য মাসের প্রবল রৌদ্রে বোধ হয় এখন আমাদের বঙ্গভূমি মরুভূমিতে পরিণত হবার উপক্রম হয়েছে। বাঙালা ও উত্তর–পশ্চিমের সর্বত্র লোকজন গলদঘর্ম হয়ে শুধু ''জল জল'' বলে চীৎকার করছে আর আমরা বরফস্তূপের ভিতর দিয়ে চলছি, যেন চিত্রহিমানীমণ্ডিত মেরুপ্রদেশ। মেরু–প্রবাসী, কঠিনব্রত পৃথিবীর গুপ্ত সত্যানুসন্ধিৎসু সন্ন্যাসিবর্গের কথা মনে জেগে উঠলো। কি তাঁদের যত্ন, উৎসাহ ও একাগ্রতা। এর চেয়ে প্রচণ্ড শীতেও বহুদূরবর্তী, অজ্ঞাত, বিপদসঙ্কুল প্রদেশে মৃত্যুভয় তুচ্ছ জ্ঞান করে তাঁরা দিনের পর দিন কি অসাধারণ পরিশ্রম না করেন। আর আমরা কি করি ? হৃদয়ে অনেকখানি অবিনয় ও মাথায় অহঙ্কারের দুর্ব্বহ বোঝা নিয়ে প্রকাণ্ড সাধু সেজে ইতস্ততঃ ঘুরে বেড়াই। হৃদয়ে ভগবানের প্রতি ভক্তি ও নির্ভর, মানুষের প্রতি স্বতঃ উৎসারিত প্রেমপ্রবাহের একান্ত অভাব; কিন্তু তবুও আমরা ইহকালে মানুষের ভক্তি ও পরকালে অনন্ত স্বর্গের দাবী করি; কারণ আমরা সাধু, এবং আমরা তীর্থ–পর্যটন ক'রে থাকি। এই সমস্ত কথা ভাবতে ভাবতে ''গড়ুই গঙ্গা'' থেকে ছ'মাইল দূরে 'কুমার চটিতে' উপস্থিত হলাম, তখন বেলা প্রায় বারটা। এখানে নাম মাত্র খাওয়া দাওয়া করে অল্প বিশ্রামের পর আবার রওনা হওয়া গেল। তিন মাইল চলে সন্ধ্যাবেলা একটা পাহাড়ের গায়ে ডাকহরকরাদের আড্ডার মত নির্জ্জন কুটীর দেখতে পেলাম। সেই পত্রকুটীরে রাত্রিবাস ঠিক করা গেল। অন্ধকার রাত্রি, কোন দিকে জনমানবের সাড়া শব্দ নেই, নিকটে কোন লোকালয় আছে ব'লেও বোধ হলো না। এই বহুদূরবিস্তৃত, গগনস্পর্শী পর্বতশ্রেণীর মধ্যে দুর্ভেদ্য অন্ধকারে আমরা তিনটি পথশ্রান্ত, শীতক্লিষ্ট পথিক কোন রকমে রাত্রি কাটিয়ে দিলাম।

২৭ মে, বুধবার। – আমরা যোশীমঠের খুব নিকটে এসে প'ড়েছি। সকালে উঠে খুব উৎসাহের সঙ্গে হাঁটতে লাগলাম। রাস্তায় তখনও অনেক জায়গা বরফে ঢাকা। দিনকতক আগে সে পথ প্রায় বরফাবৃত ছিল, তা বেশ বুঝতে পারা গেল। তখন খুব বরফ গ'লছে। এ পথে ''চড়াই উৎরাই'' খুব বেশী না থাকলেও এই বরফের উৎপাতে আমাদের চলতে বড় অসুবিধা হচ্ছে। আমাদের পাঁচমাইল পথ আসতে বেলা দুপুর হয়ে গেল। পাঁচ মাইল এসে যোশীমঠে (জ্যোতির্ম্মঠে) উপস্থিত হলাম।

যোশীমঠ
জ্যোতির্ম্মঠ

২৭ মে, বুধবার। – আগের দিন রাত্রে আমরা যে চটিতে ছিলাম, সেখান হ'তে যোশীমঠ মোটে পাঁচমাইল মাত্র, কিন্তু এই পাঁচমাইল আসতেই আমাদের কত সময় লেগেছিল, তা পূর্বেই বলেছি। যোশীমঠ যখন আর প্রায় এক মাইল দূরে আছে, সেই স্থানে এসে দেখলাম, পাহাড়ের গা বেয়ে একটা রাস্তা নিচের দিকে চলে গিয়েছে, আরো

দেখলাম যে সকল যাত্রী আসছিল, দু একজন বাদে সকলেই সেই পথে নেমে গেল। তারা কোথায় যায় জানবার জন্যে আমার কৌতূহল হওয়ায় একজন সহযাত্রীকে সে কথা জিজ্ঞাসা করলাম। তিনি উত্তর দিলেন, আমরা যে পথে যাচ্ছি, এইটি যোশীমঠের পথ। যাত্রীরা সাধারণতঃ এ পথ দিয়ে নারায়ণ দর্শন করতে যায় না, তারা ঐ নীচের পথ দিয়ে বরাবর বিষ্ণুপ্রয়াগে চলে যায়, তারপর নারায়ণ দেখে ফেরবার সময় যোশীমঠ দিয়ে আসে। সেও যে সকলে আসে, তা নয়। আমাদের এই রাস্তা থেকে একটা প্রকাণ্ড উৎরাই (দেড় মাইলের বেশী) নামলেই বিষ্ণুপ্রয়াগ।
নারায়ণ দর্শনে অনেক যাত্রীই যায়; কিন্তু তারা যোশীমঠে না গিয়ে কেন যে আশ পাশ দিয়ে যাওয়া-আসা করে, তা আমি বুঝতে পারি নে। হিন্দুর কাছে ত যোশীমঠ অত্যন্ত আদরের সামগ্রী; তবু এখানে লোকের গতিবিধির অভাবের কারণ এই বলে মনে হয় যে, এ পথে যারা আসে সত্যের প্রতি তাদের ততটা আদর নেই। এবং প্রকৃত জ্ঞানলাভের চেষ্টা অপেক্ষা তীর্থদর্শনের দ্বারা পাপক্ষয় ও পুণ্যার্জ্জনকেই তারা তীর্থভ্রমণের প্রধান উদ্দেশ্য বলে মনে করে; সুতরাং তাদের কাছে যোশীমঠের তেমন সম্মান দেখা যায় না। আমি এখন পর্যন্ত বদ্রীকাশ্রম দেখিনি, কিন্তু এখানে এসে আমার মনে হলো, যত কষ্ট করেই বদ্রীকাশ্রম যাওয়া যাক, যোশীমঠে আসবার জন্যে তার চেয়ে শতগুণে বেশী কষ্ট স্বীকার করাও সার্থক। যদি ইয়ুরোপ, কি আমেরিকায় যোশীমঠের মত স্থান থাকতো, তা হলে কত পণ্ডিত, ধর্মের প্রতি নিষ্ঠাবান কত শিক্ষিত যুবক, প্রতি বৎসর সেখানে সমবেত হয়ে কত গুপ্ত সত্য আবিষ্কার করে ফেলতেন। কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য, এ দেশে সে সম্ভাবনা কোথায় ?

উপরেই বলেছি, যোশীমঠ হিন্দুর কাছে একটা মহাতীর্থ। কিন্তু এটি যে শুধু হিন্দুরই তীর্থস্থান, তা নয়। যেখানে নারায়ণের বা মহাদেবের কিংবা অন্য কোন দেবদেবীর প্রতিমূর্তি প্রতিষ্ঠিত আছে, সেইস্থানই হিন্দুর পবিত্র তীর্থ, কিন্তু যেখানে দেবোপম মানব আপনার শান্ত পবিত্র চরিত্রে চারিদিক মধুর, স্নিগ্ধ করে রাখেন, এবং মানবের ক্ষুদ্রতা অপূর্ণতার অনেক উর্ধে দেবমহিমায় বিরাজ করেন, সে স্থান শুধু হিন্দুর তীর্থ নয়, সে স্থান বিশাল মানবজাতির সাধারণ তীর্থক্ষেত্র। দেবতার উদ্দেশে উপহার প্রদানের জন্য সেখানে কেহ ফল পুষ্পাদি নিয়ে যায় না বটে, কিন্তু নিখিল মানবহৃদয়নিঃসৃত ভক্তি ও প্রীতির পুণ্যসৌরভে সেই দেব-মানবের অমরকীর্তি মন্দির পরিব্যাপ্ত হয়ে থাকে।

এই যোশীমঠ একজন প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মার কীর্তিমন্দির। শঙ্করাচার্য্য ইহার প্রতিষ্ঠাতা, এবং এইখানেই তাঁর জীবনের অনেকদিন অতিবাহিত হয়েছিল। অতএব বলা বাহুল্য যে যোশীমঠ শুধু ভক্ত হিন্দুর কাছে নয়, ঐতিহাসিকের কাছেও বিশেষ আদরের সামগ্রী। শঙ্করাচার্য্য কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, সে তত্ত্ব নিরূপণ করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়; সে জন্য কোন রকম চেষ্টাও করিনি; চেষ্টা করলে হয় তো একটু ফললাভ হতো। কিন্তু বাঙালী-জন্ম গ্রহণ ক'রে, সেরূপ করা যে এক মহা দোষের কথা! আমরা প্রত্নতত্ত্ব লিখি, কিন্তু তাতে কতটুকু নিজস্ব থাকে? কেবল তর্জমা করি এবং একজন বৈদেশিক কঠোর পরিশ্রম ও আজীবন সাধনার দ্বারা যে সত্যটুকু আবিষ্কার ক'রে গেছেন, তাই উপর টিকা-টিপ্পনী, ভাষ্য করে দোষগুণের অতি সূক্ষ্ম আলোচনা দ্বারা আমাদের পাণ্ডিত্য স্তূপাকারে ফাঁপিয়ে তুলি। এই তো আমাদের ক্ষমতা। আজকাল শঙ্করাচার্য্যের জন্মকাল নিয়ে বঙ্গ-সাহিত্যে বেশ একটু আলোচনা চলছে; আমাদের মনে

হয় সে আলোচনা আন্তরিক নয় এবং তা ইতিহাসের জ্ঞানাভিমানী পণ্ডিতদের সময় ক্ষেপণের উদ্দেশ্যহীন উপায় মাত্র। কিন্তু বাস্তবিকই যদি এ সম্বন্ধে একটা সত্য আবিষ্কারের জন্য প্রাণে গভীর আগ্রহ জেগে উঠতো, তা হলে কি আমরা স্থির থাকতে পারতাম ? কখনো না। শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধীয় যে সকল রচনা, প্রাচীন গ্রন্থ, অনুশাসন ও নিদর্শনাদি যোশীমঠে আছে শুনা গেল, তাতে বুঝলাম একটু চেষ্টা করলেই তাঁর সম্বন্ধে সমস্ত কথা সহজে জানতে পারা যায়। কিন্তু আমি মূর্খ জ্ঞানলালসা বিরত দ্বিপদ মাত্র, কাজেই সেদিকে আমার মন যায় নি। কিন্তু যাঁরা ভারতের লুপ্তপ্রায় ইতিহাসের পঙ্কোদ্ধারে বাস্তবিক বদ্ধপরিকর, তাঁদের এই সমস্ত দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে এসে সত্যের সন্ধানে লিপ্ত হওয়াই উচিত। যা হ'ক অন্যান্য দেশে হ'লে এ রকম আশা করা অন্যায় হ'ত না, কারণ সে সকল দেশের লোক জীবনটা অসার মায়াময় বলে কোন রকমে কাটিয়ে দিতে রাজী নয়; যার উপর সমাজের ও দেশের মঙ্গল, পরিশেষে সমগ্র মানবজাতীর মঙ্গল নির্ভর করে, এমন কাজে তারা প্রাণপণে নিযুক্ত থাকে এবং মৃত্যুর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ যখন যখন একদলকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়, তখন আর একদল অকম্পিত হৃদয়ে সেই উদ্দাম স্রোতের দিকে অগ্রসর হয়। কিন্তু আমাদের কাছে জীবন স্বপ্ন, জগৎ মায়াময়, সংসার মরুভূমিতুল্য। কোন রকমে চোখ বুজে যদি চল্লিশটা বছর পার হতে পারি, তা হ'লে আমাদের আর পায় কে ? ইহ জীবনের কাজে ইস্তফা দিয়ে শৈশবের সুখস্মৃতির রোমন্থনে মগ্ন হই, না হয় পৈত্রাদি পরিবেষ্টিত হ'য়ে তাদের সঙ্গে নানারকম প্রীতিকর সম্বন্ধ পাতিয়ে পুরানো মরচেপড়া রসিকতার প্রবৃত্তিকে কিছু উজ্জ্বল করে তুলি। আমাদের দিয়ে দেশের আবার উপকার হবে! যোশীমঠে উপস্থিত হ'য়ে শঙ্করাচার্য্য সম্বন্ধে নানা রকম কথা শুনতে শুনতে নিজের সম্বন্ধে আমার এই প্রকার ভাবেরই উদয় হচ্ছিল। দুঃখ বেশী হলে মনের মধ্যে নিজের দুর্বলতার কথাই বেশী বাজে। এ কথার উপর কোন যুক্তি তর্ক নেই এবং কোন দার্শনিক যদি এই মত খণ্ডন করবার জন্য প্রস্তুত হন, তা হলে আমি সে ক্ষেত্রে অগ্রসর হওয়া আবশ্যক মনে করি না।

যা হ'ক যোশীমঠে এসে শঙ্করাচার্য সম্বন্ধে যে সব কথা জানতে পেরেছিলাম তারই এখানে কিঞ্চিৎ উল্লেখ করি। এ সমস্ত কথার সঙ্গে ইতিহাসের কতটা মিল আছে , তা আমি বলতে পারিনে; ঐতিহাসিকেরা তা বুঝতে পারবেন; তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, পথে ঘাটে সাধু-সন্ন্যাসীর দ্বারা যে সমস্ত তত্ত্ব সংগৃহীত হয়, তার মধ্যে অনেক গলদ থাকাই সম্ভব।

মহাত্মা শঙ্করাচার্য্য হিন্দুর চারটি মঠ স্থাপন করেন। তার আবির্ভাবকালে ভারতে হিন্দুধর্ম নিতান্ত নিষ্প্রভ ও জড়তাসম্পন্ন হয়ে পড়ে, এবং বৌদ্ধধর্মের প্রবল তরঙ্গোচ্ছ্বাসে প্রচীন ধর্ম ও ক্রিয়াকর্ম সমস্ত প্লাবিত হয়ে যায়। হিন্দুধর্মের এই অধোগতির পর বৌদ্ধধর্মের এই প্লাবন ভেদ করে তার যে পুনরোত্থান হয়, তা মহাভারতীয়যুগের সেই তেজোময় মহাপ্রতাপসম্পন্ন কর্মশীল জীবনের একটা বিরাট কম্পনে হিন্দু-সমাজের সর্বাঙ্গ পূর্ণ করতে পারেনি সত্য, কিন্তু তা হিন্দু-সমাজে এক নব প্রাণের প্রতিষ্ঠা; এবং তাঁহার স্থাপিত এই মঠ চতুষ্টয়ই তাঁর প্রতিষ্ঠাক্ষেত্র। দ্বারকায় তিনি যে মঠ স্থাপন করেন, সেই মঠের নাম ''শারদা মঠ'', সেতু-বন্ধ রামেশ্বরে স্থাপিত মঠের নাম ''সিঙ্গিরী মঠ'', পুরুষোত্তমে ''গোবর্দ্ধন মঠ'', এবং হিমাচলের এই দুর্গম প্রান্তে ''যোশীমঠ'' যুগাতীত কাল হতে বিস্তীর্ণ ভারতে তাঁর অমরকীর্তি

ঘোষণা করছে! স্থানমাহাত্ম্যের অনুসরণ করলে এই মঠ বদ্রীকাশ্রমেই প্রতিষ্ঠা হওয়া উচিৎ ছিল; সুতরাং সেখানে বাস করা অসম্ভব বুঝে সে স্থানের পরিবর্তে এখানেই মঠ স্থাপিত হয়েছে। এই মঠ অতি পুরানো বলেই মনে হয়।

বর্তমান সময়ে পণ্ডিতেরা শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব-কালের যে সমস্ত প্রমাণ সংগ্রহ করেছেন, তাতে কারো মতে তিনি ষষ্ঠ শতাব্দীর শেষভাগে এবং কারও মতে আরো দুই'শ বৎসর পরে অর্থাৎ অষ্টম শতাব্দীর শেষভাগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। বদ্রীকাশ্রমে যাওয়ার পর যোশীমঠের মঠাধ্যক্ষের সঙ্গে আমার সেখানে দেখা হয়েছিল। কথা প্রসঙ্গে শঙ্করাচার্য্যের কথা উঠলে তিনি বললেন, স্বামীজি (শঙ্করাচার্য) অষ্টম শতাব্দীর শেষ ভাগেই প্রাদুর্ভূত হন। তিনি আরো বললেন যে, তার সঙ্গে আমাদের যোশীমঠে দেখা হলে এ সম্বন্ধে অল্পবিস্তর প্রমাণও তিনি দেখাতে পারেন। যোশীমঠে অনেক পুরানো পুঁথি ছিল; তার কতক কতক নানা রকম বিপ্লবে নষ্ট হয়ে গিয়েছে; কিন্তু সেই হস্তলিখিত কীটদষ্ট জীর্ণ প্রাচীন গ্রন্থের কতকগুলি এই মঠে বর্তমান আছে এবং আমরা যদি পুনর্ব্বার যোশীমঠে যাই, তা হলে মঠাধ্যক্ষ মহাশয় আমাদের আহ্লাদের সঙ্গে তা দেখাবেন। সেই সমস্ত জীর্ণ গ্রন্থে শুধু শঙ্করাচার্য্যের আবির্ভাব কালেরই নিরূপণ হবে তা নয়, তাতে যে সময়ের সামাজিক অবস্থা, তৎকালীন রাজনীতি, হিন্দুধর্ম ও ধর্মাদির উন্নতি, বিস্তৃতি ও অবনতি, সাধারণ লোকের ধর্মে আস্থা এবং ধর্ম সম্বন্ধে মতামত প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয় বিবৃত আছে। এ সকল পুঁথির সাহায্যে প্রাচীন গুপ্ত সত্য আবিষ্কার দ্বারা দেশের যে অনেক উপকারসাধন করা যেতে পারে তার কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। কিন্তু কে এতখানি কষ্ট স্বীকার করে' এই দুর্গম দুরারোহ পর্বতে এসে এই কঠিন কাজে হস্তক্ষেপ করবে ? আমাদের দেশে এখনও সে সময় আসেনি; এবং আমরা এখনও এরূপ কঠিন ব্রত গ্রহণ করার উপযুক্ত হইনি। সত্যের জন্য প্রাণ দেবার কথা বহু পূর্বে শুনা যেত বটে, কিন্তু এখন নকল-নবিশেরই প্রাধান্য।

মনে করেছিলাম বদ্রীকাশ্রম হতে ফিরবার সময় যোশীমঠ সম্বন্ধে কতকগুলি তথ্য সংগ্রহ করে নিয়ে যাব, কিন্তু নানা রকম বাধ-বিঘ্ন ঘটায় আর সে বিষয়ে হাত দিতে পারিনি। কখনো যে সে আশা পূর্ণ হবে, তারও কোন সম্ভাবনা দেখা যায় না। যদি আমাদের উৎসাহশীল ইতিহাসপ্রিয় কোন পাঠক এই দেশহিতকর কাজে হস্তক্ষেপ করতে চান, যদি লুপ্তপ্রায় গুপ্তসত্যের সন্ধানে ব্যাপৃত হওয়া উপযুক্ত মনে করেন, তা হলে যোশীমঠ ছাড়া এমন আরো দু'চারটি স্থানের নাম করতে পারি, যেখানে সন্ধান করলে অনেক প্রাচীন তত্ত্ব আবিষ্কার হতে পারে।

আমরা যে পথে যোশীমঠে গেলাম, সে পথটি পহাড়ের গায়ে আঁকা বাঁকা; পথের দু'ধারে শ্রেণীবদ্ধ দোকান। দোকনগুলি নিতান্ত সামান্য, তার প্রায় অধিকাংশই দোতলা; ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কক্ষগুলি যেন পর্বতের গায়ে মিশে রয়েছে। কলিকাতার বড় বড় অট্টালিকাগুলিতে যাঁরা চিরদিন বাস করে আসছেন, তাঁরা এই ছোট ছোট ঘরগুলি দেখলে কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারবেন না যে এইটুকে ঘরে সাড়ে তিন হাত দীর্ঘ মানুষ কি করে বসবাস করে! এইকথা বৈদান্তিক ভায়াকে বলাতে তিনি একটা পৌরাণিক গল্পের অবতারণা করলেন। বিস্তৃত হলেও তার একটা সংক্ষিপ্তসার পাঠক মহাশয়কে উপহার দেওয়া যেতে পারে। বৈদান্তিকের মুখে শুনলাম, পূর্বকালে এক ঋষি ছিলেন; (নামটা বেশ জাঁকাল রকম, কিন্তু স্মরণ হচ্ছে না) সেই ঋষি অনেক

বৎসর যাবৎ তপস্যা করার পর তাঁর কেমন সখ হলো যে একটুখানি ঘর তৈয়ারী করে তার নীচে মাথা রেখে দিনকতক আরামে থাকবেন। কিন্তু মানুষের পরমায়ুর কথা তো আর বলা যায় না, যদি শীঘ্রই পরমায়ু শেষ হয়, তবে অকারণ একখানি ঘর তোলা কেন? তাই একবার ধ্যান করে পরমায়ুর শেষ মুড়োর অনুসন্ধান করা হলো; কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ দেখলেন তাঁর পরমায়ুর আর মোটে পাঁচ হাজার বছর বাকি। অতএব এই সামান্য দিনের জন্যে ঘর তুলে অকারণ ঝঞ্ঝাটের আবশ্যক কি? এই সিদ্ধান্ত করে তিনি এক গাছতলায় বসেই সেই সামান্য কয়েকটি বছর কাটিয়ে দিলেন। ইতিমধ্যে একদিন একটি বড় গোছের দেবতার সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়। অন্যান্য কথাবার্তার পর দেবতাটি বললেন, ''আপনার একটি কুটির হলে ভাল হয়, গাছতলাটি বাসের পক্ষে খুব নিরাপদ নয়।'' – আমাদের অল্পায়ু ঋষি ঠাকুরটি উত্তর দিলেন যে, ''মোটে পাঁচ হাজার বছর বাঁচবো, তার জন্যে আবার ঘর।'' – অর্থাৎ দু'পাঁচ লাখ বৎসর বাঁচবার সম্ভাবনা থাকতো, তা হলে একদিন একটা কুঁড়ে–টুঁড়ে তৈয়ারি করলেও করা যেত। বৈদান্তিক এই দৃষ্টান্তের সঙ্গে উপদেশ জুড়তেও ছাড়লেন না; তিনি বললেন, এই ঘটনা থেকে বুঝা যাচ্ছে, ইহলোককে আমরা কত তুচ্ছ জ্ঞান করি, পরলোকে আমাদের স্থায়ী বাসস্থান। দিনকতকের জন্যে এই ইহলোকের প্রবাসে এসে তিন চার তলা বাড়ী তুলে স্থায়ী রকমে বাসের বন্দোবস্ত, সে কেবল ইউরোপীয়গণের বিলাস–রসসিক্ত দুর্বল অন্তঃকরণের পক্ষেই শোভা পায়, এবং তাঁদের অনুকরণপ্রিয় দেশীয়গণ সম্বন্ধেও এ কথা খাটতে পারে। এই কথায় বৈদান্তিকের সঙ্গে দারুণ তর্ক বেধে গেল। আমি বললাম, হুঁ, ইউরোপীয়গণের এ একটি ভয়ানক ত্রুটি বলে অবশ্য স্বীকার করতে হবে; কারণ তাঁরা যে কয়টা বছর বাঁচেন, তাতে তাঁদের মহাপ্রাণী একটু সুখস্বচ্ছন্দতা , একটু আরাম ও তৃপ্তি অনুভব করবার অবসর পায়। আর তাঁরা যে কিছু কাজ করেন, তাতেও তাঁদের নামগুলিকে কিছু দীর্ঘকাল ইহলোকে স্থায়ী করবার, কিঞ্চিৎ বন্দোবস্ত করা হয়। কিন্তু আমাদের ঠিক উল্টো ব্যবস্থা; জীবনটি পরিপূর্ণমাত্রায় অপব্যয় করাই আমাদের বৈরাগ্যের প্রধান লক্ষণ। যা হোক সুখের বিষয় স্বামীজির বিশেষ যত্নে আমাদের এই আন্দোলন অতঃপর নিবৃত্তি হয়ে গেল। আমরা চলতে চলতে বাজার দেখতে লাগলাম; দেখলাম বাজারে সকল রকম জিনিসই পাওয়া যায়, এমন কি সোনা–রুপার কারিগর এবং টাকাকড়ি লেনদেনের মহাজন পর্যন্ত এখানে আছে। এসকল এখানে থাকবার কারণ, যোশীমঠ বদ্রীনারায়ণের মোহান্তের ''হেড কোয়াটার;'' তিনি এখানে সশিষ্যে বাস করেন। এতদ্ভিন্ন যে সমস্ত পাহাড়ী ভূটিয়া ও নেপালীগণ বদ্রীকাশ্রমে বাস করে, তারা শীতকালে সেখানে থাকতে না পেরে এখানে এসে কয়েকমাস কাটিয়ে গ্রীষ্মকালে আবার দেশে ফিরে যায়।

যোশীমঠের দু'মাইল নীচে পাহাড়ের পাদদেশে বিষ্ণুপ্রয়াগ। বিষ্ণুপ্রয়াগেও অনেক লোক বাস করে, কিন্তু তা ছেড়ে আর খানিক আগে গেলে আর লোকালয় দেখা যায় না। বলতে গেলে বদ্রীকাশ্রমের রাস্তায় বারমাসের লোকালয়ের এখানেই শেষ; তবে এর পরেও দু'চারটি জায়গা আছে, সেখানে কোন কোন বছর শীতের প্রাবল্য কিছু কম হলে দুই একঘর লোক বাস করে থাকে। কিন্তু যোশীমঠের মতন এমন আড্ডা আর নেই। এইসকল কারণেই যোশীমঠ শহরের মত; কিন্তু যে সকল প্রাচীন গৌরবের চিহ্ন আজও যোশীমঠে বর্তমান আছে, তা দেখবার কি বুঝবার লোক বড় একটা দেখা যায় না। আমরা

বাজারের মধ্য দিয়া ঘুরতে ঘুরতে দাতব্য চিকিৎসালয়ের পাশে একটা দোকানে আশ্রয় নিলাম।
পূর্ব্বেই বলেছি, যোশীমঠের রাস্তা পাহাড়ের গায়ে। যোশীমঠের পাহাড়টা একটু বাঁকা, এই বাঁকের অল্প নীচেই খানিক সমতল স্থান। এই স্থানটি এক কাঠার কিছু বেশী হবে; তারই উপর পর্ব্বতের কোলের মধ্যে হিন্দুর গৌরবস্তম্ভ শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত যোশীমঠ বিরাজিত। মন্দিরটি বেশী বড় নয়। আমরা যে দোকানে বাসা নিয়েছিলাম, মন্দিরের চূড়া ততদুর উঁচু নয়।

আমরা দোকানে আর বিশ্রাম করলাম না। লাঠি আর কম্বল দোকানঘরে ফেলে তখনই মঠ দর্শনে বের হওয়া গেল। যোশীমঠের রাস্তা দিয়ে নীচে নামতে নামতে রাস্তার পাশে আর একটা মন্দির দেখতে পেলাম। এই মন্দিরে প্রবেশ করি কি না ভাবছি এমন সময়ে একজন পথ-প্রদর্শক জুটে গেল। তার সঙ্গেই আমরা মন্দিরে প্রবেশ করলাম। দেখলাম, মন্দিরটা বহুকালের পুরাতন। কত শতাব্দীর বিপ্লব পরিবর্তনের নীরব ইতিহাস যে এই প্রাচীন মন্দিরের পাষাণ প্রাচীরে বন্দী আছে তা নির্ধারণ করা যায় না। কিন্তু এ মন্দির এত দৃঢ় যে, একটা জমাট পাহাড়ের স্তুপ বললেও অত্যুক্তি হয় না, এবং মনে হলো সৃষ্টির শেষ দিনেও তা থেকে একখণ্ড পাথরও বিচ্যুত হয়ে পড়বে না। আমাদের পথপ্রদর্শক বললে, এ মন্দিরটি শঙ্করাচার্যের মন্দির আবির্ভাবের অনেক পূর্বে নির্মিত।

আমরা যখন মন্দিরে প্রবেশ করিনি, তখন মনে হয়েছিল অন্যান্য মন্দিরেও যা দেখি, এখানে হয় তো তাই দেখবো সেই অনাদি শিবলিঙ্গ না হয় অনন্ত শালগ্রামশিলা; খুব বেশী হয় তো সুন্দর সুবেশ এক নারায়ণ মূর্তি। কিন্তু সে সব কিছুই আমার দৃষ্টিগোচর হ'ল না, শুধু মন্দিরের মাঝখানে তিন হাত কি সাড়ে তিন হাত লম্বা ও এক হাত চওড়া একখানি সিন্দুর মাখান কিছু; - তা কাঠও হতে পারে; পাথরও হতে পারে; আবার লোহা কি ইস্পাত হওয়াও আশ্চর্য নয়, কারণ তেল সিন্দুর ছাড়া তার কোন স্বরূপ অবধারণ করতে পারলাম না। প্রথমে মনে করলাম, হয় তো বা লোকে এই আসনখানাই পূজা করে। কিন্তু আমাদের পথি-প্রদর্শক যে এক লোমহর্ষণ কাহিনী বললে, তা শুনে আতঙ্কে আমার সর্বশরীর শিউরে উঠলো। তার কাছে শুনলাম যে, এইখানে এক দেবী মূর্তী বহুকাল হ'তে প্রতিষ্ঠিত ছিল। নররক্ত ভিন্ন অন্য প্রাণীর রক্তে তাঁর পিপাসা দূর হ'তো না বলে তাঁর সম্মুখে প্রতিদিন নিয়মমত নরবলি দেওয়া হ'তো! এতদ্ভিন্ন উপলক্ষে কোন কোন দিন এত মনুষ্যমুণ্ড দেহচ্যুত হতো যে তাদের উচ্ছ্বসিত শোণিতপ্লাবণে মন্দিরের সমস্ত প্রাঙ্গন পরিপূর্ণ হয়ে যেতো। সে বললে যে, আমি যেখানে দাঁড়িয়ে আছি, ঠিক এই জায়গায় আমার পায়ের নীচেই শত শত নিরপরাধ ব্যক্তি এই ভয়ানক অনুষ্ঠানের অনুরোধে নিহত হয়েছে। বোধ করি, তাদের অবরুদ্ধ মর্ম্মোচ্ছ্বাস ও নিরাশ ক্রন্দন পাষাণ-প্রাচীর ভেদ করবার পূর্ব্বেই তাদের জীবনের উপর চির-অন্ধকারের যবনিকা পতিত হয়েছে। আমি সভয়ে সম্মুখে চেয়ে দেখলাম; বোধ হতে লাগলো, শত শত রক্তাপ্লুত ছিন্ন-মস্তক যেন শোণিতস্রোতে তীরবেগে ধেয়ে আসছে, তার ঘাতকের পৈশাচিক নৃত্য ও অট্টহাস্যে চতুর্দিক প্রকম্পিত হচ্ছে। হায় দেবী, কতকাল থেকে তুমি মাতার সুপবিত্র স্নেহ-কোমল ও নিতান্ত নির্ভরতাপূর্ণ অধিকার হরণ করে সন্তানের উষ্ণ রুধিরে আপনার লোলজিহ্বা তৃপ্তি করেছ। কিন্তু তোমারই বা দোষ কি, তোমার নামে মানুষ প্রতিদিন অসঙ্কোচে কত কুকার্যই না করে ?

কিন্তু কতদিন দেবী স্থানচ্যুত হয়েছেন, তা ঠিক জানতে পারলাম না। কেহ কেহ বলেন, শঙ্করাচার্য যখন যোশীমঠের প্রতিষ্ঠা করেন, সেই সময়ে তিনি এই ভয়ানক কাণ্ড নিবারণ করেন। সেই সময় হতে দেবমূর্তি বিমুখ অবস্থায় মন্দির মধ্যে প্রোথিত হয়েছেন, এখন শুধু তাঁর শূণ্য আসনখানিই দেখা যায় এবং তারই পূজা হয়ে থাকে। কিন্তু কারো কারো মতে এই বিপ্লব শঙ্করাচার্যের দ্বারা সাধিত হয় নি। এ সম্বন্ধে তাদের প্রধান যুক্তি এই যে, শঙ্করাচার্য হিন্দুধর্মের একজন অবতার বিশেষ, এমন কি অনেকে তাঁর উপর শিবত্ব পর্যন্ত আরোপ করে থাকেন। সেই শঙ্করাচার্য যে এমন একটা ম্লেচ্ছভাবাপন্ন কাজ করে ফেলবেন, এ কথা তাঁরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে রাজী নন। কিন্তু এঁরা বোঝেন না, ধর্মের সংস্কার ও বিনাশ এক কথা নয়, সুতরাং ধর্মের সংস্কারের জন্য যে কাজ শঙ্করাচার্যের পক্ষে নিতান্ত সহজ, এঁরা তা ধর্মবিনাশক মনে করে তখনই ধারণা করতে পারেন না, যে এমন অধর্ম শঙ্করাচার্য দ্বারা কিরূপে সাধিত হতে পারে ? যা হ'ক, এ সম্বন্ধে এঁদের মতও উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না। কারণ এঁরা বলেন বৌদ্ধরা যখন এখানে আসেন, তখন তাঁরাই এই ঘৃণিত প্রথা বন্ধ করেছিলেন। এই দুই মতের কোন মত সত্য, তা অনুমান করা কঠিন। এই বিষম অপ্রীতিকর জায়গায় আমি আর বেশীক্ষণ থাকতে পারলাম না। দ্রুতপদে মন্দির ত্যাগ করলাম, বোধ হতে লাগলো শত শত নরকঙ্কাল আমার পাছে পাছে ছুটে আসছে।

মন্দির থেকে বার হয়ে একেবারে যোশীমঠে উপস্থিত হলাম। বাহিরে একটা ঝরণা থেকে অবিরাম জল পড়ছে। এই ঝরণার কাছ দিয়ে একটা ছোট দ্বারপথে আমরা মন্দির প্রাঙ্গণে প্রবেশ করলাম। দেখি একটা দোতলা চক, বাইরে টানা বারান্দা, মধ্যে ছোট ছোট কুঠুরী। বাহিরে অনতিদীর্ঘ একটি উড়ান, তিন দিকে দোতলা কোঠা, আর এক দিকে মন্দির। অনুচ্চ মন্দির; মন্দিরের মধ্যে যেখানে মূর্তি থাকে, এই মন্দিরে সেখানে তাকিয়া–বেষ্টিত স্থূল গদি দেখতে পেলাম। এইটি শঙ্করাচার্যের গদি। এই গদি বাঁ পাশে রেখে অগ্রসর হতেই দেখি এক চতুর্ভুজ মূর্তি; তেমন জাঁকাল নয়, বিশেষতঃ একটা অন্ধকারময় কুঠুরীতে পড়ে তাঁর মাহাত্ম্যও খুব খাট হয়ে গিয়েছে বলে বোধ হল।

মন্দির থেকে বেড়িয়ে উঠানের এক পাশে বসলাম। উঠানটি পাথর দিয়ে বাঁধানো; দেখলাম সেখানে অনেকগুলি স্ত্রী–পুরুষ কোলাহল করছে। একজন পাণ্ডা একটি স্ত্রীলোকের সঙ্গে এমন কুৎসিত ভাষায় ঝগড়া করছে যে, সেখানে দু'দণ্ড অপেক্ষা করা অসম্ভব হয়ে উঠলো। কোথায় মহাত্মা শঙ্করাচার্যের প্রধান মঠে উপস্থিত হয়ে আমরা শান্তি আনন্দ উপভোগ করবো, না পাণ্ডাঠাকুরদের বৈষয়িক গণ্ডগোলের জন্য হিমালয়ের শৈত্য ও শান্তিময় ক্রোড়স্থিত এই পরম পবিত্র তীর্থস্থান এক বিড়ম্বনার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই মঠ নিয়ে যে সমস্ত পৈশাচিক কাণ্ডের অভিনয় হয়ে গিয়েছে, তা শুনলে মনে বড়ই কষ্ট উপস্থিত হয়। পাঠক মহাশয়ের অবগতির জন্য মঠের এই শোচনীয় ইতিহাস এখানে সংক্ষেপে বিবৃত করছি।

শঙ্করাচার্য এই মঠের ভার ত্রোটকাচার্য গিরির হাতে সমর্পণ করে যান। এই মঠ তিন শ্রেণীর সন্ন্যাসীর অধিকারে থাকে – গিরি, পুরী ও সাগর। সন্ন্যাসী মহাশয়েরা সহসা এই অতুল সম্পত্তির অধিকারী হ'য়ে সন্ন্যাস ধর্ম আর ঠিক রাখতে পারলেন না। দীর্ঘকালের

কঠোর সংযম ও বৈরাগ্যকে বিলাস–সাগরে ভাসিয়ে শুষ্ক প্রাণে প্রচুর আরাম সঞ্চয় করতে লাগলেন। ধর্ম কর্ম সব বিসর্জন দিয়ে শুধু শারীরিক সুখ–সম্ভোগই তাঁদের জীবনের অদ্বিতীয় উদ্দেশ্য হয়ে উঠলো। ক্রমে তাঁদের অবস্থা এরকম হয়ে উঠলো যে, মঠ আর চলে না। এই অবস্থায় মঠাধ্যক্ষ গিরি সন্ন্যাসী অন্য সম্প্রদায়ের একজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে জুয়া খেলে যথাসর্বস্ব হারান। শেষে এই মঠ বাজী রেখে খেলা আরম্ভ করেন; দুর্ভাগ্যক্রমে মঠটি হারাতে হয়। সন্ন্যাসী ঠাকুরের যে রকম পণ তাতে যদি দ্রৌপদী থাকতো, তা হলে তাঁকেও হয় ত পণ ধরতেন। যা হোক, তা না থাকলেও এখানেই এই পর্ব অভিনীত হয়ে গেল। সর্বত্যাগী হয়েও যিনি ইচ্ছা করে প্রবৃত্তির স্রোতে আপনার মন প্রাণ ভাসিয়ে দিয়েছিলেন, এখন বাধ্য হয়ে তাঁকে নিবৃত্তির অঙ্কে আশ্রয় নিতে হলো ও আসক্তি বর্জিত বৈরাগ্যাবলম্বী সাধুর মত সমস্ত ত্যাগ করে চলে যেতে হলো। কিন্তু তাঁর এই চিরন্তনের বিলাসক্ষেত্র ছেড়ে যেতে মনে যে দারুণ আঘাত লেগেছিল, মায়াবদ্ধ গৃহীর নৈরাশ্যপূর্ণ মর্মভেদী যাতনা অপেক্ষা তা অল্প নয়।

যা হোক, যে সন্ন্যাসী এই মঠ লাভ করেন, তিনি তাহা দক্ষিণদেশী রাওল ব্রাহ্মণদের কাছে বিক্রয় করলেন। তাঁরাই এখন এই মঠের অধিকারী, সুতরাং বদ্রীনারায়ণের মন্দির আজও তাঁদের দখলে। শুনলাম, এ পর্যন্ত সাতাশ জন রাওয়াল–ব্রাহ্মণ এই মঠের অধ্যক্ষতা করে গেছেন। তাড়িত সন্ন্যাসী বা মঠাধ্যক্ষের বর্তমান উতারাধিকারী কেবলানন্দ গিরি এখন নেপাল আছেন শুনা গেল। তিনি অতি মহৎ–লোক। এই মন্দির হস্তগত করবার জন্য তিনি বিশেষ চেষ্টা করছেন। তিনি বলেন, মঠ দান–বিক্রয় করবার বা বন্ধক দেবার সম্পত্তি নহে; কিংবা মঠাধ্যক্ষের সে অধিকারও নাই; তিনি আজীবন মঠের সত্বাধিকারী মাত্র, তাও যদি তিনি পবিত্রভাবে মঠের সকল অনুশাসন মেনে চলেন, তা হলেই। কলুষিত চরিত্র বা ভ্রষ্টাচারী হ'লে তাঁকে মঠচ্যুত হতে হবে, ইহাই শঙ্করাচার্যের আদেশ। কেবলানন্দ গিরির এই মঠে সম্পূর্ণ অধিকার আছে। জানি না এই মঠ নিয়ে মামলা মকর্দমা হওয়ার সম্ভাবনা আছে কি না।

বিস্তৃত মঠপ্রাঙ্গনে বসে একজন পলিতকেশ বৃদ্ধ সন্ন্যাসীর মুখে মঠের শোচনীয় ইতিহাস শুনতে লাগলাম। মহামহিমান্বিত যোশীমঠের এই শোচনীয় কাহিনী আমার মনে শুধু মানব–হৃদয়ের দুর্বলতা, হীনতা ও স্বার্থপরতার কথাই জাগিয়ে দিতে লাগলো। দূর হতে মনে হতো, যারা সংসারতাপদগ্ধ ক্লিষ্ট পার্থিব হৃদয়ের অনেক ঊর্ধে শান্তি ও প্রীতির সুশীতল ছায়া উপভোগ করেন, পর্বতের কোলের এই সকল পবিত্র তীর্থে তাঁদের দর্শন করে এবং তাঁদের কাছে সান্ত্বনার কথা শুনে হৃদয়ের অশান্তি ও দুর্বলতা খানিকটা দূরে যাবে, চতুর্দিকের বাহ্যপ্রকৃতি শরীর ও মন উভয়কেই পবিত্র পরিতৃপ্ত করে তুলবে। সেই আশাতেই এত দূরে এত কষ্ট করে এসেছিলাম। বাহ্যপ্রকৃতি তার অনন্ত সৌন্দর্য্যের দ্বার উন্মুক্ত করে আমাকে মুগ্ধ করে ফেলেছে, এই স্বর্গীয় শোভা আমার হৃদয়ে পরিব্যপ্ত হয়ে রয়েছে। কিন্তু মানবের সে দেব–হৃদয় কই ? সেই আত্মত্যাগ ও সমদর্শিতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত যা বিধাতার সর্বশ্রেষ্ঠ দান, এবং যা দেখবার আশাতে এতদূর এসে পড়েছি, – তা কোথায় ?

বিষ্ণুপ্রয়াগ

২৭ মে, বুধবার – অপরাহ্ন। – আজ যোশীমঠ হতে বের হবার একটুও ইচ্ছা ছিল না। শুধু এক দিনের জন্যই নয়, আমার ইচ্ছা তিন চারিদিন এখানে থাকি। শঙ্করাচার্য্যের অতীত–গৌরবের সমাধিক্ষেত্র, এই স্থান ছেড়ে আমার সহজে যেতে ইচ্ছে করছিল না। থাকবার ইচ্ছা করলাম বটে, কিন্তু থাকা হলো না; স্বামীজি জেদ করতে লাগলেন আজই রওনা হতে হবে; তার উপর অসহিষ্ণু বৈদান্তিকের তাড়না অসহ্য হয়ে উঠলো। দু'দণ্ড যে কোথাও বিশ্রাম করবো সে জো নেই, বোধ হয় জন্মান্তরে আমি গরু এবং বৈদান্তিক রাখাল ছিলাম; তাই বুঝি আজও নাকে দড়ি দিয়ে আমাকে নিয়ে ঘুরিয়ে বেড়াবার ঝোঁক ছাড়তে পারেন নি। কি করা যায়, বেরিয়ে পড়া গেল।

আগেই বলেছি পাহাড়ের নীচে যোশীমঠ, নীচে বিষ্ণুপ্রয়াগ। যোশীমঠ হতে বিষ্ণুপ্রয়াগ একটা বড় খাড়া উৎরাই। যদি পাহাড়ের গায়ে গাছপালা না থাকতো, তা হলে শঙ্করের মন্দির থেকে গা ছেড়ে দিলে তৎক্ষণাৎ বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে একেবারে অলকানন্দা দাখিল হওয়া যেত। যোশীমঠ হতে উৎরাই–টুকু নামতে আমার একটু বেশী কষ্ট হয়েছিল; কারণ পাহাড়ের গা এমন সোজা, আস্তে আস্তে লাঠিতে ভর দিয়ে নবাবী চালে চলা যায় না; নামতে বেশ একটু বেগ পেতে হয়, কে যেন উপর হতে অর্ধচন্দ্র দিয়ে নামিয়ে দিচ্ছে। আমরা বেলা ৫ টার সময় রওনা হয়েছিলাম, কিন্তু আধঘন্টার মধ্যেই একেবারে বিষ্ণুগঙ্গার উপর টানা সাঁকোর কাছে এসে পড়লাম। এই বিষ্ণুপ্রয়াগে বিষ্ণুগঙ্গা অলকানন্দার সঙ্গে মিশেছে।

আমি একটি একটি করে ক্রমাগত প্রয়াগের কথাই বলছি। একটা প্রয়াগের জায়গায় পাঁচটা প্রয়াগের কথা বলেছি, তবু আমার প্রয়াগ ফুরায় না। আজ আবার আর এক প্রয়াগে উপস্থিত। সর্বশুদ্ধ প্রয়াগ পাঁচটাই বটে; কিন্তু বিষ্ণুপ্রয়াগকে পূর্ববর্ণিত প্রয়াগগুলির মধ্যে একটা Supplement বলে ধরে নেওয়া দরকার; Supplement এই জন্যে বলছি যে, 'কেদারখণ্ডে' পাঁচটার বেশী উল্লেখ নেই; কিন্তু তথাপিও বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ না বললে তার উপর নিতান্ত অবিচার করা হয়; শুধু অবিচার নয়, তাতে তার যথেষ্ট অপমান করাও হয়। বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগ–শ্রেণীভুক্ত না করাতে অন্ততঃ এই প্রমাণ হয় যে 'কেদারখণ্ড'–লেখক একজন চিন্তাশীল ও ভক্ত হতে পারেন; কিন্তু তিনি কবি নন এবং কবিত্বের মাধুর্য ও গৌরব অপেক্ষা তিনি পৌরাণিক আধিপত্যকেই শ্রেষ্ঠ আসন দিতে চান।

যা হ'ক, কাব্যজগতে বিষ্ণুপ্রয়াগের মহিমা স্বপ্রকাশিত, তা কোন লেখকের লেখনীমুখে ব্যক্ত হ'ক আর নাই হ'ক। আজকাল প্রকৃতির সৌন্দর্যের প্রীতিপূর্ণ স্নিগ্ধ সত্তার পৌরাণিক প্রতিষ্ঠার উপর নিঃসঙ্কোচে রাজত্ব করছে, সুতরাং এ যুগে বিষ্ণুপ্রয়াগকে প্রয়াগসমষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান দিলেও বেশী আপত্তি হবার সম্ভাবনা দেখা যায় না। আর যদি দুই নদীর সঙ্গমস্থলকেই প্রয়াগ বলা যায়, তা হলে এই স্থানটিকেই সকলের আগে প্রয়াগ বলা উচিৎ। কেন সে কথা আগে বলেছি।

আমরা যখন যোশীমঠ হতে খানিকটা নেমে এসেছি, সেই সময় খানিক দূরে জলের একটা গম্ভীর কল্লোল শুনা গেল। এই অবিরাম কল্লোলের সঙ্গে কার যে তুলনা দেওয়া যেতে পারে, অনেক চিন্তা করেও স্থির করতে পারিনি। কোথা হ'তে এই শব্দ আসছে, তা কিছুই ঠিক করতে পারলাম না, বিশেষ আমাদের তিন জনেরই অভিজ্ঞতা সমান; সুতরাং কোন রকম মীমাংসা হলো না। তবে অনুমান এ শব্দ অলকানন্দার স্রোতের শব্দ ভিন্ন আর কিছু নয়। ক্রমে যখন ধীরে ধীরে বিষ্ণুগঙ্গার সাঁকোর উপর এসে পড়লাম, তখন খুব প্রবল শব্দ শুনতে পাওয়া গেল। একটু এদিক ওদিক সন্ধান করতেই দেখলাম, বিষ্ণুগঙ্গা খুব প্রবল বেগে বয়ে যাচ্ছে; এ তারই শব্দ। আমরা ঘুরতে ঘুরতে নদীর কাছে এসে দাঁড়ালাম। এখানে নদীর তলদেশ অত্যন্ত ভয়ানক, বড় উঁচু নীচু, তাই এ রকম জলের শব্দ হচ্ছে।

আমরা সাঁকো পার হয়ে বাজারে উপস্থিত হলাম। বাজার ত ভারি, সেই 'যথাপূর্ব তথাপর '। খানিকটা অপ্রশস্ত সমতল জায়গায় খান চার দোকান; তাতে আটা, ডাল, ঘি, নুন, গুড় বিক্রয় হয়। আমরা বাজারে উপস্থিত হওয়া মাত্র একজন দোকানদার – ফরমাইস পেলে সে তখনই গরম গরম পুরী, ভুজ্জি (তরকারী) তৈয়ারী করে দিতে পারে, এই কথা আমাদের কাছে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করলো; এবং কথার সাক্ষীস্বরূপ আর তিন জন লোককে দাঁড় করালে; তারাও মুক্তকণ্ঠে এই হালুইকর ঠাকুরের যশোগানে প্রবৃত্ত হলো। এদের রকম সকম দেখে আমার বড়ই আমোদ বোধ হয়েছিল; আমার আরও আমোদের কারণ, তারা আমাদের যতটা নির্বোধ ভেবে দু'পয়সা উপায়ের চেষ্টা করছিল, সুখের বিষয় আমরা ততটা নির্বোধ নই, কিন্তু সেজন্য তাদের মনে অনেকখানি আশার সঞ্চার সম্বন্ধে কোনও বাধা হয় নি। দেখলাম কলকাতার চিনাবাজারের দোকানদারেরাই যে ধূর্ত ও ব্যবসা কার্যে দক্ষ তা নয়; হিমালয়বক্ষে এই সকল দোকানদারেরাও জানে, কি রকম করলে দু'পয়সা হতে পারে।

যাহোক, মিষ্ট কথা ও ভবিষ্যতে পুরীর খরিদ্দার হবার ষোল আনা রকম আশা নিয়ে এই দোকানদার পুঙ্গবটিকে বশ করা গেল। কোথায় রাত্রি কাটান যায়, তা ঠিক করবার জন্যে তার উপরই ভার দিলাম। বুঝলাম, আজ তাকে যে লোভ দেখান গিয়েছে, তাতেই সে আমাদের জন্যে কষ্ট স্বীকার করবে; আর বাস্তবিক দেখলাম, এই সাধুদের কাছে দু'পয়সা লাভ করতে পারবে বুঝে, সে আমাদের একটা আড্ডার জন্যে খুব উৎসাহের সঙ্গে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। কিন্তু তার চেষ্টার কোনও ত্রুটি না হলেও অদৃষ্ট ত আমাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে; কাজেই কোথাও আড্ডা মিললো না। বামুন ঠাকুর অনুসন্ধানের পর অকৃতকার্য হয়ে যখন আমাদের সম্মুখে কাতরভাবে দাঁড়াল, তখন আমাদের নিজের কথা ভেবে যতটা দুঃখ না হ'ক, ঠাকুরের ভাব দেখে তার চেয়ে বেশী দুঃখ হয়েছিল। আমি ঠাকুরকে বুঝিয়ে দিলাম, তার আর কষ্ট করবার দরকার নেই, আমরা একটা বাসা খুঁজে নিচ্ছি; কিন্তু এতে যেন সে নিরুৎসাহ না হয়, লুচি তরকারী তার দোকান ছাড়া আমরা আর কোথাও নিচ্ছিনে। আশ্রয়ের সন্ধানে বেড়িয়ে পড়া গেল। স্থান আর মেলে না। সকালবেলায় যে সব যাত্রী যোশীমঠে না গিয়ে রাস্তা থেকে আমাদের ছেড়ে নীচের পথ দিয়ে বরাবর এখানে চলে এসেছে, তারাই এখানে সকল আড্ডা দখল করে ফেলেছে, একটি প্রাণীও ঐ স্থান ছেড়ে যায় নি; সুতরাং পরে আসার জন্যে আমাদের স্থানাভাব হ'য়ে উঠেছে। এখনো অনেক বেলা আছে, অথচ যাত্রীদল আর

অগ্রসর না হয়ে এখানে কেন সময়ক্ষেপ করছে, জানবার জন্যে বিশেষ কৌতূহল বোধ হ'ল। শুনলাম, আগামীকাল যে পথে চলতে হবে, তার মত ভয়ানক বিপদপূর্ণ রাস্তা বদ্রীনারায়ণের পথে আর নেই; অপরাহ্ণে এ পথে চলা দুরূহ। রাত্রে নিদ্রায় শ্রান্তি দূর করে সকালে এই পথে চলা সুবিধা ও যুক্তিসঙ্গত মনে করে যাত্রীরা আজকের মত এখানেই অপেক্ষা করছে। অল্প কয়েকখানি ঘর তার এমন পরিপূর্ণ মাত্রায় দখল করেছে যে তার মধ্যে একটু পা বাড়াবার জায়গা নাই। লোক যে বড় বেশী তা নয়; তার যদি একটু গোছালভাবে আসনগুলি বিছিয়ে নিত, তা হ'লে প্রত্যেক ঘরে আরও ৫/৭ জনের স্থান হতে পারতো; কিন্তু সন্ন্যাসী বাবাজীরা তীর্থ করতেই এসেছেন এবং নারায়ণ দর্শন করে অনেকখানি পুণ্য সঞ্চয়ই তাঁদের অভিপ্রায়; তাঁরা অনুগ্রহ করে পা দু'খানি একটু গুটিয়ে বসলে সেই পদতলে আমরা যৎকিঞ্চিৎ স্থান পেয়ে এই বরফরাজ্যে কৃতার্থ হয়ে যাই এবং তাঁদেরও পুণ্য–সঞ্চয় হয়, সে কথা বোধ করি তাঁদের ভাববার অবসর হয়নি। এতটুকু অসুবিধা যারা সহ্য করতে প্রস্তুত নয়, তারা যে কেন সন্ন্যাসী হয়েছে তা আমি বুঝতে পারিনে। বলা বাহুল্য, সন্ন্যাসীদের এই স্বার্থপরতা দেখে বেশী রাগ হয়েছিল; কি আমাদের রাত্রিবাসের অনুপায় দেখে বেশী রাগ হয়েছিল, এতদিন পরে ঠিক করে বলতে পারিনে; তবে মনে হয়, গাছতলায় বরফে পড়ে থাকার চেয়ে ঘরে একটু আয়াসে থাকা যায়, আর সন্ন্যাসীগুলো সেই আয়াসের বিষম বিঘ্ন, অতএব আত্ম–সুখের কথাটা পিছনে দাঁড় করিয়ে তাঁদের স্বর্থপরতার উপরই রাগটা বেশী প্রবল হয়ে উঠেছিল। বাস্তবিক কত সময়ে আমরা পরের স্বার্থপরতা দেখে রাগ করি; কিন্তু আমাদের সে রাগও স্বার্থপরতাপূর্ণ। আমাদের মনে হতে লাগলো, যদি আমাদের দেশ, কি আমাদের ইষ্টার্ণ বেঙ্গল ষ্টেটের রেলগাড়ি হতো, তা হলে এখনই পুলিসম্যান ডেকে ওদের গাঁটরি ও বোঁচকা–বুচকি সরিয়ে দিয়ে এত জায়গা করে নিতে পারতুম যে তাতে বসে হাত পা মেলে বিলক্ষণ আরাম করা যেতো। কিন্তু এখানে সে রকম প্রতিকার সম্ভাবনা কিছুমাত্র নেই, কাজেই উপস্থিত রাগটা চাপা দিয়ে বাসার অনুসন্ধানে অন্যত্র প্রস্থান করা গেল।

খানিক ঘুরতে ঘুরতে স্বামীজি ও অচ্যুত ভায়া বসে পড়লেন। আমার শ্রান্তি ক্লান্তি নেই; আমি ভাবলাম, আগে সঙ্গমস্থলটা দেখে আসি, তারপর যা হয় করা যাবে। সঙ্গমস্থলে চললাম। বাজারের পিছনে খানিকটা নীচেই সঙ্গমস্থল, কিন্তু বাজারের পিছনে অল্প একটু নেমেই একেবারে ঠিক সঙ্গমস্থলের মাথার উপরে পাহাড়ের গায়ে একটা খুব নতুন ছোট মন্দির দেখলাম। মন্দিরটি এমন স্থানে নির্মিত যে, এখানে মহাদেব প্রতিষ্ঠা না করে যদি একজন কবিকে প্রতিষ্ঠা করা যেতো, তা হলে ঠিক কাজ করা হতো। বিষ্ণুগঙ্গা ও অলকানন্দা নীচে দিয়ে আনন্দোচ্ছ্বাসের বিপুল কল্লোলে পরস্পরকে আলিঙ্গন করেছে; পাশে ঈষৎ বক্র সমুন্নত বিশাল পর্বত আকাশ ভেদ করে উঠেছে এবং তারই গায়ে এই ক্ষুদ্র মন্দির, প্রকৃতির স্বহস্তনির্মিত চিত্রবৎ। তখন সন্ধ্যার বড় বিলম্ব ছিল না, আলো ও অন্ধকারের কোমল মিলন মন্দিরের শোভন দৃশ্যকে আরও মধুর করে তুলেছিল। আরো অগ্রসর হয়ে দেখলাম, মন্দিরটির পাদদেশ হতে আরম্ভ করে পাহাড়ের গা খুঁদে ছোট ছোট সিঁড়ি তৈয়েরি করা হয়েছে; সিঁড়ি একেবারে সঙ্গমস্থলে এসে পড়েছে। উদ্দাম তরঙ্গ সেই সিঁড়িতে ও পর্বতের কঠিন গায়ে ক্রমাগত আছড়ে পড়ছে। এ পর্যন্ত অনেক সুন্দর দৃশ্য দেখেছি, কিন্তু এই প্রকারের এমন সুন্দর দৃশ্য আমার চক্ষে এই নূতন। মন্দিরের কাছে এসে ইচ্ছা হলো আজ এখানেই থাকি। মন্দিরের বাইরে

খানিকটা বারান্দা বের করা ছিল, তাতে তিন চারজন লোক বেশ থাকতে পারে; কিন্তু কাকেও না দেখে দাঁড়িয়ে ইতস্ততঃ করছি, এমন সময় দেখি সেই দোকানদার বামুন সেখানে উপস্থিত। কথায় কথায় জানতে পারলাম, মন্দির এখন সেই দোকানদারেরই জিম্মায় আছে। আমি তখন সেই মন্দিরে থাকবার অভিপ্রায় প্রকাশ করলাম। সে কিছুতেই রাজি হলো না, কারণ মন্দিরটি নূতন তৈয়ারি হয়েছে, তাতে এখনও দেবতা প্রতিষ্ঠা হয় নি। এক বৎসর হলো ইন্দোরের রাণী এসে এই মন্দির তৈয়ারি করিয়ে দিয়েছেন। এই বৎসর নর্মদাতীর হতে মহাদেবের লিঙ্গমূর্তি এনে মন্দির ও দেবতা উভয়েরই প্রতিষ্ঠা করা হবে।

আমি তো জোর-জবরদস্তি করে মন্দিরের সম্মুখে বসে পড়লাম, সেও কিন্তু নাছোড়বান্দা। যাহোক দুই চারিটি বচন দেওয়ার পর সে আর কোন আপত্তি করলে না। মদিরদ্বারে একটি ছোট ছেলে বসে ছিল, তাকে বাজারে পাঠিয়ে স্বামীজি ও অচ্যুত ভায়াকে ডাকিয়ে আনলাম। স্বামীজি মন্দির ও স্থানের সৌন্দর্য দেখে একেবারে অধীর। বৈদান্তিক পারতপক্ষে কারো প্রশংসা করেন না, কিংবা অল্প কারণে তাঁর হৃদয়ের উচ্ছ্বাস ওষ্ঠের উপকূলে প্রকাশ পায় না; কিন্তু এই সুন্দর স্থান আবিষ্কার করার জন্যে তিনি আমাকে কলম্বসের পাশে আসন দিতে সঙ্কুচিত হলেন না। বাস্তবিক কোথায় আজ স্থানাভাবে এই শীত বরফের মধ্যে অনাবৃত আকাশতলে বাস করার জন্যে তাঁরা প্রস্তুত হচ্ছিলেন, আর কোথায় এই সুন্দর স্থানে দেববাঞ্ছিত-মন্দিরের মধ্যে সুখশয্যা !

মন্দিরের ভিতরটি আটকোণবিশিষ্ট, উপরে যথারীতি চূড়া। দ্বারের সম্মুখে গাড়ী-বারান্দার মত একটা বারান্দা বের করা, তার তিন দিকে বড় বড় কপাট লাগানো; সুতরাং ইচ্ছা করলেই চারিদিক বন্ধ করে বেশ সুরক্ষিত অবস্থায় থাকা যায়।

আমরা মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ না করে আগে যে সিঁড়ির কথা বলেছি, সেই সিঁড়ি দিয়ে সঙ্গমস্থলে নেমে গেলাম। সেখানে - আর শুধু সেখানে কেন - এই মন্দিরের মধ্যে কথা বলতে হলে খুব চেঁচিয়ে বলতে হয়, কারণ জলের এত শব্দ যে কিছুই শুনতে পাওয়া যায় না। বিষ্ণুপ্রয়াগ সমতল স্থানে নয়; দু'দিক হতে যে দুটি নদী আসছে , উভয়েই পাহাড়ের ঢালু গা বেয়ে নামছে, সুতরাং অন্য স্থান অপেক্ষা এখানে নদীর স্রোত এবং শব্দ দুই-ই বেশী। তার উপর যেখানে সঙ্গমস্থল, তার আট দশ হাত উজানে অলকানন্দা একটা পাহাড়ের উপর থেকে লাফিয়ে নীচে পড়ছে সুতরাং এই মন্দিরের সামনে শব্দ আরো বেশী। সমুদ্রগর্জ্জন অনেকেই শুনেছে; অপার জলধির বিপুল গর্জন, বায়ুহিল্লোলে উন্মত্ত তরঙ্গরাশির অসীম মুক্তপ্রদেশে অবাধ নৃত্য এবং তার প্রবল বিক্রম এ সকলের মধ্যে কোমলতা বা সঙ্কীর্ণতা নেই; তাই বুঝি আমাদের ক্ষুদ্র কল্পনা তার ভিতর পড়ে শান্ত, অবসন্ন ও ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়ে; কিন্তু সঙ্গমস্থলের জলের অবস্থা সে রকম নয়। এর অবিশ্রান্ত শব্দে মনে শ্রান্তি আনে না, শান্তি আনে, এই উগ্র শব্দের মধ্যে এমন একটু কোমলতা, এমন একটু মিষ্টতা আছে, যা মর্মস্পর্শী। অনেকক্ষণ শব্দ শুনতে শুনতে বোধ হয় ঘুম আসে; কিন্তু তাই বলে এর বিক্রম কম নয়। সঙ্গমস্থলের এই ঘুর্ণিত ফেনিল জলে নামে কার সাধ্য ? নামতে সাহসই হয় না। দিবারাত্রি জল আলোড়িত হচ্ছে; জলের কাছে গেলে মাথা ঘুরে যায়। ইন্দোরের রাণী মন্দির হতে সিঁড়ি প্রস্তুত করিয়ে তার সব নীচের সিঁড়ির দু'পাশে পাহাড়ের মধ্যে লোহার শিকল বাঁধিয়ে

দিয়েছেন। এই শিকল জলের উপর দোলে, যাত্রীরা এই শিকল ধরে জলস্পর্শ করে, স্নান করবার শক্তি কারো নেই। যাদের মাথা ভাল নয় একটা কিছু গোলমাল দেখলেই সহজে যাদের মাথা ঘুরে উঠে, তাদের এ জলের কাছে যাওয়া উচিত নয়। হিমালয়ের মধ্যে এমন স্থান আছে যাদের সঙ্গে এর তুলনা হতে পারে; কিন্তু সে তুলনা হিমালয়বাসী ছাড়া আর কেউ বুঝবেন কি না সন্দেহ; তার চেয়ে যদি বলা যায়, এ একটা ছোটখাটো নায়েগ্রার মত, তা হ'লে বোধ করি অনেকে বুঝতে পারেন, কারণ বাঙালীর মধ্যে দু'চারজন ছাড়া আর কেউ নায়েগ্রা না দেখলেও অনেকেই তার বর্ণনা পড়ে পড়ে অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। এই সঙ্গমস্থল নায়েগ্রার একটা ছোট প্রতিকৃতি বললেই বোধ হয় বর্ণনা ষোল আনা রকম হয়। এতে যিনি সন্তুষ্ট নন, তাঁকে সঙ্গে করে আমি পাহাড় পর্বত ভেঙে বরং এখানে আসতে রাজী আছি, কিন্তু বর্ণনা দিতে সম্পূর্ণই অক্ষম।

সমস্ত দেখে-শুনে আমরা উপরের সেই মন্দিরে এসে উপস্থিত হলাম। যাবার সময় দেখে গিয়েছিলাম মন্দিরের ভিতরের দ্বার বন্ধ, এখন দেখি দ্বার খোলা। একটা আট নয় বছরের ছেলে সেই উন্মুক্ত দ্বারের কাছে বসে আছে। ভিতরের দিকে চেয়ে দেখলাম ভবিষ্যতে যেখানে শিবমূর্তি স্থাপিত হবে, সেইখানে একটা কাঠের ছোট চৌকীর উপর তেল সিঁদুর মাখানো পাথরের খোদা কয়েকখানি মূর্তি; তেল সিঁদুরের প্রসাদে তাঁরা পুরুষ কি স্ত্রী, মানুষ কি আর কিছু, কিছুই বুঝবার উপায় নেই! মন্দিরের মালিক এখানে আসেন নি, তাই এই বালক নিখরচায় তার পুতুলগুলিকে মন্দিরের মধ্যে বসিয়ে অনায়াসে দু'চার পয়সা রোজগার করছে। পরে যখন মন্দিরের প্রকৃত অধিকারী এসে উপস্থিত হবেন, তখনই এই দেবতারা অন্যান্য জাতিভায়ার মত বৃক্ষতলে আশ্রয় করবেন। জিজ্ঞাসা করে জানলাম, বালকটি আমাদের সেই লুচিওয়ালা বামুনঠাকুরের ছেলে। এদের বাড়ী যোশীমঠে। ছেলেটির সঙ্গে গল্প জুড়ে দেওয়া গেল। এদিকে বৈদান্তিক ভায়া দোকানদারকে পুরী প্রভৃতি ফরমাইস দিলেন। যে পরিমাণ জিনিষ তিনি ফরমাইস দিলেন, তাতে আমাদের স্বামীজির চার পাঁচ দিন চলতো এবং যদি বৈদান্তিকের উদরের পরিমাণ সম্বন্ধে আমার অভিজ্ঞতা না থাকতো, তা হলে মনে করতাম ভায়া এই তীর্থস্থানে বুঝি আট দশ জন সাধু সন্ন্যাসীকে খাইয়ে স্বর্গের পথ কিঞ্চিৎ প্রশস্ত করবার চেষ্টায় আছেন। কিন্তু তিনি তেমন লোক নন, পুণ্যার্জনের জন্যে তিনি সর্বত্যাগ করেছেন; কিন্তু উদরের জন্যে তিনি এই পুণ্যের কিয়দংশ ত্যাগ করতে প্রস্তুত।

সন্ধ্যা হয়ে এল। অন্ধকার হয়েছে দেখে ছেলেটি উপরে উঠে গিয়ে বাজার থেকে ঘি-সলতে প্রদীপ নিয়ে এল; তাই বুঝতে পারলাম মন্দিরের বর্তমান অধিবাসিগণ প্রত্যহ প্রদীপের মুখ দেখতে পান না। আজ আমাদের কল্যাণে তাঁরা একটু দেবত্ব উপভোগ করে নিলেন। শুধু ঘি-সলতে নয় ছেলেটি যথারীতি আড়ম্বর করে ঠাকুরের আরতি করলে; তারপর আবার উপরে দোকানে গিয়ে খানকতক লুচি আর খানিকটা গুড় এনে ঠাকুরের ভোগ দিলে; বলা বাহুল্য আমাদের জন্যে তার বাপ যে লুচি তৈয়ারি করেছিল, মন্দিরের ঠাকুরমশায়েরা তাতেই ভাগ বসালেন। ভোগ হয়ে গেলে ছেলেটি আমাদের প্রসাদ দিতেও ত্রুটি করলে না। এতদবস্থায় সে বালককে যৎকিঞ্চিৎ না দেওয়া ভাল দেখায় না, সুতরাং তাকে কিছু দেওয়া গেল। সে তা প্রণামী শ্রেণীভুক্ত করে বকসিসের জন্যে জেদ করতে লাগলো! কায়দা মন্দ নয়। বৈদান্তিক ভায়া বললেন, এখন

ঐ পর্যন্ত থাক, ফিরে আসবার সময় বক্‌সিসের ব্যবস্থা করা যাবে। বোধ হয় আমাদের আর বিরক্ত করা সঙ্গত নয় মনে করে সে মন্দির ত্যাগ করে চলে গেল এবং যাবার সময় প্রদীপ নিবিয়ে 'তুমি যে তিমিরে, তুমি সে তিমিরে' করে দোরে তালা লাগিয়ে গেল। সে সেই রাত্রে এই চড়াই উঠে যোশীমঠে যাবে। কি সাহস! বাঙালী বালক দূরের কথা, বাঙালী সাহসী যুবকও এ কাজে প্রবৃত্ত হতে সাহস করেন না। এ জন্যে একবার আমাদের নিজেকে নিন্দা করবার জন্য মনটা একটু ব্যস্ত হয়ে উঠেছিল, কিন্তু ভেবে দেখলাম এ বালকের এই অভ্যাস ও শিক্ষা অনেক দিনের। পর্বত-ক্রোড়ে প্রতিপালিত এই সকল বালক-বালিকা মাতৃক্রোড় থেকে পর্বতক্রোড়ে প্রথম পদক্ষেপ করেই এই রকম কষ্টসহ নির্ভিক হতে চেষ্টা করেছে, - তাই বুঝি একজন য়ুরোপীয় কবি বলেছেন পর্বত স্বাধীনতার প্রসূতি। কিন্তু আমরা কেমন করে সাহসী, কষ্ট সহিষ্ণু হতে শিক্ষা করবো ? ছেলেবেলায় চলতে চলতে দৈবাৎ যদি পদস্খলিত হতো, তা হলে মা দৌড়ে এসে গায়ের ধুলো ঝেড়ে দিতেন এবং মাটিতে লাথি মেরে বুঝিয়ে দিতেন আমার কোন দোষ নেই, যত দোষ মাটির; সেই তাঁর যাদুকে গড়াগড়ি খাইয়েছে। তারপর বড় হয়ে হারিকেন লণ্ঠন ছাড়া চলতে শিখিনি এবং ঠাকুরমার রোমাঞ্চকর ভূতের গল্প শুনে নিজের লম্বা ছায়াকেও বিকট ভূত মনে করে কতদিন চীৎকার করেছি; সুতরাং আমাদের সঙ্গে এদের কি রকমে তুলনা হতে পারে ?

আমরা আহারাদি করে মন্দিরে শয়নের উদ্যোগ করতে লাগলাম। পাঠক পাঠিকা আমাকে ক্ষমা করবেন, এই আহারের পূর্বে আমার ডাইরিতে এমন একটা ব্যাপারের কথা আছে, যা এখানে উল্লেখ করায় সম্পূর্ণ আপত্তি ছিল, কিন্তু আমার এই ডায়রী নকল করবার সময় আমার কাছে আমার একটি আত্মীয়া বসে ছিলেন। এই ব্যাপারটি গোপন করাতে তিনি আমার উপর এমন গঞ্জনা আরম্ভ করলেন যে, আমি সেটি উল্লেখ না করে থাকতে পারছিনে, বিশেষ তাঁর অনুরোধ উপেক্ষণীয় নয়। ব্যাপারটি তেমন কিছু গুরুতর নয় একটু চা খাওয়া মাত্র। বিষ্ণুপ্রয়াগে এই শীতের মধ্যে একটু গরম হবার অভিপ্রায়ে, যোশীমঠ থেকে কিঞ্চিৎ চা সংগ্রহ হয়েছিল; সন্ধ্যার পরে বিশেষ আয়েস করে সেই চা পান করা গিয়েছিল। তাতে আমাদের যা তৃপ্তি হয়েছিল, তা বর্ণনাতীত; এবং স্বামীজি চা-পানের উপসংহারে যে "আঃ" বলে আরামজ্ঞাপক শব্দ উচ্চারণ করেছিলেন, তা অনেকদিন মনে থাকবে। আমরা সন্ন্যাসী মানুষ; তবু আমাদের এই পর্বতের মধ্যে কাত্‌লির অভাবে লোটাতে জল গরম করে চিনির অভাবে গুড় দিয়ে, চা-খাওয়ার বিড়ম্বনা কেন, এই মনে করে যদি কোন বিদ্রূপপরায়ণা পাঠিকা নাসিকা কুঞ্চিত করেন, এই ভয়ে এই চা খাওয়ার বৃত্তান্তটি বেমালুম গোপনের চেষ্টায় ছিলাম, কিন্তু ঘরের ঢেঁকি কুমীর হলেই বিপদ। যা হোক এই ব্যাপার প্রকাশ করতে বাধ্য করায় আমি তাঁর উপরে রাগ করেছিলাম, কিন্তু তাতে তিনি আমাকে যে গল্প শুনিয়ে দিয়েছিলেন, তাতে আমি বড়ই জব্দ হয়েছিলাম। তিনি বললেন, একবার পুরুষোত্তমে এক সন্ন্যাসী একখানা ইঁট মাথায় দিয়ে শুয়ে ছিল। কতকগুলি যাত্রী সেই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। তাদের মধ্যে একজন তার সঙ্গীদের ডেকে বললে, "একবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের সুখ দেখ, যদি উঁচু জায়গায় মাথা না রাখলে শোয়া না হয়, ত সন্ন্যাসী না হলেই হ'ত"! সন্ন্যাসী এই কথা শুনে ইঁটখানি দূরে ফেলে দিয়ে শুধু মাথায় শয়ন করলে। তাতেও বেচারার অব্যাহতি নেই। পূর্বকথিত যাত্রী বলে উঠলো, "হুঁ, সুখটুকুও আছে, রাগটুকুও আছে "। আগে যদি জানতাম কিছুদিন বাদে আমাকে এমন একটা বিড়ম্বনা

সহ্য করতে হবে, তা হলে কখন বিষ্ণুপ্রয়াগের সেই মন্দিরে বসে চা খাবার যোগাড় করতাম না। বুঝলাম ভগবান মানুষকে সর্বজ্ঞ না করুন, নিদেন দু'এক জায়গায় ভবিষ্যতজ্ঞ না করে কাজ ভাল করেননি।

আহারাদির পর স্বামীজি ও বৈদান্তিক শয়ন করলেন। আমার চক্ষে ঘুম নেই। মন্দিরের মধ্যে ঘোর অন্ধকার, সমস্ত জগৎ নিস্তব্ধ, কেবল মন্দিরের নীচে সঙ্গমস্থল হতে জলের 'হু হু' শব্দে নৈশ-নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে দিচ্ছে। কম্বলটা মুড়ি দিয়ে ধীরে ধীরে বাইরে এলাম। তখন রাত্রি অধিক হয়েছিল এবং আকাশে শুক্লপক্ষের ক্ষীণ চন্দ্রের উদয় হয়েছিল। বিজন পার্বত্য-প্রদেশ ঘুমন্ত, তার উপর চন্দ্রের মৃদু রশ্মি ব্যপ্ত হয়ে পড়েছে। আমি আস্তে আস্তে অতি সাবধানে মন্দিরের সিঁড়ি দিয়ে জলের ধারে এলাম এবং অনেকষণ সেখানে বসে রইলাম। অতি সুন্দর মধুর রাত্রি, যদি এত শীত না থাকতো ! ছোট ছোট ধাপে তার নির্মল জল আছড়ে পড়ছে আর ফেনিল আবর্তের উপর জ্যোৎস্না পড়েছে, ঠিক যেন একটা সুন্দর ছবির মত দেখাতে লাগলো। গভীর রাত্রে এই অবিরাম শব্দ-উচ্ছৃঙ্খল ভাব যেন আকুলভাবে বলতে লাগলো :

> '' এ আবেগ নিয়ে কার কাছে যাব,
> নিতে কে পারিবে মোরে !
> কে আমারে পারে আঁকড়ি রাখিতে
> দুখানি বাহুর ডোরে।
> আমি কেবল গাই কাতর গীত !
> কেহ বা শুনিয়া ঘুমায় নিশীথে,
> কেহ জাগে চমকিত !
> কত যে বেদনা, সে কেহ বোঝে না,
> কত যে আকুল আশা,
> কত যে তীব্র পিপাসাকাতর ভাষা !''

অনেকক্ষণ এখানে বসে থাকলাম। যতক্ষণ বসেছিলাম বোধ হয়েছিল বুঝি জেগে জেগেই স্বপ্ন দেখছি; যেন মৃত্যুর আবরণ ভেদ করে এক মহাজীবনের অমর প্রান্তে এসে লেগেছি। এখন ভাসতে ভাসতে কোথায় যাব কে জানে ?
অনেক রাত্রে স্বস্থানে এসে শয়ন করলাম এবং অল্পক্ষণের মধ্যেই গভীর নিদ্রায় অভিভূত হয়ে পড়লাম।

পাণ্ডুকেশ্বর

২৮ এ মে বৃহস্পতিবার। ইতিপূর্ব্বে যে ভয়ানক রাস্তার কথা বলেছি, আজ সেই রাস্তায় চলতে হবে। এতদিন ত ভয়ানক ভয়ানক পথই দেখে আসা গেল। আরো ভয়ানক ! আমার ত তার একটা ধারণাই হলো না। এখন যদি কোন পথে গাড়ীর চাকার মত গড়িয়ে যাওয়া যায়, তা হ'লে একটা নূতন রকমের ভয়ানক হবে বলে বোধ হয়। যাহোক এই রাস্তার ভয়ানকত্ব জানবার জন্যে মনের মধ্যে কিঞ্চিৎ আগ্রহ জন্মালো।

বিষ্ণুপ্রয়াগ হ'তে বদ্রীনারায়ণ বারো ক্রোশ অর্থাৎ আঠারো মাইল। এ দেশের এক ক্রোশ দেড় মাইল; কিন্তু এইবার এক ক্রোশকে - ''ডালভাঙ্গা'' ক্রোশ বলা যেতে পারে। আমাদের শহরাঞ্চলের পাঠকমহাশয়দের বোধ হয় ডালভাঙ্গা ক্রোশের সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা নেই। বাঙ্গালীর কোন কোন জেলার পথিকের গন্তব্যস্থানে রওনা হবার সময় গাছের ডাল ভেঙ্গে তা হাতে নিয়ে চলতো। পথ চালতে চলতে রৌদ্রের উত্তাপে যখন এই ডালের পাতাগুলি শুকিয়ে যেত, তখনই এক ক্রোশ পথ বলা হত - তা আট ক্রোশ যাওয়ার পরই ডাল শুকোক কি দশ ক্রোশ পরই শুকোক। বদ্রীনারায়ণের এই বার ক্রোশ আমাদের দেশের ''আট বারং ছিয়ানব্বই'' ক্রোশের ধাক্কা।

রাস্তায় বের হয়ে ধীরে চলা আমার শাস্ত্রে লেখে নাই। তখন বঙ্কিমবাবুর সীতারামের দুই সন্ন্যাসিনী জয়ন্তী ও শ্রী পুরুষোত্তম দর্শনাকাঙ্খায় যাচ্ছিলেন, সেই সময় শ্রীকে কিছু দ্রুতগামিনী দেখে জয়ন্তী বলেছিলেন, ''ধীরে চ বহিন্, তাড়াতাড়ি চল্লে কি অদৃষ্টকে ছাড়াতে পারবি?'' - তাড়াতাড়ি চল্লে যদি অদৃষ্টকে ছাড়ান যেতো, এতদিন এ দগ্ধ অদৃষ্ট অনেক পেছনে পড়ে আর কোন পথিকের স্কন্ধাবলম্বনের অবসর খুজতো। কিন্তু তা ত হবার নয়, অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফেরে এবং তা জেনেও আমি তাড়াতাড়ি চলি; অভিপ্রায়, অদৃষ্টে যা কিছু আছে শীঘ্র শীঘ্র ঘটে যাক; তারপর দিনকতক একটু বিশ্রাম ভোগ করা যাবে। বৈদান্তিক ভায়াও আমার তাড়াতাড়ি চলার একটা ভাল রকম কৈফিয়ৎ চেয়েছিলেন। সেবার তাঁকে আমি এই কৈফিয়ৎ দিয়েছিলাম ; তাতে তিনি আমাকে যে সম্ভাবনা জানিয়েছিলেন, তার মধ্যে কতখানি বেদান্ত ও কতটুকু মায়াবাদ ছিল, তা ঠিক করতে পারি নি। যাই হ'ক, কিন্তু তাঁর গল্পে একটু নূতনত্ব ছিল এবং পথ চলতে সেই নূতনত্বটুকু বেশ আমোদজনক বোধ হয়েছিল। আমার সহৃদয় পাঠকগণকে আমি সে রস হতে বঞ্চিত করতে চাইনে, কারণ সেটা সাধুর লক্ষণ নয়।

বৈদান্তিক ভায়া বললেন, ''আমি যে অদৃষ্টের ভোগটা তাড়াতাড়ি কাটিয়ে দিনকতক আরাম ভোগের উচ্চাকাঙ্খায় স্ফীত হচ্ছি, তা আমার মত বিরক্ত মূঢ় নূতন সন্ন্যাসীর কাছে বড় সহজ ব'লে বোধ হ'লেও, কাজে তা বিলক্ষণ কঠিন। যার ললাটে আরাম ভোগের কক্ষে শূণ্য অঙ্ক লেখা আছে, সে কি ঋণ ক'রে আরাম ভোগ করবে ? আরাম-বিরামের রাজ্যে দেনা পাওনার কারবার থাকলে অনেক রাজা-রাজড়া অতি উচ্চ দাম দিয়ে এই জিনিসকে কিনতেন। কিন্তু ভগবানের মর্জ্জি অন্য রকম।'' বাস্তবিক অদৃষ্ট জিনিসটা বড়ই খারাপ, শুধু ইহলোকে নয় পরলোকের পার পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে ছোটে; এবং তার জন্যে কোন মুটে বা কুলীর আয়োজন করতে হয় না। দৃষ্টান্তস্বরূপ ভায়া বললেন, -''উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের একজনের কাকচরিত্র বিদ্যায় খানিকটা অভিজ্ঞতা ছিল। লোকটা একদিন শ্মশানের কাছ দিয়ে যেতে যেতে দেখলে, একটা অনেকদিনের পুরানো মড়ার মাথা প'ড়ে রয়েছে। সেই নর-কপালের সাদা সাদা অক্ষরগুলোর উপর লোকটার নজর পড়লে-

> ''ভোজনং যত্র তত্রৈব শয়নং হট্টমন্দিরে,
> মরণং গোমতীতীরে অপরং বা কিং ভবিষ্যতি।''

লোকটা শুধু কাকচরিত্রই যে জানত তা নয়, একটু বুদ্ধিবৃত্তিরও ধার ধারতো। ''অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি'' প'ড়ে তার মনে কৌতূহল হ'লো, এর পরে আর কি হয় জানতে হবে। মরে গিয়েছে, শ্মশানে মাথার খুলিটে শুধু পড়ে রয়েছে, এখনও ''অপরম্বা কিং ভবিষ্যতি?'' পণ্ডিত মরার মাথাট কুড়িয়ে বাড়ি এনে তা একটা হাঁড়িতে পুরে একটা নির্জন স্থানে টাঙ্গিয়ে রাখলে। আরও নূতন কিছু হলো কি না পরীক্ষার জন্যে প্রায়ই হাঁড়ির মুখ খুলে দেখে। একদিন পণ্ডিত কার্যোপলক্ষে দু–চার দিনের জন্যে বিদেশ যাত্রা করলে পর, কৌতূহলাবিষ্টা পণ্ডিতপত্নী সেই হাঁড়ির মুখ খুলে দেখলেন, একটা নর–কপাল তার মধ্যে পরম সমাদরে রক্ষিত হয়েছে। পণ্ডিতের যিনি সহধর্ম্মিণী, তাঁর পক্ষে এই নরকপাল দেখে তার প্রকৃত তথ্য অনুমান করে নেওয়া অবশ্য নিতান্ত সহজ ব্যাপার হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত করলেন, আর কিছুই নয়, পণ্ডিতজীর বোধ হয় কোন প্রিয়তমা ছিল; তার মৃত্যু হওয়াতে বিরহক্লিষ্ট পণ্ডিতবর তার মস্তকটি কুড়িয়ে এনে এইরূপ সঙ্গোপনে হাঁড়ির মধ্যে রেখে দিয়েছেন; এবং কঙ্কালবশেষখানি দেখেই দুঃসহ বিরহজ্বালা প্রশমন করেন। পণ্ডিতপত্নীর দুর্জয় ক্রোধ এবং অভিমানের উদয় হ'লো। পণ্ডিত সশরীরে সেখানে বর্তমান থাকলে বোধ হয় তিনি সম্মুখ যুদ্ধে আহূত হতেন। সে বিষয়ে আপাততঃ কিঞ্চিৎ বিলম্ব দেখে পণ্ডিতপত্নী সেই নর–কপালখানি হাঁড়ি থেকে বের করে ঢেঁকিতে চূর্ণ করে একটা পচা নর্দমার মধ্যে নিক্ষেপ করলেন। পণ্ডিত গৃহে ফিরে সর্ব্বপ্রথমেই হাঁড়ি দেখতে গিয়ে দেখেন হাঁড়িও নেই কঙ্কালও নেই। ব্যস্ত হয়ে গৃহিণীকে জিজ্ঞাসা করলেন, হাঁড়ি কোথায়? পত্নী পণ্ডিত মহাশয়কে বিরহ–ব্যাথায় অত্যধিক ব্যাকুল করবার অভিপ্রায়ে সমস্ত কথা সবিস্তারে বলে প্রিয়তমার কপালে দুরাবস্থা দেখাইবার জন্যে নর্দ্দমার কাছে হাত ধরে নিয়ে গেলেন। পণ্ডিতের কিন্তু চক্ষুস্থির ! –'অপরং বা কিং ভবিষ্যতি' এই রকম ভাবে ফলবে তা কে জানতো ?

বৈদান্তিক বললেন, মরণের পরও যখন অদৃষ্ট সঙ্গে সঙ্গে ফেরে, তখন আমার সুখভোগের আশাটা অলীক মাত্র। বৈদান্তিকের আর কোন ক্ষমতা না থাক, তিনি মনটাকে বেশ দমিয়ে দিতে পারেন; কিন্তু আমার তাতে বড় আসে যায় না। গল্প করতে করতে রাস্তায় বেড়িয়ে পড়া গেল। উপক্রমণিকাতেই স্বামীজি আমাকে খুব ধীরে চলবার জন্যে অনুমতি করলেন; এবং আজ যদি তাড়াতাড়ি চলি, তা হলে আমার অসুখ হতে পারে বলে ভবিষ্যৎ বাণী করতেও ছাড়লেন না; কিন্তু তাঁর তেমন দর হলো না।

আমরা খানিকদূর অগ্রসর হয়ে একটা কাঠের সাঁকো দিয়ে অলকানন্দা পার হলাম। সাঁকোটির উপর দিয়ে যেতে বড়ই ভয় করতে লাগলো। ইংরেজের তৈরী লোহার সাঁকোর উপর দিয়ে বেশ সগর্ব্বে চলে যাওয়া যায়; কিন্তু পাহাড়ী কারিগরের তৈয়েরি এই কাঠের সাঁকোর কাছে এসে আমার সেকালের লছমনঝোলার কথা মনে পড়লো। বাস্তবিক এমন খারাপ সাঁকো আমি এ পর্যন্ত একটাও দেখি নি। যা হোক অতি সাবধানে সাঁকোটা পার হওয়া গেল। খানিক দূরে এগিয়ে যখন পেছন ফিরে চাইলাম, তখন সঙ্গীদের কাকেও দেখতে পেলাম না। এই বাঁকা রাস্তায় পঞ্চাশ হাত এগিয়ে গেলে আর কাকেও বড় দেখবার যো নেই।

সাঁকো পার হয়ে রাস্তার ভীষণতা বুঝতে পারলাম। এ পর্যন্ত অনেক ''চড়াই উৎরাই'' দেখেছি, কিন্তু এমন ''চড়াই উৎরাই'' আর কোন দিন নজরে পড়ে নি। বরাবর শুধু চড়াই আর উৎরাই। বহুকষ্টে আধ মাইল চড়াই উঠলাম; ওঠা যেই শেষ হলো অমনি চড়াই আরম্ভ; নাগরদোলার মত কেবল চড়াই আর উৎরাই। সমান জমি, কি সামান্য উঁচু নীচু রাস্তা মোটেই নেই। এই রকম তিন চারটে চড়াই উৎরাই পার হলেই মানুষের জীবাত্মা ত্রাহি মধুসূদন ডাক ছাড়ে। আমি কতবার ক্রমাগত সাত আট মাইল চড়াই উঠেছি, কিন্তু কখনও এমন কষ্ট হয় নি। একবার উঠা, তার পরেই নামা, এতে যে কি কষ্ট তা বুঝান সহজ নয়। বুকের হাড় ও পাঁজরগুলো যেন চড় চড় করে ভেঙ্গে যায়। তার সঙ্গে সঙ্গে আবার সর্বনেশে তৃষ্ণা; এই মাত্র ঝরণার জল খাওয়া গেল, পরক্ষণেই মুখ নীরস, গলা শুকনো, যেন কতকাল জল খাওয়া হয় নি; বুকের মধ্যে কে যেন মরুভূমি সৃষ্টি করে রেখেছে। তবে সুখের মধ্যে, এই পথে যত ঝরণা, এত ঝরণা আর এ পাহাড়-রাজ্যের কুত্রাপি দেখিনি; আর এত ঝরণা আছে বলেই এ পথে মানুষ চলাফেরা করতে পারে।

রাস্তায় চলতে আরম্ভ করে গন্তব্য স্থানে না পৌঁছিয়ে আর আমি কখন বিশ্রাম করিনে, কিন্তু এ ভয়ানক পথে এ রকম জিদ বজায় থাকলো না। চলি আর বসি এবং ঝরণা দেখলেই সেখানে গিয়ে অঞ্জলি পূরে জল খাই। রাস্তায় চার পাঁচবার বিশ্রাম করে এবং দশ বার বার জল খেয়ে শরীরের সঙ্গে শক্তির সঙ্গে আর এই বিষম পথের সঙ্গে প্রবল যুদ্ধ করতে করতে আট মাইল দূর পাণ্ডুকেশ্বরে উপস্থিত হলাম। বেলা তখন প্রায় নয়টা। এতখানি রাস্তা আমি তিন ঘণ্টায় এসেছি। শুনলাম, যে সকল সন্ন্যাসী পাহাড়-ভ্রমণে অত্যন্ত অভ্যস্ত তাঁহারাও পাঁচ ছয় ঘণ্টার কম বিষ্ণুপ্রয়াগ হতে পাণ্ডুকেশ্বরে আসতে পারে না। খুব অল্প সংখ্যক পাহাড়ী জোয়ানেরাই তিন ঘণ্টায় এ রাস্তা হাঁটতে পারে। আজ এই ভয়ানক দুর্গম রাস্তা অতিক্রম করতে একজন দুর্ব্বল বঙ্গ-সন্তান, প্রবল-বিক্রম, বলিষ্ঠ দেহ পাহাড়ীর সমকক্ষ হয়ে উঠেছে মনে করে অহঙ্কারে আমার বুকখানা দশ হাত হয়ে উঠলো; এবং নিজেকে অদ্বিতীয় বঙ্গবীর স্থির করে যথেষ্ট আত্মপ্রসাদ ভোগ করা গেল। কিন্তু হায় সকলে আমার মত বাঙালী নয়; বঙ্গভূমির মুখ উজ্জ্বলও সকলের দ্বারা সম্ভব নয়। আমি অমিত পরাক্রমে তিন ঘণ্টায় বিষ্ণুপ্রয়াগ থেকে পাণ্ডুকেশ্বরে এলাম বটে, কিন্তু স্বামীজি ও বৈদান্তিক কারো দেখা নেই। এ বেলা তাঁরা আসতে পারেন, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ হল। তাঁরা দেখছি বাঙ্গালীর নাম রাখতে পারলেন না।

কি করা যায়; পাণ্ডুকেশ্বরে এসে একটু ঘুরে বেড়ান গেল। প্রথমেই পাণ্ডুকেশ্বরের নাম-রহস্য জানবার জন্য কৌতূহল হল। শুনলাম, এখানে মহারাজ পাণ্ডু দীর্ঘকাল যাবৎ তপস্যা করেছিলেন, তাই এ স্থানের নাম ''পাণ্ডুকেশ্বর ''। এখানে একটা খুব প্রাচীন মন্দির দেখতে পেলাম। বদ্রীকাশ্রমের রাস্তায় এ পর্যন্ত যতগুলি মন্দির দেখেছি, তার মধ্যে দুটির মত প্রাচীন মন্দির আর আমার নজরে পড়ে নি; একটি হৃষিকেশে আর একটি এই পাণ্ডুকেশ্বরে। অনেক কালের পুরাণ বলে মন্দিরটার খানিক অংশ মাটির মধ্যে বসে গিয়েছে। মন্দিরের পাশে ছোট ছোট চার পাঁচটা পাথরের কোটাবাড়ী আছে, সেগুলির জীর্ণ অবস্থা; নানা রকমের গাছপালা তাদের মাথার উপর সগর্বে দাঁড়িয়ে

রয়েছে। গাছাগুলিই কি অল্প দিনের ? তাদের মোটা মোটা শিকড়গুলি পাথরের মধ্যে প্রবেশ করতে কতকাল লেগেছে। এই সকল মন্দিরের সংস্কারের কোন সম্ভাবনা নেই; আর বিশ পঁচিশ বছর পরে সমস্ত ভেঙে পড়ে যাবে, এবং এগুলি কি ছিল তা জানবার পর্যন্ত উপায় থাকবে না। এ রকম ভাঙা স্তূপ আমরা এ পর্যন্ত কত দেখেছি; সেগুলি উদাসীন চোখের সামনে দু'দণ্ডের বেশী স্থায়িত্ব লাভ করে নি; কিন্তু এক কালে সে সমস্ত স্তূপ যে কত গৌরব, কত পবিত্রতা এবং মহিমার অখণ্ড বাসস্থান ছিল, তা ভাবলে মনের মধ্যে একটা সঙ্কোচপূর্ণ ভক্তির আবির্ভাব হয়। মনে হয় জীবন ও মৃত্যু শুধু জীবজগৎকেই যে আচ্ছন্ন করে আছে তা নয় এই জড়জগতের বহু দ্রব্য ও জীবিতের ন্যায় উচ্চ সম্মান এবং প্রবল খ্যাতি লাভ করে; কিন্তু কালক্রমে তাদের মৃত্যু হলে, তখন তাদের মান সম্ভ্রম, খ্যাতি প্রতিপত্তি সমস্তই শৈবালাচ্ছাদিত ইষ্টক বা প্রস্তর–স্তূপের নিম্নে সমাহিত হয়ে যায় এবং দর্শকগণ কদাচিৎ তাদের দিকে একবার চক্ষু ফিরিয়ে অতীত গৌরবের কথা চিন্তা করে।

পাণ্ডুকেশ্বর বাজারটি নিতান্ত ছোট নয়; কিন্তু যদি বার মাস এখানে লোক বাস করতে পারতো তা হলে বাজারটি আরও ভাল হত। লোকে গ্রীষ্মের চার পাঁচ মাস মাত্র এখানে বসবাস করতে পারে, দোকানেও কেবল সেই কয় মাস খরিদবিক্রী হয়। শীত পড়তে আরম্ভ হলে দোকানী পসারী এবং বাসিন্দা লোকজন বিষ্ণুপ্রয়াগ, যোশীমঠ প্রভৃতি স্থানে উঠে যায়। গ্রীষ্মের প্রারম্ভে আবার সকলে ফিরে এসে নিজ নিজ আড্ডা দখল করে বসে। এতদিন এ স্থানটা জনসমাগমশূণ্য ছিল, আজ কয়েকদিন হতে আবার লোক জুটতে আরম্ভ হয়েছে। কারণ এখানে গ্রীষ্মের সূত্রপাত মাত্র। গ্রীষ্মের সূত্রপাত শুনে পাঠক মনে করবেন না, আমাদের দেশে ফাল্গুন মাসের শেষে যে অবস্থা হয়, এখানেও সেই রকম। মাঘমাসের শীতের তিন গুণ শীত কল্পনা করে নিলে এ শীতের খানিকটা আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু শীতকালের অবস্থা আমরা কিছুতেই কল্পনা করে উঠতে পারিনা – তা আমাদের কল্পনাশক্তি যতই প্রবল হক। এখন বরফ গলছে আর সহরগুলি বরফের মধ্যে থেকে ধীরে ধীরে প্রকাশিত হচ্ছে। এ দৃশ্য বড়ই সুন্দর। শীতকালে সমস্ত বরফ ঢাকা থাকে। একটা স্থান দেখলাম, সমস্ত বরফ ঢাকা; একদিন পরেই দেখা গেল বরফ গলে গলে তার মধ্য থেকে একটা দীর্ঘচূড়া প্রকাণ্ড মন্দির বের হয়ে পড়েছে। হঠাৎ এই রকম পরিবর্তন দেখলে মনে মনে ভারি আনন্দ হয়। আমি চলতে চলতে দেখছি শহরের অনেক স্থান অনেক পথ এখনো বরফে ঢাকা রয়েছে; স্থানে স্থানে বা বরফ গলছে, আর তার ভিতর থেকে ঘাস বেরিয়ে পড়ছে। চারিদিক শাদা, মধ্যে মধ্যে নবীন তৃণ মাথা তুলে দিয়ে চারিদকের তুষার–ধবল স্তূপের মধ্যে অনেকখানি নতুনত্ব বিস্তার করেছে।

ঘুরে ঘুরে একটা দোকানঘরে এসে বসলুম। দশটা বেজে গিয়েছে; এখনও সঙ্গীদের দেখা নেই। এই অপরিচিত জনবিরল স্থানে একা বড়ই কষ্ট বোধ হতে লাগলো; সঙ্গীদের জন্যও ভাবনা হতে লাগলো।

ক্রমে যত বেলা বাড়তে লাগলো, ততই শরীরের মধ্যে গরম বোধ করতে লাগলুম। বোধ হতে লাগলো যেন শরীরের মধ্য দিয়ে আগুন ছুটে বেরোচ্ছে। আমি আর বসে থাকতে পারলুম না, কম্বল মুড়ি দিয়ে সেই দোকানই শুয়ে পড়লুম। ক্রমে এমন মাথা ধরলো যে তা আর বলবার নয়; মনে হলো মাথার মধ্যে কে ক্রমাগত হাতুড়ির বাড়ি

মারছে। চোখ দুটি বের হবার উপক্রম হল এবং বুকের মধ্যে এমন যন্ত্রণা যে শ্বাসরোধের আশঙ্কা হতে লাগলো, স্থির হয়ে থাকতে পাড়লুম না, যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলুম। শুয়ে থাকি তাতেও কষ্ট, উঠে বসি তারও উপায় নেই; তার উপর এমন জায়গায় এসে পড়েছি যে, আমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করে, এমন লোকও একটি নেই। যে দোকানে পড়ে রয়েছি, সে দোকানদার এখনও নীচে থেকে এসে পৌঁছে নি। পিপাসায় প্রাণ ওষ্ঠাগত; অদূরে ঝরণা, কিন্তু সাধ্য নেই উঠে গিয়ে একটু জল খেয়ে আসি। অল্পক্ষণ পরে বমি আরম্ভ হলো, সঙ্গে সঙ্গে পিপাসারও বৃদ্ধি হলো। এই দারুণ পথে বেড়াতে বেড়াতে অনেকবারই আসন্ন মৃত্যুর হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছি; কিন্তু মনে হলো যেন আজ আর অব্যাহতি নেই। এই মহাপ্রস্থানের পথে একটা ব্যর্থ জীবন তার অলসমধ্যাহ্নেই কি আয়ুর শেষপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলো ? হায়, আজ সকালেও জানতুম না এই নির্জ্জন স্থানে, সঙ্গীন অবস্থায় এ রকম ভাবে প্রাণ-বিয়োগ হবে। শারীরিক যাতনার সঙ্গে এইরূপ মানসিক চিন্তার উদয় হওয়ায় প্রাণ আরও ছটফট করতে লাগলো। মৃত্যুভয়ে যে বেশি কাতর হয়েছিলুম, এমনও বলতে পারিনে। দুঃখ, কষ্ট, অশান্তি, যন্ত্রণা কিসের অভাব আছে, যার জন্যে মৃত্যুর শান্তি এবং নিরুদ্বেগ তুচ্ছ জ্ঞান করবো ? তবে এত যন্ত্রণাতেও যে বেঁচে থাকতে ইচ্ছা হচ্ছে, এটাও স্বীকার করতে পারছিনে। আসল কথা আমাদের জীবনের প্রতিদিনের এই অভ্যস্ত স্রোত এবং সুখ-দুঃখ-হাসি-কান্নার চক্রের মধ্যে হঠাৎ যে অজ্ঞাত, পরীক্ষাতীত, রহস্যসংকুল ঘটনার নূতনত্ব এসে সমস্ত গোল করে দেবে, এবং বর্তমানের সমাপ্তি হয়ে যাবে, এ দেখতে আমরা রাজী নই; তাই হাজার দুঃখেও আমরা মৃত্যু চাইনে। কে জানে মৃত্যুর পর আমাদের প্রাণ বর্তমানের আকাঙ্খা, অভাব ও কষ্টের প্রাবল্যকেই কত সুমধুর বলে পুনর্বার তা পাবার আগ্রহ করে কি না ?

বেলা যখন দ্বিপ্রহর হয়ে গেছে, তখন আমার সঙ্গীদ্বয় এসে পৌঁছুলেন, তাঁরা দুইজনে পথশ্রমে মরার মত হয়ে এসেছিলেন; কিন্তু আমার অবস্থা দেখে তাঁরা নিজের কষ্ট ভুলে অবাক হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপরেই স্বামীজি ব্যস্তসমস্ত হয়ে আমাকে কোলে তুলে বাতাস করতে লাগলেন এবং ব্যাকুলভাবে আমাকে কত স্নেহের ভর্ৎসনা করলেন। অচ্যুত ভায়া আমার সর্ব শরীরে হাত বুলোতে লাগলেন। আমার মাথাটা যাতে একটু ভাল থাকে, এজন্য সহস্র চেষ্টা হতে লাগলো। আমার আরোগ্যের জন্যে এদের দুজনের প্রাণের সমগ্র আগ্রহ এবং হৃদয়ের সমস্ত শক্তি নিয়োজিত হলো, কিন্তু তাঁদের চেষ্টার ফল হওয়ার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। আমি অবশেষে অবসন্ন হয়ে পড়লুম। নিরুপায় দেখে স্বামীজি ও অচ্যুতভায়া একজন লোককে জল গরম করতে অনুমতি দিলেন। সে ক্রমাগত জল গরম করে আমার পায়ে ঢালতে লাগলো। জলই কি শীঘ্র গরম হয় ? অনেক চেষ্টাতে জল খানিকটা গরম হলো, টগ্‌বগ্ করে ফুটচে, হু হু করে তাপ উঠছে। উনোন হতে নামিয়ে যেমনি পায়ে ঢালা অমনি ঠাণ্ডা; আমাদের দেশে শীতকালে কলসীর জল যে রকম ঠাণ্ডা হয়, সেই রকম। অনেকক্ষণ পরে এই রকম জল ঢালতে ঢালতে মাথাটা একটু ঠাণ্ডা হলো। তখন তাঁরা আমাকে ধরাধরি করে চারিদকে বন্ধ একটা অন্ধকার ঘরে নিয়ে গিয়ে শোয়ালেন। ক্রমে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম। অনেকক্ষণ ঘুমিয়ে ছিলুম।

শেষবেলা জেগে উঠে দেখি, অচ্যুতানন্দ ও স্বামীজি আমার পাশে বসে আছেন, আমার সম্মুখে একখানি আসনে একজন গায়ে জামামোড়া, মাথায় প্রকাণ্ড পাগড়ী, ভদ্রলোক বলে বোধ হলো। হঠাৎ এখানে তাঁর কি রকমে আবির্ভাব হল, ভেবে আমি একটু আশ্চর্য হয়ে গেলুম। এদিকে ওদিকে চেয়ে দেখলুম তাঁর সঙ্গে অন্য দুই–চরজন লোকও আছে। এঁদের পরিচয় জানবার জন্য আমার ভারি কৌতূহল হলো। আমার কিন্তু ক্ষুধার প্রবৃত্তিটা আরো প্রবল হয়ে ওঠায়, আগে আহারের চেষ্টাতেই প্রবৃত্ত হতে হলো। আমি নিদ্রিত হলে স্বামীজি ও অচ্যুত ভায়া রুটি তৈয়েরি করে নিজেরা খেয়ে আমার জন্যে কতক ভাগ রেখে দিয়েছিলেন, আমি উঠে বসে পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে সেগুলি উদরস্থ করলুম। আহারান্তে এক লোটা জল খেয়েই সমস্ত ক্লান্তি ও পরিশ্রম যেন দূর হয়ে গেল।

একটু সুস্থ হয়ে এই অভ্যাগত ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ করলুম। এর নাম পণ্ডিত কাশীনাথ জ্যোতিষী; জন্মস্থান গুজরাট; সম্প্রতি কলিকাতা থেকে আসছেন। কলিকাতায় ইনি মহারাজা স্যার যতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বাহাদুরের বাড়িতে বাস করেন। শুনলাম মহারাজা বাহাদুর এঁকে খুব শ্রদ্ধা ভক্তি করেন। বাংলাদেশের কোন সংবাদই অনেকদিন পাইনি। জ্যোতিষী মহাশয়ের সঙ্গে বাংলাদেশ সম্বন্ধে অনেক কথা হলো। তিনি কলিকাতার অনেক বড় বড় ঘরের কথা বলতে লাগলেন; দেখলুম লোকটি যে শুধু জ্যোতিষের রহস্য পর্যালোচনাতেই সময়ক্ষেপ করেন তা নয়, রাজনীতি ও সমাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর স্বাধীন মতামতের পরিচয় পাওয়া গেল; আর বাস্তবিক এতে আশ্চর্য হবার বিশেষ কিছু নেই। লোকতত্ত্বে যাঁদের অসাধারণ কৃতিত্ব আছে – রাজনীতি, সমাজনীতি তাঁদের সহজে বোঝাই সম্ভব।

এতক্ষণ পরে জ্যোতিষী মহাশয় নিজের কথা পাড়লেন। কলিকাতার ধনকুবের এবং সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের মধ্যে কার কি রকম অদৃষ্ট গণনা করেছেন, কার কি কি ফল ফলেছে এবং কে তাঁকে কি রকম শ্রদ্ধা ভক্তি করেন, সেই সকল কথা পুনঃ পুনঃ বলতে লাগলেন। নিজমুখে যদি কাকেও আত্মপ্রশংসা করতে শোনা যায় – তবে সে হাজার ভাল লোকের মুখে হলেও ভাল লাগে না। জ্যোতিষী মহাশায় খুব বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, ধার্মিক লোক হতে পারেন কিন্তু তাঁর এইরূপ আত্মপ্রশংসায় আমি অতিকষ্টে ধৈর্য রক্ষা করতে পেরেছিলুম বিশেষ এই অসুস্থ শরীরে। যা হোক, আমার এই ধৈর্যাতিশয্যে জ্যোতিষী মহাশয়ের উৎসাহ বা সাহস বোধ হয় বেড়ে গেল; হয়ত এমন নির্বিবাদ শ্রোতা বহুদিন তাঁর ভাগ্যে জোটে নি। তিনি একজন ভৃত্যকে ডেকে তাঁর বাক্স আনতে বললেন। বাক্স আনা হলে তিনি তার মধ্য হতে কতকগুলি খাতাপত্র বের করলেন। আমার বড়ই আশঙ্কা উপস্থিত হলো; বিবেচনা করলুম এখনি বা আমার অদৃষ্ট গণনা করে আমার ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমান সব নখদর্পণে দেখিয়ে দেন। আমার ভবিষ্যৎ জানবার জন্য কিছুমাত্র আগ্রহ ছিল না; জানি সেখানে আমার অনেক দঃুখ জমানো আছে; আলাদা আলাদা করে ফর্দমাফিক সে দঃুখ জেনে আর কি ফল হবে ? – মনে মনে এই রকম তর্ক করছি, এমন সময় জ্যোতিষী মহাশয় আমার হাতে কতকগুলি কাগজপত্র দান করলেন। ও হরি, এ গুলো জ্যোতিষের কোন পুঁথি নয়– ইংরেজি, পারসিতে লেখা কতকগুলি প্রশংসাপত্র। সে সমস্ত আমার দেখবার বিন্দুমাত্র আবশ্যক ছিল না; এবং সে জন্যে আমার মনে একটুও কৌতূহলের উদ্রেক হয় নি; কিন্তু জ্যোতিষী মহাশয় ছাড়বার পাত্র নন। ইংরেজিগুলো পড়ে তাঁকে তার অর্থ বোঝাবার

জন্যে আমাকে অনুরোধ করলেন, এবং আমি পারসি জানিনে বলে দুঃখ করে, তিনিই পারসি প্রশংসাপত্রগুলি পড়ে আমাকে তার অর্থ বোঝাতে লাগলেন। পড়বার ভঙ্গিমাই বা কি ! আমি বলি আমার অর্থ বোঝবার দরকার নেই; কিন্তু যদি কিছুতে ছাড়েন ! দেখলুম ভারতবর্ষের বহু প্রদেশ থেকে তিনি প্রশংসাপত্র পেয়েছেন, এবং সকল প্রশংসাপত্রেই তাঁর প্রধান জ্যোতিষী বলে খ্যাতি আছে। দেশে মাহারাজদের প্রদত্ত অনেক জায়গির আছে; তা হতে জ্যোতিষীদের প্রচুর অর্থাগম হয়। ইনি নিজের অর্থে তীর্থপর্যটনে এসেছেন। যেখানে যান, সেখানে অনেক অতিথিসেবা করান; সঙ্গে অনেক সাধু সন্ন্যাসী ও চাকরবাকর আছে। এই দুরারোহ পাহাড় কি হেঁটে পার হওয়া যায় ? – তাই পাহাড়িদের কাঁধে চড়ে তীর্থভ্রমণ করছেন ইত্যাদি নানা কথা বলতে লাগলেন। লোকটার লেখাপড়াও জানা আছে; কিন্তু নিজের গরিমা, বিদ্যার গরিমা, দানের গরিমা, মানসম্ভ্রমের গরিমা প্রকাশ করবার জন্যে লোকটা মহাব্যস্ত। ভারি আশ্চর্য মনে হয় যে, এই রকম গরিমা প্রকাশ করাটা নিতান্তই অনুচিত কাজ, এবং এতে মানুষে কাছে বরঞ্চ আরো লঘু হয়ে পড়তে হয়, এতটুকু সাধারণ জ্ঞানও কেন এঁদের নেই ? যাহা হউক, সুবিধার বিষয় এই যে, যাঁরা ঐরূপ প্রশংসাপ্রিয়, তাঁদের খোশামোদের দ্বারা সময়ে ঢের কাজ বাগানো যায়। এই প্রসঙ্গে আমার একটি বন্ধুর কথা মনে পড়েছে। বন্ধুটি কলিকাতার এক সম্ভ্রান্ত লোক, তাঁর অর্থ অনেক। কিন্তু আমাদের ন্যায় বন্ধুগণের ভোজে সে অর্থে সদ্‌ব্যায় কদাচিৎ মাত্র হয়ে থাকে। আমরা একদিন তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করায় তাঁর ভ্রাতা একটা খুব বড় রকমের মাছ এনে একটু ভালরকম খাওয়ার আয়োজন করেন। বন্ধুটি ভ্রাতার এই কার্যে একেবারে খড়্গহস্ত; রাগে কত কথাই বললেন, 'একালের ছোঁড়াগুলো কর্তাব্যক্তিদের গ্রাহ্যই করতে চায় না (তাঁর অনুমতি না নিয়ে মাছ আনা হয়েছিল, তাই বোধ করি এই কথা), আবার একালের ছেলেগুলি ভারি অমিতব্যয়ী, বাজে পয়সা খরচ না করলে এদের হাত যেন সুড়সুড় করে (দুই টাকা চার আনা দিয়ে মাছ কেনা হয়েছে, সে কি সহ্য হয় ?)। আহারান্তে বললেন, ''ছেলেগুলো ইংরেজি শিখে দেশটা উচ্ছন্নে দিলে'' (নিজে ইংরেজি জানেন না)। এই ঘটনার পরের দিন আমি আর উল্লিখিত মিতব্যয়ী বন্ধু এই দুজনে বেলা আটটার সময় ট্রামে চেপে চৌরঙ্গির দিক থেকে ফিরে আসচি। জোড়াসাঁকোর কাছে এসে আমাদের খাওয়াদাওয়ার গল্প আরম্ভ হলো। আমি বললুম, ''আগে আগে কলকাতায় এসে ভাল খাবার পাওয়া যেতো, এখন সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই। যারা খাওয়াবে তারা সকলেই এখন কোলকাতা ছাড়া; তবু যে মধ্যে মধ্যে এখানে এলে ভাল খাওয়া যায় সে কেবল এক তোমার জন্যে। তুমি ত আর কিছু বন্ধু বান্ধবকে খারাপ খাওয়াতে পার না; এ জন্যে পয়সা ব্যয় করতেও তোমার আপত্তি নেই। নিজেই ভাল জিনিস সন্ধান করে খাওয়াদাওয়ার উদ্যোগ করা, এ গুণটি তোমার যেমন, আর কারো সে রকম দেখতে পাই নে। '' বন্ধু যেন স্বর্গ হাতে পেলেন; অমনি তাঁর মুখ খুলে গেল, আমার হাত দুটি ধরে সবিনয়ে বললেন, '' দেখ ভাই, তোমাদের খাওয়াবার জন্যে আমার বড়ই আগ্রহ হয়। একসঙ্গে যে পাঁচদিন আনন্দে কাটানো যায়, সেও পরম সুখের কথা। টাকাকড়ি তো আর সঙ্গে যাবে না, কিন্তু এ কথা বোঝে ক'জন? – '' দেখতে দেখতে ট্রামগাড়ি ঘড়ঘড় শব্দে নূতন বাজারে এসে পড়লো। বন্ধুবর চীৎকার করে বললেন, ''বাঁধো ''। গাড়ি না বাঁধলে ভায়া নামতে পারতেন না, সুতরাং তাঁর নামবার আবশ্যক হলে তার জন্যে অনেকখানি আয়োজন করতে হতো। অনেক শোরগোল করে তিনি নেমে পড়লেন, তারপর আমার হাত ধরে টানাটানি। আমি বললুম নামতে হবে

শোভাবাজারের মোড়ে, এখানে হঠাৎ তোমার কি কাজ পড়ে গেল ?'' ভায়া কোন দিকে কান না দিয়ে আমার হাত ধরে বাজারের ভিতর প্রবেশ করলেন, এবং খেজুরগাছের মাথার মত মাথাওয়ালা এক ডজন গলদা চিংড়ি, দুর্মূল্য ফুলকপি এবং কড়াইশুঁটি প্রভৃতিতে তিন টাকার বাজার নিয়ে বাসার দিকে চললেন। শুধু আমি অবাক নই, বাসায় উপস্থিত হলে সকলেই অবাক হয়ে গেল! রাত্রে মহাধুমে পোলাও কালিয়ার বন্দোবস্ত হলো। সেদিন দাদার অমিতব্যয়িতার পরিচয় পেয়ে অমিতব্যয়ী ছোট ভাইটি যে সকল স্বগত উক্তি করেছিল, তা প্রকাশ্যে বললে বোধ হয় আমোদ একটু বেশি হত। যা হোক ইংরেজি না শিখলে দেশ কি রকম করে উদ্ধার হয় রাত্রে দাদার কাছে সে তার অতি সুন্দর পরিচয় পেয়েছিল। সেই অনেক দিনের পুরানো কথা আজ খুলে লিখলুম, এখন বন্ধুবিচ্ছেদ না হলে বাঁচি !

যা হোক, শত শত প্রশংসাপত্র দেখিয়েও জ্যোতিষী মহাশয়ের আশ মিটলো না। শেষে বাক্সের ভিতর থেকে দুতিনখানা ''অমৃতবাজার'' বের করে আমাকে দুই-তিনটে জায়গা পড়তে দিলেন। পাশে লাল দাগ দেওয়া;-দেখলুম, হরিদ্বার কুম্ভমেলার সময় ইনি নিজে খরচপত্র করে অনেক গরিব সাধু সন্ন্যাসীকে আহার দিয়েছিলেন ও এতদ্ভিন্ন প্রচুর বস্ত্র-অর্থাদিও দান করেছিলেন, এই কথা কে ''অমৃতবাজারে'' টেলিগ্রাম করেছে; ইনি সেই সমস্ত টেলিগ্রাম সংগ্রহ করে রেখেছেন।

জ্যোতিষীর কাছে মহারাজ ঠাকুর বাহাদুর ও কুমার বাহাদুরের ফটো দেখতে পেলুম, উজ্জ্বল, প্রসন্ন, শান্তিপূর্ণ বদন এবং তাতে পুরুষসুলভ কাঠিন্যের অভাব দেখে মনে আপনিই একটা প্রীতি এবং শ্রদ্ধাভক্তির ভাব এসে উপস্থিত হলো। কতদিন স্বদেশ দেখিনি-স্বদেশীর মুখ পর্যন্ত ভুলে গিয়েছি। আজ এই ছবি দুখানি দেখে ভারি আনন্দ লাভ করলুম। এই প্রবাসের মধ্যে বোধ হলো, এঁরা আমার পরম আত্মীয়। কোথায় মহৈশ্বর্যসম্পন্ন সম্ভ্রান্ত রাজপরিবার, আর কোথায় সংসারত্যাগী পথের ফকির; আমি কিন্তু আমাদের মধ্যে এই গভীর ব্যবধান ভুলে গেলুম। শুনেছি স্বর্গে মানুষে মানুষে ব্যবধান নেই, স্বর্গের এই দ্বারদেশে কি তারই পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে?

সন্ধ্যার সময় একটু বাইরে বেড়াতে গেলুম। সন্ধ্যার বাতাসে এবং স্নিগ্ধতার মধ্যে শরীর অনেকটা ভাল বোধ হলো। আস্তে আস্তে পাণ্ডুকেশ্বরের মন্দির এবং আরো গোটাকতক ভাঙা মন্দির দেখে এলুম। দেখতে দেখতে আকাশে মেঘ করে এলো, আমরা কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘরের মধ্যে আশ্রয় নিলুম। অল্পক্ষণের মধ্যেই ভয়ানক শিলাবৃষ্টি আরম্ভ হলো, শীতে আমরা আড়ষ্ট হয়ে পড়লুম-ভাগ্যি আমরা আগেকার সেই দোকানঘরটা ছেড়ে এসেছি তাই রক্ষা, নতুবা আজ মারা পড়ার আটক ছিল না। যতক্ষণ জেগেছিলুম, বৃষ্টি একবারও থামেনি। রাত্রিতে আজ কিছু আহারাদি হলো না, বেশ আরামের সঙ্গে রাত কাটানো গেল। স্বামীজি বলেছিলেন, আগামী কল্যই আমরা বদ্রিকাশ্রমে পৌঁছুতে পারবো। সেই কথা শুনে আমাদের বড় আনন্দ হয়েছিল। এত কষ্ট, এত পরিশ্রম, এত কঠোর উদ্যম, কাল সমস্ত সার্থক হবে। যাঁরা নিষ্ঠাবান ধার্মিক, ভগবানের চিরপ্রসন্নতাই যাঁদের লক্ষ্য, এবং ভক্তিকেই যাঁরা জীবনপথের অমূল্য পাথেয় বলে ধ্রুব জেনেছেন, তাঁদের শান্তিলাভ অসম্ভব কথা নয়। কিন্তু আমার লক্ষ্য, আমার উদ্দেশ্য যে কিছুই নেই। বদরিনারায়ণের মধুর সত্তা কি আমার হৃদয়ের দারুণ পিপাসা নিবারণ করতে

পারবে? দেখি যদি সাধুর এই অভীষ্ট মন্দিরে, এই সনাতন ধর্মের পীঠস্থলে একটু শান্তি একটু তৃপ্তি যুগান্তব্যাপী মাহাত্ম্যের মধ্যে লুক্কায়িত থাকে। আশায়, উৎসাহে এবং স্বপ্ন-জাগরণে সমস্ত রাত্রি কেটে গেল।

বদ্রিকাশ্রমে

২৯ মে, শুক্রবার। – মনের মধ্যে একটা ইচ্ছা ছিল, খুব ভোরে বের হয়ে পড়তে হবে, তাই রাত থাকতেই ঘুম ভেঙে গেল। তখনই আমরা যাত্রার আয়োজন করে নিলুম। আজ আমাদের যাত্রার অবসান। আনন্দে, উৎসাহে এবং সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা নিরাশায় হৃদয় পূর্ণ হয়ে যাচ্ছিল। কোন কবি লিখেছেন, ''আশা যার নাই তার কিসের বিষাদ'' – আমার কোন বিষাদ ছিল না, কিন্তু যোগী-ঋষিগণ যে সুখের আস্বাদনে বিমুগ্ধ, আমার সে সুখ কোথায়? – আজ হিমালয়ের তুষারমণ্ডিত স্তূপের উপর দাঁড়িয়ে আমাদের শস্যশ্যামলা, নদনদী শোভিত, সমতল মাতৃভূমির দিকে চক্ষু ফিরিয়ে মনে মনে ভাবলুম, কোথা সুখ, কোথা তুমি? মাতা বঙ্গভূমি, তোমাকে ত্যাগ করে আজ ভূতলে অতুল তীর্থ বদরিকাশ্রমে দাঁড়িয়ে আছি। সুখের সন্ধানেই এতদূর এসেছি; সুখ নাই মিলুক শান্তি কই? হায়, মনে সে পবিত্রতা নেই, প্রাণের সে একাগ্রতা নেই, কিসে হৃদয়ে শান্তি পাব? এত পরিশ্রম, জীবনের এই কঠোর ব্রত সমস্তই নিষ্ফল হলো।

আমাদের আগে আগে কয়েকজন সাধু অগ্রসর হচ্ছিলেন; তাঁদের আনন্দ, তাঁদের প্রাণের উচ্ছ্বাস দেখে আমার হিংসা হতে লাগলো। বদরিনারায়ণের উপর পূর্ণ বিশ্বাসে সোৎসাহে তাঁরা অগ্রসর হচ্ছেন, বিশ্বাস-রত্ন অপহৃত হতভাগ্য আমি তাঁদের সেই সুখস্বর্গচ্যুত! সত্য বটে, জীবনে একদিন এমন সুখ ছিল, যার তুলনায় অন্য সুখ কামনা করতুম না; কিন্তু তা হারিয়েছি বলেই কক্ষচ্যুত গ্রহের মত দেশে দেশে ঘুরে আজ এই গিরিরাজ্যে অনন্ত হিমানীর মধ্যে প্রাণের যাতনা বিসর্জন দিতে এসেছি। দেবতায় ভক্তি নেই, চির প্রেমময়ের মঙ্গলময়ত্বেও বিশ্বাস নেই; তবু আশা, যদি প্রাণ শীতল হয়। জানি ধর্মরাজ্যে, প্রেমের রাজ্যে, স্বর্গরাজ্যে 'যদি'-র প্রবেশ নিষেধ। তাই আশার মধ্যে নিরাশা, আনন্দের, বৈদান্তিকের উৎসাহ এবং অন্যান্য যাত্রীদের প্রফুল্ল মুখ দেখে হৃদয় প্রসন্ন হয়ে উঠলো; প্রাণের দীনতা ও আশার ক্ষীণতায় এই রকম ধার করা উৎসাহ ও আমোদ ঢেকে খুব স্ফূর্তি করে অগ্রসর হতে লাগলুম।

আমাদের আগে পিছেও যাত্রী যাচ্ছিল; কিন্তু আমরা তিনটিতে একদল। পথে যেতে অনেকগুলি কুঁড়েঘর রাস্তার ধারে নজরে পড়লো। এ সকল ঘর পাহাড়ি লোকের বাঁধা। তারা এ সকল জায়গা থেকে কাঠ দুধ প্রভৃতি নিয়ে বদরিনারায়ণে বিক্রি করে আসে; এতে তাদের বেশ উপার্জন হয়। পাণ্ডুকেশ্বর ছেড়ে আরো এক মাইল উপরে এখনো বাস করবার জো হয় নি, সমস্ত বরফে ঢাকা। এতদিন দূর হতে পর্বতের গায়ে, চূড়ায় বরফের স্তূপ দেখে এসেছি, সময়ে সময়ে বরফের ভিতর দিয়ে যেতে হয়েছে বটে, কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য, এবং তাতে বরফের মধ্য দিয়ে চলার অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি। আজ দিগন্তবিস্তৃত শ্বেত তুষারের রাজ্য দিয়ে যেতে লাগলুম। ইতিপূর্বে যে পথ দিয়ে চলেছিলুম, কিছুদিন আগে যে সকল জায়গা বরফে ঢাকা ছিল, গ্রীষ্মকাল আসায় তা

গলে পথঘাট সব বেরিয়ে পড়েছে; কিন্তু এ স্থানটি অনেক উচ্চ, তাই এখানকার বরফ আজও গলেনি। পায়ের নীচে কতক জায়গায় বরফ কর্দমময় হয়েছে মাত্র। কিন্তু খানিক উপর হতে ঊর্ধতন প্রদেশে যে বরফ আছে, শীতের প্রারম্ভে নারিকেল তৈল যেমন জমে, অনেকটা সে রকম; তা জমাট পাষাণ স্তূপের মত। সৃষ্টির শেষদিন পর্যন্ত তা সেই এক ভাবেই থাকবে বলে বোধ হয়। শীতের সময় বিষ্ণুপ্রয়াগ, কোন কোন বার যোশীমঠ পর্যন্ত, বরফের মধ্যে ডুবে থাকে, গ্রীষ্মকালে নীচের বরফ জল হয়ে নদীর স্রোতের বৃদ্ধি করে; সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির একটা নবজীবন, একটা নূতন মাধুরী পরিস্ফুট হয়ে উঠে।

পাণ্ডুকেশ্বরের একটু উপরের বরফ এখনও গলেনি, আরও কয়েক দিন পরে জায়গায় জায়গায় গলে পথ দেখিয়ে দেবে; তাতে সমস্ত পথ যে বেশ সুগম হবে তা নয়, তবে এই শ্বেতরাজ্যের মধ্যে পথের একটা মোটামুটি সন্ধান পাওয়া যাবে। মরুভূমির মধ্য দিয়ে চলতে শুনেছি পথভ্রান্ত হতে হয়; আমি তেমন নামজাদা মরুভূমির মধ্যে কখনও পড়ি নি, কিন্তু এই রকম রাজ্যের মধ্যেও পথহারা হবার সম্ভাবনা কম নয়। যে দিকে তাকানো যায় শুধু সাদা, বরফ-মণ্ডিত। কোন দিক দিয়ে কোথায় পথ গেল, একে ত তা ঠিক করে নেওয়াই বড় বিপদের কথা, তার উপর এমন অসংলগ্ন পথ যে, পদে পদে পথভ্রান্তির সম্ভাবনা। অন্য কারও পথের ঠিক থাকে কি না, তা বলতে পারিনে, কিন্তু আমরা তিনটি প্রাণী ত প্রতি মুহূর্তে ভাবতে লাগলুম, এইবার বুঝি পথ হারিয়েছি। এমন কি অন্যান্য চিন্তা দূর হয়ে এই দুর্ভাবনাটাই বেশি হয়ে উঠলো।

স্বামীজি ও অচ্যুতভায়া কথাবার্তা চালাতে লাগলেন। আমার কিন্তু সেদিকে মন ছিল না। আমি তখন ঘোর চিন্তায় অভিভূত হয়ে চলছিলুম। বরফের এই অভিনব রাজ্যে এসে আমি একেবারে অবাক হয়ে গিয়েছি, সঙ্গে সঙ্গে আমার অতীত জীবনের দুই একটি কথা মনে পড়ছিল। শৈশবের সেই কোমল হৃদয়, সরলমন, অকপট বন্ধুত্ব এবং সকলের প্রতি গভীর বিশ্বাস ও ভালবাসা, সে কেমন সুন্দর, কেমন মোহময় ছিল। তখন আমার ক্ষুদ্র গ্রামখানি আমার পৃথিবী ছিল; তার প্রত্যেক বৃক্ষপত্র, উন্মুক্ত ক্ষেত্রে ভারাবনত শস্যশীর্ষ এবং দূর-প্রবাহিত বায়ুতরঙ্গের অবিশ্রান্ত গতি যেন কতই স্নেহ ঢেলে দিত। ক্রমে বড় হয়ে দূরে কলিকাতায় পড়তে গেলুম; পবিত্রচেতা মধুর-হৃদয় কত বন্ধু লাভ হলো; এবং একখানি প্রেমপূর্ণ, নিতান্ত নির্ভরতাপূর্ণ হৃদয় আমার জীবনের সুখ-দুঃখের সঙ্গে তার জীবনের সুখ-দুঃখ মিশিয়ে নিলো। হৃদয়ে কত বল, মনে কত সাহস, প্রাণে কত বিশ্বাস! মনে হতো পৃথিবীতে এমন কিছু নেই যা মানুষের দুখানি হাত সুসম্পন্ন করতে না পারে। জীবনের সেই পূর্ণবসন্ত কোথায়? – বসন্তের জ্যোৎস্নাধৌত রাত্রে আম্রমুকুলের সৌরভে পরিপূর্ণ একটি ক্ষুদ্র উপবন-প্রান্তে প্রণয়ী ও প্রণয়িনীর কোমল মিলন, সেই অভিমান ও আদর, হাসি ও অশ্রু, সে সকল কোথায়? কার্যক্ষেত্রে বিপুল পরিশ্রম, লোকহিতে গভীর একাগ্রতা-সে এক স্বপ্ন বলে মনে হয়। ইহজীবনের মধ্যেই যেন একটা বিরাট ব্যবধান। তারই এক প্রান্তে দাঁড়িয়ে আজ হা-হুতাশ করছি! তখন একদিনও কি কল্পনা করেছি, আজ যেখানে এসেছি, জীবনে একদিন এমন স্থানে আমার পদধূলি পড়বে? কিন্তু আজ এ অভিনব প্রদেশে, স্বর্গের শূন্য সোপানতলে পদার্পণ করে আমার সুখময় শৈশব ও যৌবনের মধুর স্মৃতি দু'দণ্ডের জন্য মনে পড়ে গেল। আমার চিরনির্বাসিত অশান্ত হৃদয় সেই কুসুমকুঞ্জ বেষ্টিত শান্তিময় আলয়ের কথায় চঞ্চল হয়ে উঠলো; অন্যের অলক্ষিতে

দুবিন্দু অশ্রু মুছে গাছপালাবর্জিত দুই পাহাড়ের মধ্য দিয়ে তুষারাবৃত অলকানন্দার ধারে ধারে চলতে লাগলুম।

পাণ্ডুকেশ্বর ছেড়ে যে সব কুটির দেখতে দেখতে এলুম, সেগুলি বুঝি আমার সুকোমল প্রভাত জীবনের কথা মনে করিয়ে দিয়েছিল। বাস্তবিক কুটিরগুলি আনন্দপূর্ণ, প্রকৃত সুখের বাসস্থান। পাহাড়িয়ারা এখানে সপরিবারে বাস করছে। সকালে কেহ কাঠ কাটছে, কেহ আঁটি বাঁধছে, কেহ রুটি তৈরি করতে ব্যস্ত, কেহ বা উদরের তৃপ্তিসাধনে নিবিষ্টচিত্ত। পাহাড়ি যুবতীরা কেহ গান গাচ্ছে কেহ ছোট ছোট ছেলেমেয়ের কাছে দাঁড়িয়ে যাত্রীর দল দেখছে; সরল, উন্নতদেহ; প্রফুল্লমুখে কোমল হাসি। যাত্রীর দল দেখে বালিকা, যুবতী এমন কি নিতান্ত শিশুর দলও ''জয় বদরিবিশালা কি জয়!'' বলে আনন্দধ্বনি করছে, এবং যাত্রীদের কাছে এসে কেহ বা একটা পয়সা, কেহ বা কিছু সূচ সূতা চাচ্ছে। দেখলুম এরা অনেকেই সূচ সূতার প্রার্থী। বোধ হয় এই দুইটি জিনিসের এরা বেশি ভক্ত। সকল বালক বালিকাই হৃষ্টপুষ্ট ও বলিষ্ঠ; যুবতীগণের দেহ সবল ও দীর্ঘা প্রকৃতি যেন নিজহস্তে অতি সহজ ভাবে সমস্ত অঙ্গের পূর্ণতা সম্পাদন করেছেন। বিশেষ তাদের মধ্যে একটা জীবন্ত ভাব দেখলুম, যা আমাদের ম্যালেরিয়াগ্রস্ত বঙ্গদেশের প্লিহাযকৃৎ-প্রপীড়িত অন্তঃপুরে কখনই দৃষ্টিগোচর হয় না! বোধ হলো এ দেশে কোন রকম পীড়ার প্রবেশাধিকার নেই। এমন যে মলিন বস্ত্র ও ছিন্ন কম্বল পরিহিত ছেলেমেয়ের দল, তবু তাদের গোলাপি আভাযুক্ত সুন্দর মুখ দেখলে কোলে তুলে নিতে ইচ্ছে হয়। কতবার সতৃষ্ণ-নয়নে তাদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলুম। এখানে আর একটু তফাৎ দেখলুম; দেশে থাকতে যখন আমরা রেলের গাড়িতে কি নৌকাযোগে কোথাও যেতুম, প্রায়ই দেখা যেত, পথের দু'পাশে রাখাল বালকেরা পাচনবাড়ি তুলে আমাদের শাসাচ্ছে, কখন বা ছোট হাতের মুষ্টি তুলে, কখন কখন বিকট মুখভঙ্গি করে আমাদের ভয় দেখাচ্ছে; কিন্তু এ দেশে চাষার ছেলের সে রকম উপসর্গ দেখা গেল না; ছেলেমেয়েগুলি সকলেই কেমন ধীর শান্ত। কেহই কালীঘাটের মত কাহাকেও জড়িয়ে ধরে না, কিম্বা গাড়ির সঙ্গে সঙ্গে চৌরঙ্গীর মোড় পর্যন্ত ছুটে আসে না! কেহ একটি পয়সা চাহিতেও সংকোচবোধ করে; হয় ত মুখের দিকে একটি বার চেয়ে ঘাড় নীচু করলে। যদি তার মনের ভাব বুঝে তার হাতে একটি পয়সা দেও ত উত্তম, না দেও দাঁড়িয়ে থেকে চলে যাবে। আমাদের বঙ্গভূমি ভিক্ষুকের আর্তনাদের ও কাতর প্রার্থনায় পরিপূর্ণ; তাতে দাতাদিগের কর্ণও বধির করে ফেলে; সুতরাং আমাদের বঙ্গীয় দানশীলগণ যদি এদেশে আসেন, ত এই সব বুভুক্ষু বালক বালিকাদের নীরব প্রার্থনা প্রতিপদেই অনাদৃত হয়! কিন্তু যে সকল সাধু-সন্ন্যাসী এ পথে পদার্পণ করেন, তাঁদের মধ্যে বাঙালির সংখ্যা নিতান্ত কম, এবং তাঁরা গরীবের কাতর প্রার্থনা শুনবার আগেই যথাসাধ্য দান করেন। অতএব দাতার দানে যেমন বিরক্তি নেই, গ্রহীতার ভিক্ষা গ্রহণেও সেইরূপ প্রসন্নতার সম্পূর্ণ অভাব দেখা গেল। যে নিতান্ত ভিখারি, যার পয়সার অত্যন্ত প্রয়োজন, সেও একবারের বেশি দুবার চায় না। তবু আমাদের দেশে দুষ্টুমি-জ্ঞাপক বিশেষণ যোগ করতে হলেই লোকে বলে ''পাহাড়ে মেয়ে'' ''পাহাড়ে শয়তান'' ইত্যাদি। এই পাহাড়ের বুকের মধ্যে এসে, পাহাড়ের ছেলে মেয়েদের সঙ্গে আলাপ করে পাহাড়ির প্রতি এ রকম কোপকটাক্ষ অকারণ বলে মনে হলো।

আরও কিছু অগ্রসর হতেই দেখি যে, পাহাড়ের দেবকুটিরের চিহ্ন একেবারে অদৃশ্য হয়ে গেছে। চারিদিকে সাদা চিহ্ন ছাড়া আর কিছু দেখবার নেই; কে যেন সমস্ত প্রকৃতিকে

দুগ্ধফেননিভ বস্ত্রখণ্ডে মুড়ে রেখেছে। পায়ের নীচে পুরু বরফ তেমন কঠিন নয়; তার মধ্যে কদাচিৎ দুটো একটা জায়গায় বরফ গলাতে পাথরের কৃষ্ণবর্ণ বেরিয়ে পড়েছে। সেইগুলি লক্ষ্য করে পথ চলতে লাগলুম। ইচ্ছা তাড়াতাড়ি চলি,- কিন্তু ভয়ানক কাদার মধ্যে দিয়ে চলতে যেমন জোর পাওয়া যায় না, এক পা তুলতে আর এক পা বসে যায়, আমাদের অবস্থা তদ্রূপ; তবে তফাৎ এই যে, কাদার মধ্য থেকে পা তুলতে ভারি ও আটালো বোধ হয়; বরফে সে রকম কোন উপসর্গ নেই। প্রথমে মনে হল আমরা দইয়ের উপর দিয়ে চলছি; ইচ্ছে হল খানিকটা তুলে গালে ফেলে দিই। কিন্তু স্বামীজির কাছে এই অভিপ্রায় ব্যক্ত করতেই তিনি এ রকম অশিষ্টাচরণ করার বিরুদ্ধে অনেক যুক্তি প্রদর্শন করে ''প্রাপ্তে তু ষোড়শে বর্ষে পুত্রং মিত্রবদাচরেৎ'' এই চাণক্য-নীতির মর্যাদা রক্ষা করলেন, এবং পাছে বরফ খাওয়া অন্যায় বললে এ যুক্তি তর্কের দিন তাঁর ''মিত্রবদাচরেৎ'' -এর প্রতি যথেষ্ট সম্মান প্রদর্শন না করি, এই ভয়ে তিনি বললেন ''বরফ খেলে পেটের ব্যারাম হয় !'' এই অদ্ভুত মত শুনে আমার হাসি এল; মনে হল আজকাল আমাদের দেশে যুক্তির আধিক্যের মধ্যে বড় একটা নূতনতর জিনিস প্রবেশ ক'রেছে- সেটা হচ্ছে শরীরতত্ব! ছেলেবেলায় শুনতুম, একাদশীতে নিরম্বু উপবাস করলে পুণ্যসঞ্চয় হয়, এখন শুনি একাদশীতে উপবাস করলে শরীরের রস অনেকটা শুষ্ক হয়, সুতরাং জ্বরের আর ভয় থাকে না। আগে শুনতুম কুশাসন পবিত্র জিনিস সুতরাং কোন ধর্মকর্ম উপলক্ষে কুশাসনে বসাই যুক্তিসঙ্গত; এখন শুনতে পাই, কুশাসন অপরিচালক- তাই শরীরজ বিদ্যুতের সঙ্গে ভূমিজ বিদ্যুৎ একীভূত হয়ে শরীরের অনিষ্টসাধন করতে পারে না। এইরূপে টিকি রাখা হতে আচমন করা পর্যন্ত সমস্ত অনুষ্ঠানেরই এমন এক অভিনব ব্যাখ্যা বের হয়েছে, যাতে প্রমাণ করে, দেহরক্ষার চেয়ে আর ধর্ম নেই এবং যা কিছু আমাদের ক্রিয়াকর্ম সকলই এই দেহরক্ষার জন্যে। এতে ফল হয়েছে এই যে, যুক্তিগুলি নিতান্ত উপহাস্যাস্পদ হয়ে পড়েছে। অবশ্যই স্বামীজির প্রদর্শিত উদরাময়ের আশঙ্কা সম্বন্ধে এত কথা খাটে না; তিনি বৃদ্ধ, পরিপাকশক্তির প্রতি হয়ত তাঁর আর তেমন বিশ্বাস নেই এবং ''শরীরং ব্যাধিমন্দিরং'' এই কথাটার উপর হয় ত অবিচল বিশ্বাস। স্বামীজি আমাকে অনেক অন্যায় কাজ করতে বহুবার নিষেধ করেছেন, এবং তাঁর নিষেধ সত্বেও সেই সকল কাজ করে দু চারবার বেশ ফলভোগও করেছি; কিন্তু বৃদ্ধের অতি সতর্কতা অনুসারে চলাটা সর্বদা আমাদের পুষিয়ে ওঠে না। অতএব স্বামীজির নিষেধ-বাক্যে মনোযোগ না দিয়ে দুই এক তাল বরফ তুলে গালে ফেলে দিলুম; দুর্ভাগ্যবশত তৃপ্তি লাভ করতে পারলুম না। সেই বাল্যকালে যখন কলিকাতায় পড়তুম, তখন বৈশাখের নিদারুণ গ্রীষ্মে গলদঘর্ম হয়ে কখন কখন দুই এক পয়সার বরফ কিনে প্রবল পিপাসার নিবৃত্তি করা যেত। পিপাসা এখনও তেমনই প্রবল আছে, কিন্তু বরফ ত আর তৃপ্তি বোধ হয় না।

এই রকম ভাবে চার পাঁচ মাইল চলার পর আমরা 'হনুমান চটিতে' উপস্থিত হলুম। এর নাম কেন যে 'হনুমান চটি' হলো তা বলতে পারিনে। দোকানদার আজ মোটে চার পাঁচ দিন হলো এসে এখানে দোকান খুলেছে; তার আগে এ চটি বরফে ঢাকা ছিল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করায়, সেও এই নামের রহস্য ভেদ করতে পারলে না, কিন্তু সে যে জবাব দিলে তাতে হাসি এল। বললেন সে ছেলেমানুষ (বয়স চল্লিশের কাছাকাছি!) তার এ সকল শাস্ত্রকথা জানবার বা বুঝবার সময় হয় নি; বয়োবৃদ্ধ সাধুদের জিজ্ঞাসা করলে ঠিক উত্তর মিলতে পারে। এই চটি পর্ণকুটির নয়। এই দারুণ বরফের রাজ্যে

পাতার কুটিরে বাস রক্তমাংসধারীদের পক্ষে অসম্ভব এবং সে রকম সম্ভাবনা উপস্থিত হলে প্রাণ নামক পদার্থটি দেহকে আগেই জবাব দিয়ে বসে থাকে।

চটিতে ছোট পাথরের ঘর, তার একটা বারান্দা বের করা; আর তার পাশেই সম্মুখ দিক খোলা আর একটি ছোট ঘর। শুনলুম, এ ঘর চটিওয়ালার নয়, সে এক দেবতার ঘর। দুচার দিনের মধ্যেই দেবতাটি নিম্নদেশ হতে এখানে এসে তাঁর সিংহাসন দখল করে বসবেন এবং পুণ্যপ্রয়াসী যাত্রীদের আর এক দফা খরচ বাড়বে। এই চটিতে বেশি ঘর না থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানলুম যে, এখানে কোন যাত্রীই থাকতে চায় না। বদরিকাশ্রম এখান থেকে মোটে চার মাইল। বদরিনারায়ণের এত নিকটে এসে কে আরাম বিরাম বা আহারাদি করবে ? আর নারায়ণ দর্শনার্থীর মধ্যেই বা কে সাত সমুদ্র তের নদী পার হয়ে এসে এই চার মাইলের জন্যে একখানে বসে থাকবে ? তীর্থযাত্রীদের মধ্যে এমন প্রায়ই দেখা যায় না, যারা মন্দিরের দ্বারে এসে দেবতার শ্রীমুখপঙ্কজ না দেখে সিঁড়ির উপর বসে অপেক্ষা করে। সুতরাং এখানে বেশি দোকান থাকার বিশেষ কোন দরকার নেই; একখানা দোকান , তাই ভাল রকম চলে না। আর এই জন্যেই দোকানি তার দোকানে চাল, ডাল বড় একটা রাখে না, কিছু পেড়া (সন্দেশ) বা পুরি সর্বদা প্রস্তুত রাখে এবং দরকার হলে প্রস্তুত করে দিতে পারে। যাত্রীরা প্রায়ই এখানে ছোলাভাজা পুরি ইত্যাদি জলখাবার কিনে নেয়। আমরাই বা এ সুযোগ ছাড়ি কেন? এই দোকানে টাটকা ভাজা পুরির সুগোল পরিধি দর্শনে বৈদান্তিক ভায়া বিশেষ লোলুপ হয়ে উঠলেন। স্বামীজি বললেন, ''চ্যুত, আজ আমাদের মহা আনন্দের দিন; এমন দিন মানুষের ভাগ্যে বড় কম ঘটে, আর অল্পক্ষণ পরেই আমাদের জীবন সার্থক হবে। আজ মনের আনন্দে এখানে আহারাদির আয়োজন কর।'' অচ্যুত ভায়াকে এ কথা বলাই বাহুল্য; একে নিজের ষোল আনা ইচ্ছা, তার উপরে স্বামীজির অনুমতি – ভায়া উৎসাহে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন। সে দিনের সেই উৎসাহ দেখে মনে হয়েছিল, ভায়া যদি ধর্মকর্মে সর্বদা এমন উৎসাহ প্রকাশ করতেন, তা হলে যতদিন তিনি দণ্ড ছেড়েছেন, তাতে এতদিন তিনি কৃষ্ণ বিষ্ণুর মধ্যে একজন হতে পারতেন! কিন্তু তাঁর সে দিকে নজর নেই।

দীর্ঘকাল অনাহারে থাকায় এবং পথ পর্যটনে ক্ষুধা অসম্ভব রকম বৃদ্ধি হয়েছিল। যথাবিহিত ক্ষুধাশান্তি করে এবং এক ঘণ্টার জায়গায় তিন ঘণ্টাকাল বিশ্রাম করার পর বদরিনারায়ণের পথে শেষ আড্ডা ত্যাগ করলুম। একটু অগ্রসর হয়েই সম্মুখে একটা প্রশস্ত দুরারোহ পাহাড় দেখলুম। আগাগোড়া কঠিন বরফরাশিতে আবৃত, যেন বিভূতিভূষিত যোগীশ্রেষ্ঠ; সরল, উন্নত, শুভ্রদেহ, ধৈর্য ও গাম্ভীর্যের যেন অখণ্ড আদর্শ। মস্তক আকাশ স্পর্শ করছে, মধ্যাহ্ন সূর্যের কিরণ তাতে প্রতিফলিত হয়ে কিরীটের ন্যায় শোভা পাচ্ছে। নিম্নে স্তূপে স্তূপে বরফ সঞ্চিত হয়ে পাদদেশ আবৃত করেছে। আমরা যেন বিস্ময় ও ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেবার জন্যই তাঁর পদতলে এসে দাঁড়ালুম।

কিন্তু আমাদের এই বিস্ময় ও ভক্তি শীগ্রই ভয়ে পরিণত হলো; শুনলুম এই উন্নত পাহাড়ের পরপ্রান্তে বদরিকাশ্রম। এই পাহাড় উল্লঙ্ঘন না করলে আমাদের সেই পুণ্যাশ্রম দেখবার অধিকার নেই; কিন্তু এ পাহাড় অতিক্রম করা বড় সহজ কথা নয়। যাত্রার প্রারম্ভে সন্ন্যাস–গ্রহণের প্রথম উদ্যমেই যদি এমন একটা বিশাল পর্বত আমার অভীষ্ট

সাধনের পথ আটকে এই রকমভাবে দাঁড়াতো, তবে এই সন্ন্যাসব্রত–কঠোরতাই যার সাধনার অঙ্গ–তা গ্রহণ করতে সাহস করতুম কি না সন্দেহ। ।

একে ত ক্রমাগত সোজা উপরের দিকে উঠা, প্রতিপদে পা ভেঙে এবং নিশ্বাস আটকে আসে, তার উপর পায়ের নীচে বরফের স্তূপ! যেখানে বরফ একটু গলছে, সেখানে যেন বালিরাশির উপর দিয়ে যাচ্ছি। প্রতি পদক্ষেপেই পা ডুবে যাচ্ছে। আবার যেখানে জমাট কঠিন বরফ, সেখানে ভয়ানক পিছল, একটু অসাবধান হয়ে পা ফেললেই আর কি মুহূর্তের মধ্যে ইহজীবনটা ডিঙিয়ে পরলোকের দ্বারে উপস্থিত হওয়া যায়।
চলতে চলতে পায়ের যাতনা অনেকটা কমে এল দেখলুম। আস্তে আস্তে পা দুখানি অসাড় হয়ে পড়লো; তখন সেই তুষারশীতল স্পর্শ আর কাতর করতে পারলে না। বেশ বেগের সঙ্গেই চলতে লাগলুম। সময়ে সময়ে দুই একদলা বরফ তুলে নিয়ে গোলাকার করে দূরে ছুড়ে ফেলি; দেখতে দেখতে তা ধুলোর মত গুঁড়ো হয়ে যায়। পা অবশ হয়ে ক্রমে ক্রমে ভারি হয়ে এল, তবু প্রাণশক্তিতে এ পথটুকু চলতে লাগলুম। খানিক পরে পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌঁছুলুম। বেলা তখন শেষ হয়ে এসেছে।

এখানে এসে চেয়ে দেখলুম অপরপাশে খানিকটে নীচে কিছুদূর বিস্তৃত একটা সমতল ক্ষেত্র। দুই পাশে দুটি অভ্রবেদী পাহাড় ধনুকের মত সেই সমতলভূমিকে কোলে নিয়ে রয়েছে। অলকানন্দা দূরে দূরে আকবাঁকা দেহে অতি ধীরগতিতে চলে যাচ্ছে। কোথাও সামান্য স্রোত দেখা যাচ্ছে; অনেক স্থানেই জল দেখবার জো নেই। পাতলা বরফগুলি ধীরে ধীরে ভেসে যাচ্ছে, তাই দেখে স্রোতের অস্তিত্ব অনুভব করা যায়। কোথাও বা স্রোতের সম্পর্ক মাত্র নেই, আগাগোড়া জমে গিয়েছে, কেবল নদীগর্ভের নিম্নতায় নদীর অস্তিত্ব কল্পনা করা যাচ্ছে। সেই দুগ্ধফেননিভ বহুদূরবিস্তৃত তুষাররাশির উপর অস্তোন্মুখ তপনের লাল রশ্মি প্রতিফলিত হয়ে এমন বিচিত্র শোভা হয়েছিল যে, বোধ হলো সে যেন পৃথিবীর শোভা নয়, সে দৃশ্য অলৌকিক! আমি মনে মনে কল্পনা করলুম, শান্তিহারা অধীর হৃদয়ে ঘুরতে ঘুরতে আজ বুঝি বিধাতার আশীর্বাদে দুঃখকোলাহলময় পৃথিবীর অনেক ঊর্ধ্বে বরণীয় স্বর্গরাজ্যের দ্বারে উপনীত হয়েছি। ঐ তুষারমণ্ডিত সন্ধ্যারাগরঞ্জিত অলকানন্দার শোভাময় উপকূল, আমার কাছে সুরনদী মন্দাকিনীর প্রবালে বাঁধানো সুরম্য তীর বলে মনে হয়েছিল। চারিদিকে কেমন শান্তি, কত পবিত্রতা। দুঃখ, কষ্ট, পথশ্রম সব ভুলে গেলুম। এই অসীম যন্ত্রনাময় দগ্ধ জীবনের গুরুভারও যেন লঘু হয়ে গেল। অদূরে নারায়নের তুষারমণ্ডিত মন্দির। সমতলভূমির উপর আর একটি ছোট মন্দির ও কতকগুলি ছোট ছোট পাথরের ঘর। নদীর ধারে যেমন বালির ঘর বেঁধে মেয়েরা খেলা করে; এবং খেলা সাঙ্গ করে তারা বাড়ি চলে গেলে ঘরগুলি সেই নির্জন নদীতীরে পড়ে থাকে, অলকানন্দার তীরে এই শুভ্র সমতল প্রদেশে এই ছোট ঘর ও মন্দির দেখে আমার মনে হলো বুঝি দেববালারা এসে খেলাচ্ছলে এগুলি তৈয়েরি করেছিল, বেলা অবসান হওয়ায় খেলা সাঙ্গ করে তারা বাড়ি ফিরে গিয়েছে।

কিন্তু পৃথিবীতে নিরবচ্ছিন্ন পদ্য মেলা দুরূঢ়। তুমি সন্ধ্যাবেলায় অফিস থেকে ফিরে তোমার গৃহপ্রান্তস্থ ফুল বনে বসে আকাশের দিকে চেয়ে পূর্ণ চন্দ্রের শুভ্র শ্বেত হাসি দেখছ, আর তোমার হৃদয়ে শত শত মধুর কল্পনার তুফান উঠেছে, এমন সময় তোমার উদরের নীচ ক্ষুধাবৃত্তি তোমাকে স্বর্গ হতে ডেকে বললে, ''সেই ন' টার সময় চাট্টি নাকে

মুখে গুঁজে অফিসে যাওয়া হয়েছিল, এখন আর একবার উদর–দেবতাকে সন্তুষ্ট করলে হয় না ?'' এবং হয় ত তোমার গৃহিণী হাস্যমুখে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, ''চাঁদের আলোতে আর পেট ভরে না, এখন রাত্রে কি খাবে বল, ভাত না রুটি ?'' – অমনি চাঁদ, বসন্তের বাতাস , ফুলের গন্ধ সব দূর হয়ে গেল। সেই সন্ধ্যার প্রাক্কালে এই রমণীয় স্থানে দাঁড়িয়ে যখন প্রতি মুহূর্তে করুণারূপিনী সরল–হৃদয়া দেববালাগণের আগমন প্রত্যাশা করছি সেই সময় দেখলুম, মোটা ভুঁড়ি–বের করা টিকিওয়ালা পাণ্ডার দল দ্রুতপদে এসে আমাদের আক্রমন করলো। মন্দাকিনী–তীরে দাঁড়িয়ে আছি কল্পনা না করে যদি কল্পনা করতুম কৈলাসশিখরে উপস্থিত হওয়া গেছে, তা হলে এই অনাকাঙ্খিত পাণ্ডাগণকে কৈলাসনাথের অনুচর বলে ভ্রম না হওয়ার অতি অল্পই সম্ভাবনা ছিল।

পাণ্ডাঠাকুরেরা এসে আমার সঙ্গী খাঁটি সন্ন্যাসী দু'জনকে বাদ দিয়ে আমাকে পাঁকড়াও করলে, ''হামলোক শুনা কি এই শেঠজি ছদ্মবেশ লেকে আয়া'' বলে দু–তিনজন ভারি শোরগোল করে সেই পবিত্র স্থানের নিস্তব্ধতা ভেঙে দিলে এবং স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে ৈ'' নারায়ণজীর মন্দি''র্ ৈ'' ধ্বজা'' ৈ'' অলকানন্দা'' প্রভৃতি দেখিয়ে আমার পাণ্ডাত্ব গ্রহণের আয়োজন করতে লাগলো। বলা বাহুল্য আমাকে তারা চিনিয়ে না দিলেও ঐ সকল জিনিসের পরিচয় অবগত হতে আমার বিন্দুমাত্র অসুবিধা হতো না। পাণ্ডাদের উৎপাতে আমাকে ব্যতিব্যস্ত দেখে অচ্যুতভায়া হাসতে লাগলেন, অর্থাৎ কিনা তার ঠিক লোককেই পাকড়াও করেছে। আমার ভয় হতে লাগলো, কালিঘাটের পাণ্ডাদের হাতে স্বর্ণলতার নীলকমলের যেমন দুরবস্থা হয়েছিল, আমারও বা পাছে সেই রকম হয়।

যাহোক, আমার মত লোটা–কম্বলধারী অর্ধগৃহী ও অর্থ সন্ন্যাসীকে একজন বড়দরের শেঠজি বলে অনুমান করাতে তাদের বিচার বিবেচনাশক্তিকে তারিফ করতে হয়। উপক্রমণিকাতেই পাণ্ডাদের এই রকম অত্যাচার দেখে আমার বড়ই ভয় হলো, না জানি পুরপ্রবেশ করলে আরো কি ঘটবে। কিন্তু সে চিন্তা করে কোন ফল নেই ভেবে, পাণ্ডাদের অনেক আশা ভরসা দিয়ে তাদের সঙ্গে কথা কইতে কইতে অগ্রসর হলুম, তারাও বদরিনারায়ণের মাহাত্ম্য সম্বন্ধে নানারকম দুর্বোধ্য শ্লোক আউড়ে যেতে লাগলো; তার এক লাইনও যদি আমি বুঝতে পেরে থাকি! কিন্তু তাতে তাদের ক্ষতি কি, তারা খুব উৎসাহের সঙ্গে সঙ্গে কলরব করতে করতে যেতে লাগলো। এদের মধ্যে একজন পাণ্ডা ভারি চালাক, সে আমার নির্জলা তোষামোদ আরম্ভ করল, বলল, ''রে শেঠজি!! আপকো বদন দেখকে মালুম হুয়া আপ বহুত বড়া আদমি, এইসা আদমি নারায়ণ দর্শন করনেকো ওয়াস্তে কভি নেহি আয়া।'' আর একজন গল্প জুড়ে দিল, সে গল্পের কতখানি সত্য, কতটা তার কল্পনাপ্রসূত, তা অবশ্য আমি ঠিক করে উঠতে পারি নে, – আর সে জন্যে আমার কিছু আগ্রহও ছিল না। কিন্তু সে যা বললে তার মোদ্দাটা এখানে একটু লেখা যেতে পারে। সে বললে, কয়েক বছর আগে এখানে এক যুবক সাধুর শুভাগমন হয়েছিল। তার আকার প্রকার এবং অবয়বাদি সমস্ত অবিকল আমারই মত কেবল সে ব্যক্তি আমার চেয়ে কিছু লম্বা ও গৌরবর্ণ, আমার চেয়ে কিছু মোটা এবং দাড়িগোঁফ খানিক বড়, বয়সেও আমার চেয়ে কিছু কম বা বেশি হতে পারে; সুতরাং বলা বাহুল্য আমার সঙ্গে সেই গল্পোক্ত ভদ্রলোকের সবই মিলে গেল! আমারই মতন তাঁর গায়ে একখানি কম্বল ছিল সেখানি মূল্যবান বিলিতি কম্বল। কত লোক কত সময়ে কত ভাবে

এখানে আসে, কে তার হিসাব রাখে ? তবে যারা জাঁকজমকে অনেক লোকজন সঙ্গে নিয়ে আসে তাদেরই কাছে লোকের কিছু গতিবিধি হয়। উপরি উক্ত লোকটির সঙ্গে কোন লোকজন ছিল না; সুতরাং তার দিকে সাধারণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নি; বিশেষ সে লোকটি এসে কোন দোকানে কোন পাণ্ডার ঘরে আশ্রয় নেয় নি। নারায়ণ মন্দিরের পাশে একটি খোলা জায়গায় বসে থাকতো, কদাচ এক-আধবার কোথাও উঠে যেত। তাকে এই রকম নিতান্ত অনাথের ন্যায় দীনবেশে অন্যের অনাহূতভাবে বসে থাকতে দেখে মহান্ত মহাশয়ের তার প্রতি দয়া হলো। তিনি তাকে ডেকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু সে কোন কথার ভাল একটা জবাব দিলে না, সাধু-সন্ন্যাসীরা যেমন সকল অনুসন্ধান উড়িয়ে দিতে চান এও সেইরকম ভাব দেখালো। যাহোক সঙ্গে খাবার সংস্থান নেই অথচ বদরিনারায়ণে এসে একজন সাধু অনাহারে মারা পড়বে, ইহা অনুচিত মনে করে, মহান্ত মহাশয় দুবেলা তাকে ঠাকুরের প্রসাদ খেতে দিতেন। সে কোনদিন প্রসাদ খেত, কোন দিন স্পর্শও করতো না, যেমন প্রসাদ তেমনি পড়ে থাকতো। লোকটির আর একটু বিশেষত্ব ছিল-দিবসে অধিকাংশ সময়েই কম্বল মুড়ি দিয়ে পড়ে থাকত, নীরবে পড়ে থাকতেই ভালবাসত; এবং কেহ আলাপ করতে গেলে বরং একটু বিরক্তিই প্রকাশ করতো।

এই ভাবে দশ পনেরো দিন যায়। নারায়ণ দর্শন করে যে সকল যাত্রী ফিরে যায়, তারা সকলেই কৌতূহলপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার সেই সুন্দর যুবক সন্ন্যাসীর দিকে চেয়ে চলে যায়। কেহ বা তার সেখানে বসে থাকার কারণ জিজ্ঞাসা করে-কিন্তু কোনো সদুত্তর পায় না। হঠাৎ একদিন সন্ধ্যাবেলা পেয়াদা, সিপাহি, চাকরবাকর সঙ্গে খুব জমকালো পোশাকআঁটা, অস্ত্রশস্ত্র সজ্জিত চার পাঁচজন শেঠ এসে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হলো। তারা এখানে কাকেও কিছু না বলে, চারিদিকে কার যেন অনুসন্ধান করে ফিরতে লাগলো। শেঠজিদের এই ব্যবহারে নারায়ণের এই পাণ্ডারা কিঞ্চিৎ ভীত ও বিস্মিত হয়ে পড়লো, এবং ব্যাপার কি জানবার জন্যে তাদের পিছে যাত্রীর ভিড় জমে গেল। যাহোক তারা খুঁজতে খুঁজতে মন্দিরদ্বারে এসে দেখে, একজন কম্বল মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। এ ব্যক্তি আর কেহ নয়, পূর্বকথিত সন্ন্যাসী। কম্বল মুড়ি দিয়ে থাকে দেখে একজন ''কোন হ্যায় রে!'' বলে সজোরে তাকে ধাক্কা মারলো। ধাক্কা খেয়ে সন্ন্যাসী মুখাবরণ উন্মুক্ত করে উঠে বসতেই সেই জামাজোড়া পরিহিত লোকগুলি তাঁর সম্মুখে নতজানু হয়ে বসে পড়লো, ও বললে, ''কসুর মাপ কিজিয়ে, মহারাজ, আপ হিঁয়া, হামলোক তামাম দেশ ঢুড়কে হিঁয়া আয়া।'' যে সকল পাণ্ডা এই ব্যাপার দেখছিল, তারা একেবারে অবাক! তাদের অপরাধ কি? সে বেচারিদের দীর্ঘ অভিজ্ঞতায় এমন একটি সন্ন্যাসী-মহারাজ কখন দৃষ্ট হয় নি। পৌরাণিক গল্পে বা উপন্যাসে কখন কখন এরকম লোকের কথা শুনেছে বটে; কিন্তু এই কলিযুগের শ্রেষ্ঠভাগে যে এমন ঘটনা ঘটতে পারে, তা তারা কি রকম করে বিশ্বাস করবে? এদিকে মহারাজের ছদ্মবেশ যখন প্রকাশিত হয়ে পড়লো, তখন ''চুপ চুপ, গোল মৎ করো'' রবে চারিদকে গোল বেড়ে গেল, সুতরাং মহারাজ আর আত্মগোপন করতে পারলেন না। শেষে অনেক দান-ধ্যান হলো, ব্রাহ্মণ লোকেরাও বহুতর জিনিস লাভ করলেন, অবশেষে মহারাজ স্বস্থানে প্রস্থান করেন। পাণ্ডাজির গল্প শেষ হতে না হতে আর একজন পাণ্ডা আর এক গল্প আরম্ভ করলে; তার গল্পটাও এই রকমই, তবে প্রভেদের মধ্যে এই যে, এতে যেমন মহারাজের অমাত্যগণ এসে তাঁকে নিয়ে চললেন, তাতে সে রকম কেহ আসেনি, মহারানি স্বয়ং এসেছিলেন; কিন্তু তিনি মহারাজের মৃতদেহ ভিন্ন তাঁকে জীবিত দেখতে পান নি, সুতরাং এখানে শ্রাদ্ধ দানধ্যানাদি

সমাপ্ত করে, হরকোপানলে মদনভস্ম হলে রতি যেমন শূণ্য প্রাণে পতির মৃতদেহ ত্যাগ করে বিলাপ করতে করতে সুরপুরে ফিরে গিয়েছিলেন, রানি তেমনি স্বরাজ্যে ফিরে গেলেন। পাণ্ডা ও ব্রাহ্মণেরা যে এই রকম করে মধ্যে মধ্যে চর্ব্যচোষ্য আহার ও প্রচুর দক্ষিণা লাভ করে, তারা তা আমাকে জানাতে ত্রুটি করলেন না। আমি ত তাদের কথায় এই বুঝলুম যে, ''তুমি একজন ছদ্মবেশী মহারাজা, আমরা নারায়ণের কৃপাবলে তোমায় চিনেছি, আর গোপন করতে পারবে না, এখন আমাদের কি দেবে তা দেও।''

আমি কিন্তু এদের অতিস্তুতিবাদে ভারি বিপন্ন হয়ে পড়েছিলুম। আমার সেই অপরিচ্ছন্ন ঝাঁকড়া চুল, ছিন্নবস্ত্র ও জীর্ণ কম্বলের মধ্যে হতে তারা কি-রূপে যে রাজা-রাজড়ার গন্ধ আবিষ্কার করলে, তা আমি অনুমান করতে পারলুম না। তার চেয়ে বরং স্বামীজির তেজোময় শরীর, আভূমিচুম্বিত দাড়ি, গৈরিক বসন, গৈরিক আলখাল্লা এবং গৈরিক থানের প্রকাণ্ড পাগড়িতে আবৃত মস্তক দেখলে তার মধ্যে একটা মহারাজ সংগুপ্ত, এমন বিবেচনা করা নিতান্ত অসঙ্গত হতো না। যাহোক ক্রমে যখন আমরা বদরিকাশ্রমের অত্যন্ত কাছে এলুম, তখন ধীরে ধীরে পাণ্ডার দল পুষ্ট হতে লাগলো এবং তারা নিজেদের বাহাদুরি দেখিয়ে আমাকে কাড়াকাড়ি করবার উপক্রম করলেন। ক্রমে তাদের মধ্যে মুখোমুখি ছেড়ে শেষে হাতাহাতি হয় দেখে আমার ভারি ভয় হলো। আমি তখন উপায়ান্তর না দেখে আমরা মুষ্টিযোগ ত্যাগ করলুম, বললুম আমার পাণ্ডা লছমীনারায়ণ। জানতুম লছমীনারায়ণ বয়সে প্রায় সকল পাণ্ডা অপেক্ষা ছোট হলেও সম্মানে, অর্থগৌরবে অন্য সকল পাণ্ডাকে ছাড়িয়ে উঠেছিল। লছমীনারায়ণ মহাধর্মাশ্রমের আখড়াধারী, এ সাগরে সেই কর্ণধার; সুতরাং তার নাম বলবামাত্র অন্যান্য পাণ্ডাদের উৎসাহ একেবারে নিবে গেল। তখন তার অন্য উপায় না দেখে, 'ব্রাহ্মণ আশীর্বাদ করবে, তাতে মঙ্গল হবে', ইত্যাকার ধূয়া ধরে কিঞ্চিৎ আদায়ের চেষ্টা দেখতে লাগলো। নিরাশ করা বড় ভাল দেখায় না মনে করে মিষ্টবাক্যে তাদের কিঞ্চিৎ আশা দিয়ে পুরী প্রবেশ করলুম।

বদরিনাথ

২৯ মে, শুক্রবার। কাঠের একটা সাঁকো দিয়ে অলকানন্দা পার হয়ে ধীরে ধীরে বদরিনাথে প্রবেশ করলুম। আঘাতের পর প্রতিঘাত স্বাভাবিক নিয়ম। বদরিনাথের পথে যখন চলছিলুম, তখনকার সেই উৎসাহ, আগ্রহ; মনের ভয়ানক আবেগ, অভীষ্ট স্থানে এনে সে সমস্তই যেন সংযত হয়ে গেল। এই রকমই হয়ে থাকে।
পথে যখন অবিশ্রান্ত সংগ্রাম করতে হয়েছে, তখন মনে হয়েছিল এই নিদারুণ যুদ্ধের অবসানে এমন একটা কর্মশীলতার মধ্যে গিয়ে পড়বো, যেখানে পূজার্চনার অবিরাম কলরবে, মানব হৃদয়ের সুখদুঃখ ও হর্ষের বিপুল উচ্ছ্বাসে এক সুগভীর কল্লোল উত্থিত হচ্ছে। নদীর জলপ্রবাহ সমুদ্রের ফেনিল ঊর্মিরাশির নির্বোধ নৃত্যের মধ্যে মিশে গিয়ে যেমন হারিয়ে যায়, সেরূপ হিন্দুর মহাতীর্থে, নারায়ণের পুণ্য পীঠতলে, দেবমহিমার এক অনন্ত প্রশান্তির মধ্যে আমার এই ক্ষুদ্র জীবনের ব্যাকুল-বাসনা ও অশ্রান্ত উদ্বেগও সমাহিত হবে। কিন্তু এখানে পৌঁছে কেমন নিরাশ হয়ে পড়লুম।

বদরিনাথে প্রথম প্রবেশ করেই চারিদিকে একটা নিরুদ্যম, একটা উদাসীন ভাব চোখের সম্মুখে পড়লো। মনে হলো, এ উদাসীনতা বুঝি হিন্দুধর্মের মর্মে মর্মে বিজড়িত। তীর্থযাত্রীদের উদ্যম উৎসাহে কি হবে, একটা অলস কর্মহীনতা তীর্থস্থানে যেন চিরস্থায়ী রকমের আড্ডা বেঁধেছে। অলকানন্দা অতি নিরুদ্‌বেগে মন্থর গমনে বরফরাশির নীচ দিয়ে চলে যাচ্ছে; শহরের অধিকাংশ ঘরবাড়ি এখন পর্যন্তও বরফের তলায় পড়ে আছে। যে কয়খানা ঘর দেখা যাচ্ছে, তাদের অবস্থাও অতি শোচনীয়; তাহা কতক বরফের প্রসাদাৎ, আর কতক আমাদের পূর্বাগত সন্ন্যাসী মহাশয়দের কৃপায়, আর কতকগুলি ঘর এই তিন বৎসরকাল ধরে বন্ধ থাকাবশত নষ্ট হয়ে গেছে; বিশেষ সন্ন্যাসী মহাশয়েরা ক্ষতি করেছেন কিছু বেশি। ঘরের দরজা–জানালাগুলি বেবাক অন্তর্হিত হয়েছে। অবশ্য সেগুলি যে সশরীরে স্বর্গে গিয়েছে, তা নয়; যে সকল সন্ন্যাসী সর্বপ্রথমে এখানে এসেছিলেন, তাঁরা দেখেছিলেন তখনও হাট বাজার বসেনি সুতরাং জ্বালানি কাঠ পাওয়া অসম্ভব; তাই আপনাদিগকে শীতের হাত থেকে রক্ষা করবার জন্য এই সমস্ত জানালা দরজা ব্রহ্মাকে উপহার দিয়েছেন, এবং তীর্থস্থানে এসে পরের জিনিসপত্র নাশ করে ''আত্মানং সততং রক্ষেৎ'' এই মহানীতি–বাক্য অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্যে তাঁদের মহৎ হৃদয় যে কিরূপ ব্যাকুল হয়ে উঠেছিল–এই সমস্ত জানালা দরজার অভাব তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। কিন্তু পরে যে সকল যাত্রী আসবে, তারা এই বরফ–রাজ্যে এসে এদের অভাবে যে কত কষ্ট পাবে এ কথা চিন্তা করবার বোধ করি তাঁদের অবসর হয় নি।

পুরপ্রবেশ করার আগে যে সকল পাণ্ডা আমাকে পেয়ে বসেছিল, তাদের হাত থেকে যে রকম ভাবে অব্যাহতি পেলুম, সে কথা পূর্বেই লিখেছি। বদরিনারায়ণে এসে কোথায় উঠবো তা লছমীনারায়ণ আমাদের দেবপ্রয়াগেই বলে দিয়েছিল। যাঁর শ্রী হস্তলিখিত সেই ঠিকানা এখনও আমার ডায়ারি বইয়ে আছে; তা এই – ''কূর্মধারিকি উপর মোকাম, লছমীনারায়ণ পাণ্ডা, বেণিপ্রসাদ রামনাথকী চাচী।'' – প্রথম কথাগুলির অর্থ বুঝেছিলুম যে কূর্মধারার উপরে লছমীনারায়ণ পাণ্ডার বাড়ি, আর সেখানে বেণিপ্রসাদ আছেন। তা সে বেণিপ্রসাদ মানুষই হোন আর লছমীনারায়ণের গৃহবিগ্রহই হোন। কিন্তু শেষের দিকটার অর্থ নিতান্ত হেঁয়ালির মত বোধ হওয়াতে সে অর্থ নিষ্কাশনে অসমর্থ হয়ে তখনই লছমীনারায়ণকে সে কথা জিজ্ঞাসা করেছিলুম; কিন্তু কি কারণে জানিনে, উক্ত পাণ্ডা শ্রেষ্ঠ ঐ কথা কয়টির অর্থ সম্বন্ধে আমাকে সজ্ঞান কারানোর আবশ্যকতা মোটেই অনুভব করে নি। আমার কৌতূহল প্রবৃত্তির আগ্রহাতিশয্য দেখে উপরন্তু বলেছিলেন, ''বস্‌ উয়ো বাৎ বোলনেসেই ডেরা মালুম হোগা'' – সুতরাং কথাটা আর মোটেই বোঝা হয় নি। কিন্তু এখনও মনে পড়ে সেদিন সমস্ত অপরাহ্নটা এই কথার অর্থনির্ণয়ের জন্যে বৈদান্তিক ভায়ার সঙ্গে কিরূপ অনর্থক বাক্যব্যায় করতে হয়েছিল। বৈদান্তিক শুধু তার্কিক নন, একজন ভারি সুরসিক ও সমজদার লোক; তাই তাঁর প্রথমেই সন্দেহ হলো এই বেণিপ্রসাদ লোকটা লছমীনারায়ণের হয় শ্যালক, না হয় ভগিনীপতি। সম্বন্ধটা কিছু মধুরসাত্মক বলেই পাণ্ডার পো আমাদের কাছে তার মর্মভেদ করা বাহুল্য জ্ঞান করেছিল। যা হোক বৈদান্তিক শুধু এই অনুমানের উপর নির্ভর করে ক্ষান্ত হলেন না, এবং আমিও এই অনুমানের বিরুদ্ধে কিঞ্চিৎ প্রতিবাদ করেছিলুম, সুতরাং তিনি কথাটার ধাতু ও শব্দগত অর্থ বের করবার জন্য প্রস্তুত হলেন। গভীর গবেষণা ও প্রচুর চিন্তার পর শেষে তিনি এই স্থির করলেন যে, সেখানে বেণিপ্রসাদ আছে এবং রামনাথের খুড়ি আছেন, কেন না ''চাচী'' শব্দের অর্থ খুড়ি ছাড়া আর কিছু হতেই পারে না; কাজেই ''রামনাথকি

চাচী'' এক সম্পূর্ণ পৃথক ব্যক্তি। তবে স্ত্রীলোকের নাম ধরে আড্ডা খুঁজতে হবে, এই যা মনের মধ্যে একটা খটকা লেগে রইল। বৈদান্তিক বলে বসলেন, জায়গায় জায়গায় অমনতর দুই একটা স্ত্রীলোক থাকে, পুরুষের চেয়ে তাদের খ্যাতি অনেক জেয়াদা। বলা বাহুল্য স্বয়ং লছমীনারায়ণ আমাদের সঙ্গে আসতে পারে নি, কারণ সে আরও কয়েকদিন দেবপ্রয়াগে না থাকলে অনেক নূতন যাত্রী তার বেদখল হয়ে যাবে, তার এই ভয় ছিল; তবে সে আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে শীঘ্রই সে আমাদের সঙ্গে এসে মিশবে। যা হোক বদরিনাথে এসে সেই ''রামনাথকি চাচী'' অনুসন্ধানে বেশি নিগ্রহ ভোগ করতে হয় নি; সকল পাণ্ডাই তীর্থের কাকের মত রাস্তায় বসে থাকে; যখন তারা শুনলো যে আমরা লছমীনারায়ণের লোক, তখন তাদের মধ্যে একজন এসে নিজেকে বেণিপ্রসাদ বলে পরিচয় দিলো। বেণিপ্রসাদের আকার প্রকার কি রকম তা আমরা কেউই জানতুম না, সুতরাং কলিকাতা, কালীঘাট, কি ঐ প্রকার কোন স্থানে হলে স্বঃতই সন্দেহ হতো যে, হয়ত বা একটা জাল বেণিপ্রসাদ এসে আমাদের স্কন্ধে ভর করেছে এবং গোলযোগের মধ্যে যখন আসল বেণিপ্রসাদটা বেরিয়ে পড়বে তখন আমাদের এক বিষম মুশকিলে পড়তে হবে। কিন্তু বদরিনাথের মত স্থানের এখনও অতটা অধঃপতন হয় নি ! সুতরাং ঐ লোকটা বেণিপ্রসাদ বলে পরিচয় দেবামাত্র আমরা অসংকোচে তার সঙ্গে চলতে লাগলুম।

কিন্তু বেণিপ্রসাদ বেচারিও আমাদের নিয়ে মহা বিপদে পড়লো। তাদের ঘরবাড়ি এখনও বরফে ঢাকা, আরও পনেরো ষোলো দিন না গেলে তারা বরফস্তূপের মধ্যে হতে প্রকাশ হচ্ছে না। বেণিপ্রসাদ নিজে অন্য লোকের একটা কুটির দখল করে বাস করছে; সুতরাং এ রকম অবস্থায় সে আমাদের কোথায় রাখে, এই ভাবনাতে অস্থির হযে পড়লো। যা হোক, শেষে সে পাহাড়ের উপর আর একজনের একটা ঘরে আমাদের আড্ডা স্থির করে দিলো। এই ঘর যার সে তখনও এখানে এসে পৌঁছে নি; আমাদের আশঙ্কা হতে লাগলো, ঘরওয়ালা হঠাৎ এসে আমাদের প্রতি অর্ধচন্দ্রের ব্যবস্থা না করে, কারণ, এরা বিলক্ষণ অতিথিপরায়ণ হলেও অতিথিসেবার পুণ্যটুকু তাদের জন্যে রেখে অন্য লোকে যে তার অর্থগত উপস্বত্বটুকু ভোগ করবে, এদের পক্ষে তা অসহ্য। কিন্তু অনর্থক উদ্বিগ্ন হওয়াতে কোন লাভ নেই, ভেবে আমরা সেই ঘরেই আড্ডা গাড়বার জোগাড় করে নিলুম। ঘরটি বেশ লম্বা চওড়া বটে, কিন্তু তার আভ্যন্তরিক অবস্থা অতি শোচনীয়, দ্বারগুলি পূর্বাগত সন্ন্যাসীদের অগ্নিসেবায় লেগেছে। রাত্রে দুর্জয় শীত আসছে; তখন এই ঘরে কি করে তিষ্ঠানো যাবে, এখন এই চিন্তাতেই আমরা সকলে ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লুম। সন্ধ্যা হতেও আর বেশি দেরি নেই। সন্ধ্যার সময় একবার নারায়ণ দর্শনে যাব – ইচ্ছা ছিল, কিন্তু শুনলুম অপরাহ্নেই নারায়ণের দ্বার বন্ধ হয়ে গিয়েছে, সুতরাং রাত্রিযাপনের জন্যে আগুনের জোগাড়ে প্রবৃত্ত হওয়া গেল। সন্ধ্যার পূর্ব হতেই বড় শীত বোধ হতে লাগলো এবং সর্ব শরীর পুরু কম্বলে ঢাকা থাকা সত্ত্বেও শীতে সর্বাঙ্গ অবশ হয়ে এল। শুনেছি মহাকবি কালিদাসকে কে একবার জিজ্ঞাসা করেছিল ''মাঘে শীত না মেঘে শীত ?'' – তার উত্তরে কবিবর নাকি বলেছিলেন, ''যত্র বায়ু তত্র শীত।'' তখন বদরিকাশ্রম দর্শন করতে এলে কালিদাস তাঁর এই উত্তরের অসারতা বুঝে নিশ্চয়ই লজ্জিত হতেন। চারিদিকে উঁচু পাহাড়ে বায়ু প্রবাহশূণ্য স্থানেও যে রকম তীর্থযাত্রী এ সকল স্থানে আসে , তাহারাই তা মর্মে মর্মে অনুভব করে। তবু ত মে মাস, মাঘমাসে প্রবল শীত অনুভব করবার শক্তি মানুষের নাই। আমরা বহু কষ্টে কাষ্ঠ সংগ্রহ করে আগুন জ্বাললুম এবং তার পাশেই শয্যারচনা করা গেল। সে রাত্রে কিছুই আহার হল না।

হিমালয় পর্বতের মধ্যে এতদূরে জনমানবশূণ্য চিরতুষাররাশির ভিতরে এতখানি সমতলভূমি দেখলে প্রাণে বড়ই আনন্দ বোধ হয়। হরিদ্বার থেকে যাত্রা করে এতদূর এসেছি, এর মধ্যে যা কিছু অল্প সমতল জমি দেখেছি তা শ্রীনগরে ভিন্ন সমস্ত জায়গাই ''কুব্জপৃষ্ঠ ন্যুব্জদেহ'' অষ্টাবক্রবিশেষ। হরিদ্বার হতে বদরিকাশ্রম দুই শত মাইলেরও বেশি। একে তো হিমালয় প্রদেশের প্রাকৃতিক দৃশ্য বড় গম্ভীর; এ গাম্ভীর্যের সহিত স্বঃতই সাগরের গাম্ভীর্য তুলনা করতে ইচ্ছা হয়। কিন্তু এই দুই জিনিসের মধ্যে আশ্চর্য রকমের তফাৎ। একটি মহা উচ্চ, অসমান, সুদীর্ঘ শ্যামল বৃক্ষশ্রেণীর চিরন্তনের বাসভূমি – আর একটি সুগভীর নীলিমায় সমাচ্ছন্ন, তবু এ দুইয়ের মধ্যে কেন যে তুলনার কথা মনে আসে, তা ঠিক বলা যায় না; বোধ করি, এই উভয়কে দেখেই আর একজনের কথা মনে পড়ে; এই মহান সৌন্দর্যের মধ্যে বিশ্বপিতার মহিমা ব্যাপ্ত আছে, তাই একটি দেখে আর একটির কথা মনে উদয় হয়। হিমালয়ের একেই ত গম্ভীর দৃশ্য তার উপর বদরিকাশ্রমের দৃশ্যটা আরও গম্ভীর। দুই দিকে দুইটা পর্বত একেবারে আকাশ ভেদ করে দাঁড়িয়েছে এবং তাদের স্তব্ধ ছায়া বদরিকাশ্রমকে ঢেকে ফেলেছে। পাণ্ডাদের মুখে শুনলুম, এই দুইটি পর্বতের একটির নাম 'নর' অপরটির নাম 'নারায়ণ'। আরো শুনলুম এই পর্বতদ্বয়ের অঙ্গ ক্রমেই বিস্তৃত হচ্ছে। শাস্ত্রে না কি লেখা আছে, ক্রমে এরা বর্ধিত কলেবর হয়ে নারায়ণের মন্দির ঢেকে ফেলবে সুতরাং বদরিকাশ্রম তীর্থ চিরদিনের মত হিমালয়ের পাষাণ–বক্ষে লুকিয়ে যাবে। তবে পাণ্ডারা এই ভরসা করে যে দুই চারিশত বছরের মধ্যে সে রকমের দুর্ঘটনা ঘটার কোন সম্ভাবনা নেই; কাজেই আশু দরিদ্রতার আক্রমণ সম্বন্ধে তারা নিরাপদ; তবে তাদের ভবিষ্যদ্‌বংশীয়দের যথেষ্ট আশঙ্কা রইল বটে।

যে উপত্যকার উপর বদরিকাশ্রম প্রতিষ্ঠিত, তা অতি সুন্দর। শুধু ভক্তের নয়, কবিরও এখানে উপভোগের যথেষ্ট সামগ্রী আছে। এই পুণ্যভূমি ভেদ করে অলকানন্দা প্রবাহিত হচ্ছে; কিন্তু বছরের বেশি সময়েই তা বরফে আচ্ছন্ন থাকে, এখনও ইহা বরফে ঢাকা। আরও কিছুদিন পরে বরফ গলে তার ললিত তরল স্রোতে ভেসে যাবে ! সে দৃশ্য ভারি সুন্দর।

বদরিকাশ্রম উত্তর দক্ষিণে লম্বা; দীর্ঘ বোধ হয় ৪০০ ফিটের বেশি নয়, কিন্তু অসমান পাহাড়ের মধ্যে এই স্থানটুকু খুব দীর্ঘ বলে বোধ হয়। দীর্ঘে এতখানি হলেও প্রস্থে বেশি নয়, আরও দেখলুম প্রস্থদেশ খানিকটা ঢালু, কিন্তু বিশেষ মনযোগ দিয়ে দেখলে তবেই তা বুঝতে পারা যায়, নহিলে সহসা বোধগম্য হয় না। দূরের পর্বত হতে অনেকগুলি ঝর্না বের হয়ে অলকানন্দায় পড়েছে এবং নদীর বরফ ভেদ করে সেই জল ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে। উপরে যে কূর্ম–ধারার কথা বলেছি, তা এই বদরিনাথের বাজারের মধ্য দিয়ে নেমে নদীতে পড়েছে। এই ঝরনাতে বাজারের লোকের যথেষ্ট উপকার হয়। কূর্মধারা ছাড়া বাজারের পাশেই আর একটা ঝরনা আছে। বাজারে যে কতগুলি দোকান আছে, প্রথম দৃষ্টিতে তা ঠিক বুঝতে পারলুম না; এখনও অনেকগুলি দোকান বরফের নীচে সুপ্তাবস্থায় লুপ্ত আছে, কিন্তু সমস্ত ঘর বাড়ির একটা সঠিক ধারণা না হলেও বোধ হলো পাণ্ডাদের বাসস্থান ও দোকান সবশুদ্ধ ত্রিশ পঁয়ত্রিশখানা ঘরের বেশি হবে না। বাজারে দরকারি জিনিসপত্র সকলই পাওয়া যায়; তবে দরকার অর্থে যদি কেহ অনুমান করে থাকেন

জুতা, ছাতা, সাবান, পমেটম ইত্যাদি শৌখিন রকমের জিনিসপত্র সব পাওয়া যায়, তবে আমি কথা ফিরিয়ে নিচ্ছি। পাহাড়ের মধ্যে এসে অনাবশ্যক বহুবিধ দরকারি জিনিসের কথা একেবারে ভুলে গিয়েছিলুম; আবশ্যক বোধ হতো আটা, ভাল ঘি, লবণ লংকা, আর কাঠ। আর বাঙালি মানুষ অনেকদিন উপরি উপরি ডাল রুটির শ্রাদ্ধ করতে করতে এক এক দিন চাট্টি ভাতের জন্য প্রাণ আকুল হয়ে উঠতো, সুতরাং মধ্যে মধ্যে চাউলের খোঁজও না হতো এমন নয়। তার উপর যে দিন বড়ই নবাবি করার প্রবৃত্তি হতো, সেদিন গোটা দুই চারি '·পেড়া'´ (সন্দেশ) আয়োজন করা যেত; কিন্তু এ রকম দুঃসাহস প্রকাশ করতে প্রায়ই ভরসা হতো না – কারণ, সে সকল সন্দেশের জন্মদিন ঠিক করতে হলে বহুদর্শী প্রত্নবিৎ পণ্ডিতকে যত্নপূর্বক ইতিহাস অনুসন্ধান করতে হয়; কত কীটই যে তার মধ্যে বাসা বেঁধে বংশানুক্রমে বাস করছে তার ঠিক নেই। এখানে যে কয়খানা দোকান আছে, তার সকলগুলিতে কিছু না কিছু খাদ্যদ্রব্যের জোগাড় থাকে, আর প্রত্যহ ছাগলের পিঠে বোঝাই দিয়ে অনেক জিনিসের আমদানিও হয়। আমাদের দেশে যেমন গাড়ি কি বলদ বা ঘোড়ার উপর জিনিসপত্র চাপিয়ে একস্থান থেকে অন্যস্থানে নিয়ে যাওয়া হয়, এ দেশে সে রকম হবার জো নেই। পাহাড়ে ঘোড়াই হোক আর বলদই হোক, এই সকল দুর্গম পথে তারা বোঝা বইতে সম্পূর্ণ অশক্ত। একে পথ দুরারোহ, তার উপর এত সংকীর্ণ যে, বৃহৎকায় পশু সে সকল পথে চলাফেরা করতে পারে না; আর যদি বা তা সম্ভব হয় ত শীঘ্রই তারা হাঁপিয়ে পড়ে। ক্ষুদ্রকায় কষ্টসহ ছাগলজাতিই এ পথের একমাত্র অবলম্বন; এবং তাদের উপরই এ দেশের লোকের জীবন নির্ভর করছে। বাংলাদেশে যখন ছিলুম, তখন জানতুম, মা দুর্গার কাছে বলি দেওয়া ছাড়া ছাগলের ছাগজন্ম সার্থকের আর কোন পথ নাই, এমন কি ছাগমাংসে উদর পরিতৃপ্তির আশায় মুগ্ধ গুপ্ত কবি লিখে গিয়েছেন, ''যেমন পাঁঠার নাম যে রেখেছে বোকা, শুধু সেই বোকা নয়, তার ঝাড়ে বংশে বোকা।'' উদর–পরায়ণতার বশবর্তী হয়েই তিনি রহস্যপূর্বক মানবসন্তানকে লক্ষ্য করে উক্তপ্রকার মন্তব্য প্রকাশ করেছেন। এতদ্‌ভিন্ন কবিরাজ মহাশয়ের বৃহৎ ছাগলাদ্য ঘৃত সেবনে দেহ পুষ্ট এবং ছাগলদুগ্ধ পানে উদরাময় নিরাকৃত হয়, এরূপও শুনা গিয়েছে। এই জন্যই আমাদের দেশে ছাগবংশের প্রতি যা কিছু কৃতজ্ঞতা; কিন্তু এই বরফরাজ্যে এসে দেখি ছাগলের দ্বারাই এখানে রেলওয়ের কাজ চলছে এবং ছাগলই এ দেশের সুখসমৃদ্ধির কারণ হয়ে রয়েছে। প্রতিদিন কত ছাগলের পিঠে কত জিনিস চাপিয়ে পাহাড় হতে পাহাড়ান্তরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে; কিন্তু কোনোদিনও তাদের পদস্খলণের কথা শুনতে পাওয়া যায় না। তবে এরা যেমন ছোট জানোয়ার, তেমনি অল্প বোঝা বয়। ছাগলের পিঠে দশ সেরের বেশি বোঝা চাপাতে দেখি নি, কিন্তু তার চেয়েও ভারি বোঝা বইতে পারে। বোধ হয় অনেকদূর চলতে হয় বলে বোঝা লঘু করা হয়। আর যখন দলে দলে ছাগল এই কাজে লাগান হয়, তখন বোঝা ছোট হওয়াতে ব্যবসায়ীদের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না, বরং বেশি বোঝা দিলে যদি কোন ছাগল পথের মধ্যে অক্ষম হয়ে পড়ে ত বিপদের কথা। এই সকল ছাগল যে শুধু এই তীর্থস্থানের ও হিমালয় প্রদেশের লোকের খোরাক বয় এমন নয়, ভোট ও তিব্বতের লোকেরাও লবণ প্রভৃতি তাদের দুষ্প্রাপ্য জিনিস কেনবার জন্যে দলে দলে ছাগল নিয়ে আসে। চৈত্র, বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে এবং আষাঢ়ের কয়েকদিন পর্যন্ত প্রতিদিন দলে দলে লম্বকর্ণ বৃহদাকৃতি ছাগল যাতায়াত করে। তারপর যখন বর্ষা নামে, তখন স্থানে স্থানে বেগবতী ঝরনা সকল হতে অবিশ্রাম জল ঝরতে থাকে; পথও দারুণ পিচ্ছিল হয়। তখন চলাচল এক রকম অসম্ভব হয়ে উঠে। তারপর

শীতকাল – তখন ত বরফে রাস্তাঘাট একেবারে বন্ধ হযে যায়, সুতরাং যা কিছু কেনা–বেচা তা এই কয় মাসের মধ্যেই শেষ করে নিতে হয়।

বদরিনাথে একটি মন্দির আছে। মন্দিরটি দেখতে তত পুরাতন বলে বোধ হয় না; তবে অল্পদিনের তাও নয়। মন্দিরের বাহিরে চারিপাশে সামান্য একটা উঠান। এই উঠানের চারিদিকের একটা একমহল ছোট চক, তাতে অনেক ছোট দেবতার অধিষ্ঠান আছে। নারায়ণের সঙ্গে এই সকল দেবতার কোন পার্থিব সম্বন্ধ নেই, এইগুলি পাণ্ডাঠাকুরদের রোজগারের অবলম্বন মাত্র। নারায়ণের প্রাঙ্গণে যখন এদের স্থান হয়েছে তখন এঁরা মাহাত্ম্য অংশে নিতান্ত খাটো নয়, এই হেতুবাদে পয়সাওয়ালা অনেক যাত্রী এই সকল বিগ্রহের মাথায় দুই এক পয়সা চড়ায় (অর্থাৎ প্রণামি দেয়)। মন্দির–প্রাঙ্গণে প্রবেশ করবার একটা দ্বার আছে, তার কপাট অতি প্রকাণ্ড। মন্দিরটি আমাদের দেশের মন্দিরের মতই। মন্দিরের গায়ে বিশেষ কোন কারুকার্য দেখলুম না; আমাদের দেশের সাধারণ মন্দিরগুলি যে রকম বৈচিত্র্য–বিহীন, এও তাই ; তবে দেবমাহাত্ম্যেই এর মাহাত্ম্য এত বেশি। উঁচুতে কালিঘাটের মন্দিরের চেয়েও খাটো বলে বোধ হলো; মতবে এটি আগাগোড়া পাথরের গাঁথা, এ পাথরের রাজ্যে পাথরের উপর যে মন্দির নির্মিত, তার পক্ষে এটা কিছু আশ্চর্য কথা নয়, বরং ইষ্টকনির্মিত হলেই একটু আশ্চর্য হবার কারণ থাকতো। এদিকে যতগুলি মন্দির দেখলুম সবগুলিই পাথরে গাঁথা।

মন্দিরটি জীর্ণ হয়েছে; কিন্তু আগেই বলেছি বাহ্যদৃশ্যে তেমন জীর্ণ বলে বোধ হয় না। সকলের বিশ্বাস এ মন্দির শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত। এ কথা অবিশ্বাস করবার কোনো কারণ নেই; ইহা বহু প্রাচীন জনপ্রবাদ, এবং তার কতক প্রমাণও যে নেই এমন নয়। কিন্তু মন্দিরটি দেখলে কেহই বিশ্বাস করবেন না যে, এটি শঙ্করাচার্যের প্রতিষ্ঠিত – এমন আধুনিকের মত দেখায় ! আমি প্রথমে একটু আশ্চর্য হয়েছিলুম, কিন্তু পরে ভেবে দেখলুম, যে মন্দিরটি বছরে আট মাস বরফের মধ্যে ঢাকা থাকে, রৌদ্র–বৃষ্টির সঙ্গে বড় একটা দেখা সাক্ষাৎ হয় না, সুতরাং তার উপরের দিকে ময়লা ধরবার অতি অল্পই সম্ভাবনা। কিন্তু আর বেশি দিন বে–মেরামত অবস্থায় রাখা উচিত নয় ভেবে মন্দিরাধ্যক্ষ এর মেরামত আরম্ভ করেছেন। তবে কতদিনে যে এই কাজ শেষ হবে, কখনও হবে কি না, তা ভবিষ্যৎ–জ্ঞান না থাকলে শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে বলা ভারি শক্ত। হয় ত মেরামত শেষ হতে না হতে আরও দু'চারজন মহান্তের জীবনকাল কেটে যাবে; কারণ একে ত বছরের দু তিন মাসের বেশি কাজ হবার জো নেই, তার উপর যে রকম 'গদাইলস্ক' ভাবে কাজ চলছে, তাতে একদিক গড়ে তুলতে আর এক দিক ভেঙে না পড়ে। হায় কলিকাল ! স্বয়ং বিশ্বকর্মা থাকতে নারায়ণের মন্দির মেরামতের জন্য আজ কিনা সামান্য রাজমিস্ত্রিরা তাদের দুর্বল হাতে ছোট ছোট পাথরের চাপ নিয়ে টানাটানি করছে এবং যতটুকু কাজ করছে তার চেয়ে অনেক বেশি পয়সা ফাঁকি দিয়ে খাচ্ছে, এদের নরকেও স্থান হবে না।

এখন পর্যন্ত অদৃষ্টে নারায়ণ দর্শন ঘটেনি ; কিন্তু বাল্যকাল হতে শুনে আসছি, বদরিকাশ্রমের নারায়ণের মূর্তি, পরশ পাথরে নির্মিত। স্পর্শমণি উপকথার বস্তু, কল্পনা ও কবিতাতে কখন কখন তার শক্তি অনুভব করা যায় বটে; কিন্তু এই পৃথিবীতে যদি সে রকম একটা জিনিসের অস্তিত্ব থাকতো, তা হলে এই ঘোর জীবনসংগ্রামের দিনে

অনেকের পক্ষে সুবিধার কথা ছিল৷ বাটা বিভ্রাটের ভয়টা ত কমে যেতই, তা চাড়া ইনকামট্যাক্সের জন্যও এত কষ্ট পেতে হতো না, এবং অনাহারে থেকে ভদ্রতার দণ্ডস্বরূপ ঘটি বাটি বিক্রয় করে ট্যাক্স দেবার দায় হতেও অনেকাংশে নিষ্কৃতি পাওযা যেত৷ কিন্তু কবিতায় ও কল্পনাতে যা মেলে, এ নিষ্ফলতার পৃথিবীতে তা কোথা হতে মিলবে ? দেশে থাকতে কতদিন শুনেছি, কখনো ঠাকুমার কাছে কখন বাচস্পতি মহাশয়ের বক্তৃতাতে যে, – হিমালয় পর্বতে এমন সব যোগী ঋষি আছেন , যাঁরা যোগবলে ভস্মকে কাঞ্চন এবং বিষয়কে অমৃত করতে পারেন৷ কিন্তু দুরদৃষ্টবশত এ পর্যন্ত বিষের জ্বালা অনেক সহ্য করলুম বটে , কিন্তু অমৃতের আস্বাদন ত বড় একটা হলো না; তা হলে বোধ করি আবার এ সংসারের কর্মভোগের মধ্যে এসে পড়তে হতো না৷ তবে এইটুকু বলা যেতে পারে যে, অমৃতের আস্বাদ না পাই, এমন এক আধজন সন্ন্যাসী দেখা গিয়াছে বটে, যাঁরা সচ্চিদানন্দের করুণামৃত–ধারা পান করে জীবনকে কৃতার্থ করেছেন; কিন্তু তাঁদের কোন কথা জিজ্ঞাসা করা ঘটে নি, তাঁদের স্বর্গীয় জ্যোতির সম্মুখে উপস্থিত হলে সাংসারিক আসক্তিপূর্ণ বাসনা ও চিন্তা ভস্মীভূত হয়ে যায়৷ কিন্তু আমাদের পাপ–হৃদয়ে যে আশ্বাসবাণীর ঘোষণা হয়, আমরা তার উপযুক্ত নই, সুতরাং দু দিনের মধ্যে সে কুহকও অন্তর্হিত হয়ে যায়৷ তখন বাস্তবিকই একটা অনন্ত যাতনায় প্রাণ আকুল হয়ে উঠে, এবং কাতর হৃদয় বিদীর্ণ করে স্বতঃই ধ্বনিত হয় –

''যাহা পাই তাহা ঘরে নিয়ে যাই, আপনার মন ভুলাতে,
শেষে দেখি হায় ! ভেঙে সব যায়, ধূলা হয়ে যায় ধূলাতে৷
সুখের আশায় মরি পিপাসায়, ডুবে মরি দুখপাথারে;
রবি শশী তারা কোথা হয় হারা, দেখিতে না পাই তোমারে৷''

রাত্রে শুয়ে হি হি করে কাঁপতে কাঁপতে কত কথাই ভাবতে লাগলুম৷ বৈদান্তিকের সুখনিদ্রাটা আমার কাছে নিতান্ত চক্ষুশূল বলে বোধ হচ্ছিল৷ বিশেষ যতক্ষণ ঘুম না আসে চুপ করে পড়ে আকাশ পাতাল চিন্তা করার চেয়ে ততক্ষণ কথা বলাতে বোধ করি একটু বেশি আরাম আছে; কিছু না হোক, কথাবার্তায় শীতের প্রকোপ অনেক কম বিবেচনা হয়৷ অতএব বৈদান্তিকের ক্লান্তিকর নিদ্রাটুকু বিনষ্ট করতে মনে কিছুমাত্র দ্বিধা উপস্থিত হলো না৷ কাঁচা ঘুম ভাঙাতে বৈদান্তিক বোধ করি আমার প্রতি কিঞ্চিৎ উষ্মাযুক্ত হয়েছিলেন, কিন্তু আমি তাঁকে সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করলুম ''াচ্ছা নারায়ণের দেহ যে, পরশ–পাথরে নির্মিত বলে, এ কথাটার অর্থ কি ? আমি ত অনেক ভেবে কিছু–ই ঠাহর করতে পারলুম না, সত্যি সত্যি পরশ পাথর ত আর নেই !'' – আশু তর্কের একটি সুন্দর সম্ভাবনা দেখে ভায়ার নিদ্রা ও বিরক্তি দুইই এককালে দূর হয়ে গেল ! তিনি সোৎসাহে পার্শ্বপরিবর্তন করে বলতে লাগলেন যে, পরশ–পাথর কথাটার অর্থ নিয়েই আমি গোল করছি৷ আমাদের দেশের সকল বিষয়েরই এক একটা অর্থ আছে – যাকে আজকাল আমরা আধ্যাত্মিক অর্থ বলে থাকি; এবং বৈদান্তিকের মতে কেহ কেহ তার প্রতি অন্যায় কটাক্ষপাতও করে থাকে৷ বোধ হয় তিনি আমার উপর কটাক্ষ করেই কথাটা বললেন; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে তিনি গুরু, আমি শিষ্য, সুতরাং কোন রকম উচ্চবাচ্য না করে শুনতে লাগলুম৷ তিনি অর্ধরাত্রব্যাপী সুদীর্ঘ বক্তৃতাদ্বারা যা বুঝালেন, তার মোদ্দাখানা এই যে, পরশ–পাথরের গূঢ় অর্থ ধর্মা কারণ কল্পিত পরশ–পাথর স্পর্শে যেমন লোহা সোনা হয়ে যায় – তেমনি ধর্মের সংস্পর্শে তুচ্ছ দ্রব্যও মূল্যবান হয় এবং যা নিতান্ত মলিন,

তাও উজ্জ্বল ও তেজোময় হয়ে উঠে; লোকে তখন তা আগ্রহ ভরে কণ্ঠে ধারণ করবার জন্য আকুল হয়। নারায়ণের দেহ পরশ–পাথরে নির্মিত , তার অর্থ কি না, তিনি ধর্মস্বরূপ; তাঁকে স্পর্শ দূরের কথা, দর্শনমাত্র মানুষ খাঁটি সোনা হয়ে যায়। পাপ মনকে যে স্পর্শমণি নিষ্পাপ, পবিত্র করে তুলতে পরে – লোহাকে তুচ্ছ সোনা করার পরশমণি তার কাছে কোথায় লাগে ?

স্বীকার করতে লজ্জা নেই, বাস্তবিক বৈদান্তিক ভায়ার এই বক্তৃতা আমার অতি মিষ্ট লেগেছিল। এমন একটা সার কথা তাঁর কাছে থেকে আমি মুহূর্তের জন্যও প্রত্যাশা করি নি; কিন্তু তাঁর কথা শুনে আমার হৃদয়ে আর একটা নতুন চিন্তার উদয় হলো–হায় ! দেবতার পদতলে এসেও আমার এই জীবনব্যাপিনী চিন্তা দূর হয় নি। আমার মনে হলো এ সংসারে রমণী হৃদয়ই একমাত্র স্পর্শমণি ! দেবতার মহিমা যেখানে প্রবেশ করতে অক্ষম, সেখানেও সে আপনার উজ্জ্বল মহিমা বিকাশ করে এবং পুরুষের কঠোর হৃদয়কে পুণ্যময় ও পবিত্র করে তোলে। আমার একখানি স্পর্শমণি ছিল, হঠাৎ তা হারিয়ে ফেলেছি। দেখি, যদি এই হিন্দুর মহাতীর্থে আর একখানি স্পর্শমণির সন্ধান পাই – যাতে এই পাপভারানত ধূলিম্লান জীবনকে সজীব, উজ্জ্বল ও পবিত্র করে তুলতে পারি !

বদরিকাশ্রমে নারায়ণ দর্শন

বৈদান্তিকের কথার পর আমার কিঞ্চিৎ নিদ্রাকর্ষণ হলেও অতি সকালেই জেগে উঠেছিলাম। কোনো স্থানে উপস্থিত হলে অনেক সময় রাত্রে ঘুম তত গভীর হয় না এবং সকালে সহজে নিদ্রাভঙ্গ হলে প্রাণের মধ্যে যেন একটা অভাব অনুভূত হয়। মনে পড়ে, ছেলেবেলায় যে দিন বিদেশে যাই, তার পরদিন নিদ্রাহীন প্রভাত কেমন অপ্রসন্ন এবং স্নিগ্ধতাবাহী বলে বোধ হয়েছিল। তারপর আর কত বিদেশে বেড়ালাম, এই শেষে কয় বৎসর তো নিত্য নূতন বিদেশে; তবে আজ প্রভাতে উঠেই প্রাণের মধ্যে একটা অভাব অনুভূত হলো কেন ? এ কি মায়া ? মায়াবাদের ঊর্ধ্বে যাঁহার অবস্থান, তাঁহার পুণ্যমন্দিরের দ্বারেও মায়ার প্রভাব।

যা হোক, সে জন্য দেবতার প্রতি আমার অভক্তি হয় নি। শঙ্করাচার্যের সমুজ্জ্বল প্রতিভা মানব মস্তিষ্ককে বিস্মিত করেই ক্ষান্ত হয় নি; তাঁর ধর্মানুরাগ, অতীত ও ভবিষ্যতের মধ্যে শৃঙ্খলাসাধনের জন্য যত্ন, মানবজাতির প্রতি অপক্ষপাত সহানুভূতির পরিচয়, এই মন্দির সগর্বে বহন করছে। এখানে এসে সর্বপ্রথমেই আমাদের হৃদয়ে যে সুপবিত্র মহৎ গীতটি ধ্বণিত হলো, অনেক দিন আগে কলিকাতার আদি ব্রাহ্ম সমাজের এক বার্ষিক অধিবেশনে কোন শ্রদ্ধেয় গায়কের কণ্ঠে তা গীত হতে শুনেছিলাম। সে দিন এগারোই মাঘের প্রভাত, বাহিরে সমুজ্জ্বল সূর্যকিরণ এবং প্রভাতের তুষার শীতল বায়ু প্রবাহ, কিন্তু মণ্ডপের মধ্যে শত শত সহৃদয় ভক্তের সমাগম হয়েছিল। তাঁরা সংযত–হৃদয়ে সচ্চিদানন্দের উপাসনায় মগ্ন, অন্যদিকে উচ্ছ্বাসময়ী ভাষায় ধ্বণিত হচ্ছিল –

> ''গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
> তারকামণ্ডল চমকে মোতি রে।

ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বনরাজি ফুটন্ত জ্যোতিঃ রে।
কেমন আরতি হে ভবখণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে।''

দেবমন্দিরের চারিপার্শ্বে যে পূণ্য ও পবিত্রতা বিস্তৃত আছে, তাই আমাদের অনেক ঊর্দ্ধে নিয়ে যেতে পারে; কিন্তু তীর্থস্থানের দূরদৃষ্ট, বদরিকাশ্রম ভিন্ন আর কোথাও এই সুখ শান্তি স্নিগ্ধভাবে আছে কি না জানি না। আমি ত অনেক দিনই অনেক স্থান হতে অপূর্ণ-হৃদয়ে সরে গিয়েছি। আমার হৃদয় শুষ্ক, ভক্তিহীন, হয় ত তার ঠিক ভাব গ্রহণ করতে পারি নি; তাই বুঝি আশা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু যে দৃশ্য দেবমন্দিরে সর্বদা দেখা যায়, তাতে শুধু আমি কেন অনেকেই ব্যর্থ মনোরথ হন। হয় ত কোথাও খর্পরাঘাতে ছাগ-শিশুর মস্তক রক্তসিক্ত হয়ে ধূলায় গড়াগড়ি যাচ্ছে, কতকগুলি নির্দয় লোক রাক্ষসের ন্যায় নৃত্য করছে; আর কেহ কেহ ভক্তিভরে ''মা, মা'' চীৎকার করছে। এই সকল ভয়ানক দৃশ্যের মধ্যে ভক্তি যে কিরূপে অব্যাহত থাকে, তা বুঝে উঠা আমাদের সাধ্য নয়। আবার কোথাও বা যত রকম মন্দ লোক দল বেঁধে একটা মহা হট্টগোল আরম্ভ করেছে; সে সকল জায়গায় পিতৃ-পিতামহের শ্রাদ্ধ থেকে আরম্ভ করে পরবর্তী তিন লাখ তেষট্টি হাজার বংশধরকে স্বর্গে পাঠানর অতি সহজ ব্যবস্থা হচ্ছে; যে কোন রকমে সংসারের কাজ শেষ করে স্বর্গে প্রবেশ করতে পারলেই মানবজন্ম সার্থক হলো। এখানে কিন্তু তার কিছু সূচনা দেখা গেল না, যেন এখানে অনুষ্ঠান আছে, তার উপদ্রব নেই; মাতৃস্নেহ আছে পুত্রের ভক্তিরও অভাব নেই; সরল ভাব বহুকালের উন্নত-কল্পনা এখানে যেন জমাট বেঁধে তার উপর একটা মহান দেবমহিমা প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। সেই মহিমা অনুভব করে আমরা পরিতৃপ্ত হয়ে যাই, জীবনকে ধন্য বলে মনে হয়। দেব-মন্দির ও দেবতা অপেক্ষাও তাঁদের পুণ্য-স্মৃতি অধিক সৌরভময়।

ক্রমে পূর্বদিক পরিষ্কার হলে আমার দেবদর্শনস্পৃহা বলবতী হয়ে উঠলো। প্রত্যুষে বোধ হলো, কে যেন স্নিগ্ধ রাগিণীতে সন্তোষ ও সম্ভ্রমময় আগ্রহ ঢেলে দিচ্ছে; সেই ললিত মধুর শব্দ পৃথিবীর বাদ্যযন্ত্র হতে ধ্বনিত হয় না; সেই মঙ্গলবাদ্য পৃথিবীর শোকসন্তপ্ত, দুঃখভারাবনত, পাপক্লিষ্ট পথিকের কর্ণে অভিনন্দন সংগীতরূপে প্রতীয়মান হয়।

৩০ মে, শনিবার। সূর্যোদয় হলো। অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে নারায়ণ দর্শন করতে বের হয়ে পড়লাম; কিন্তু শুনলাম বেলা আটটার আগে মন্দিরের দ্বার খোলা হয় না; কাজেই কিয়ৎক্ষণ এদিক ওদিক করে বেড়াতে লাগলাম। মন্দিরের চকের বাহিরে একটা ক্ষুদ্র ঘরে ডাকঘর বসেছে। এটি সাময়িক পোস্ট অফিস; যাত্রীর যাতায়াত বন্ধ হলে এ পোস্ট অফিসও বন্ধ হবে। ডাকঘরে টিকিট খাম, পোস্টকার্ড প্রভৃতি দরকারি সকল জিনিসই পাওয়া যায়। পোস্টমাস্টারটি গাড়োয়ালী; দিব্যি গৌরবর্ণ গোলগাল চেহারা এবং মাথায় এক বিরাট পাগড়ি। লোকটা লেখাপড়া অতি সামান্য জানে; ইংরেজি নাম ও ঠিকানাগুলো কোন রকমে পড়তে পারে। আমি খানকতক পোস্টকার্ড কিনে দেশে চিঠি লিখতে প্রস্তুত হলাম। শীতে হিঁ হিঁ করে কাঁপছি, আর বহু কষ্টে অঙ্গুলির আগা বের করে কোনো রকমে কলম ধরে বাংলাদেশে এই পোস্টকার্ড কখানি লিখছি। এই কার্ডগুলি পাঁচ সাত দিন পরে হয় তো বঙ্গের একখানি ক্ষুদ্র গ্রামে একটি সামান্য

পরিবারে একজন প্রবাসীর সুস্থ সংবাদ ঘোষণার দ্বারা কিঞ্চিৎ সুস্থ শান্তি আনবে; কিন্তু কেহ কি একবারও ভাবছে কত অলিখিত প্রবাস কাহিনিতে ঐ পোস্টকার্ডের উভয় পৃষ্ঠা পূর্ণ হয়ে গেছে। প্রবাসীর মনে এ কথা অনেক সময় উদয় হলেও বোধ হয় গৃহজীবী তাঁর সংসারচিন্তার মধ্যে ও কথা ভাববার অবসর পান না।

পত্র লিখে যখন বাইরে এলাম, তখন শুনা গেল মন্দিরদ্বার উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। স্বামী ও বৈদান্তিক আমার সঙ্গে আসেন নি; সুতরাং তাঁদের ডেকে এনে একসঙ্গে মন্দির-প্রবেশ করবো ইচ্ছা করলাম। কত দিন হলো এক অভীষ্ট লক্ষ্য করে আমরা কোন দূরবর্তী রাজ্য হতে যাত্রা করেছি, আমরা পরস্পরের জীবনের অবিচ্ছিন্ন অবলম্বন; জীবনের উপর দিয়ে কত বিপদ চলে গেছে, সে স্রোতের বেগে আমরা বিভিন্ন হইনি। আজ এই পরম আনন্দের দিনেও একত্র হয়ে যাই। কিন্তু অধিক দূর যেতে হলো না, মন্দিরে প্রবেশ করা গেল। আমার মনের মধ্যে কেমন একটা নূতন ভাবের সঞ্চার হলো।

চতুর্ভুজ নারায়ণমূর্তি দৃষ্টিগোচর হলো। মূর্তি ঘোর কৃষ্ণবর্ণ পাথরের প্রস্তুত; বিগ্রহের গায়ে বহুমূল্য অলঙ্কার। অলঙ্কার নারায়ণের আপাদমস্তক ঢেকে ফেলেছে। সেই মণিমুক্তাহীরকাদিজড়িত হেমাভরণের মধ্য হতে একটা উজ্জ্বল স্নিগ্ধ শ্যামকান্তি বিকশিত হচ্ছিল, তা দেখলে মনে বাস্তবিকই আনন্দের সঞ্চার হয়। নারায়ণের শরীরস্থ মণিমুক্তাদির জ্যোতিতে গৃহ আলোকিত। পূর্বে গল্প শুনেছিলাম, ভাদ্র মাসে যে দিন মন্দির দ্বার বন্ধ হয়, সে দিন মন্দিরের মধ্যে যে প্রদীপ জ্বেলে রাখা হয়, বৈশাখ মাস পর্যন্ত অর্থাৎ এই নয় মাস কাল অনবরত তা জ্বলতে থাকে; আর যে সমস্ত নৈবেদ্য করে দেওয়া হয় , এ দীর্ঘকালেও তা নষ্ট হয় না, যেমন তেমনই থাকে। এই শেষে কথাটি সত্য হতে পারে, কারণ ঠিক নয় মাস বদরিনারায়ণের মন্দির বরফের তলে থাকে; বরফের মধ্যে নিহিত থাকাতে কিছু নষ্ট হয় না; কিন্তু আগের কথাটির যথার্থতা সম্বন্ধে তেমন বৈজ্ঞানিক যুক্তি পাওয়া যায় না। যদি মনে করা যেত, সেই প্রদীপ এমন সুবৃহৎ যে তাতে নয় মাস দিনরাত্রি জ্বলবার উপযুক্ত তৈল দিয়ে রাখা হয়, তাই জ্বলবার পক্ষে আর কোন বাধা থাকে না, কিন্তু তাতেও বিজ্ঞান প্রতিবাদী। বরফের দ্বারা এইরূপ বদ্ধ স্থানে আলোক অচিরাৎ নির্বাণ হয়; দেবতা স্বয়ং চেষ্টা করেও অগ্নির এই দৌর্বল্যটুকু বোধ করি দূর করে দিতে পারেন না। যা হোক যখন সেই মন্দিরস্থিত ক্ষুদ্র প্রদীপটি দৃষ্টিগোচর হল, তখন সমস্ত বিবাদ খণ্ডন হয়ে গেল। এ যুক্তির দিনে আমাদের অগত্যা বিশ্বাস করতে হল মন্দিরে অভ্যন্তরস্থ মণিমুক্তা এবং হীরকস্তূপই মন্দিরের মধ্যভাগ দীপালোকের ন্যায় উজ্জ্বল রাখে। বিশেষ যে দিন নারায়ণের দ্বার বন্ধ হয়, সে দিন জ্যোতির্ময় অলঙ্কারগুলি নারায়ণের শরীরে পরাইয়া দেওয়া হয়; তাদের আলোতেই মন্দিরের মধ্যভাগ অধিক আলোকিত হয়। তারপর যে দিন প্রথম দ্বার খোলা হয়; সেদিন অনেক সন্ন্যাসী উপস্থিত থাকে। দ্বার খোলামাত্র তারা মন্দিরের মধ্যে এই অলঙ্কারের জ্যোতিঃ দেখতে পায়, সুতরাং মনে করে প্রদীপ জ্বালা আছে ! নারায়ণের দেহ পরশপাথরে নির্মিত বলে যে প্রবাদ আছে, বৈদান্তিকের মতে তার আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা থাকলেও আমার বোধ হলো নির্জন দেবালয়ের দেবতা যে বরফরাশির মধ্যে আপনার নিভৃত সিংহাসন স্থাপন করেছেন, সেখানে এত হেমাভরণ, স্তূপাকার মণিমুক্তার উজ্জ্বল বিকাশ দেখে সাধারণে বিশ্বাস করে নিয়েছে, দেবতার দেহ পরশমণি-নির্মিত।

যা হোক বদরিনারায়ণের এই বহু মূল্যবান অলঙ্কারপ্রাচুর্য দেখে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। আমাদের দেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম্য বিগ্রহদেরই কত লোক কত মূল্যবান উপহারাদি উপহার দেয়। বদরিকাশ্রম ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থ; বদরিকাশ্রমে নারায়ণের মহিমা নিখিল দেব–মহিমার উপরে, সুতরাং নানা দেশবিদেশের রাজগণ বদরিনাথকে কত মূল্যবান দ্রব্য উপহার দিয়েছেন, তার সংখ্যা নেই। তার উপর গাড়োয়াল যখন স্বাধীন ছিল, তখন গাড়োয়ালের রাজা প্রায়ই নারায়ণকে বহুমূল্য উপহারাদি দান করতেন।

মন্দিরমধ্যে দেখলুম, শুধু নারায়ণ একা নেই, আরও দুচারটি অতিথি অভ্যাগত অতিথি আছেন; কিন্তু তাঁরা নারায়ণের উজ্জ্বল প্রভায় কিঞ্চিৎ নিষ্প্রভ হয়ে পড়েছেন। তাঁদের দিকে দৃষ্টিও সহসা আকৃষ্ট হয় না। আমাদের সঙ্গে আরও অনেক যাত্রী মন্দিরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। আমার হৃদয়ে যত না ভক্তির উদ্রেক হোক, এই সকল সমাগত যাত্রীর ভক্তি ও নিষ্ঠা দেখে আমি মোহিত হয়ে গেলাম, আমার হৃদয়ে এক স্বর্গীয় ভাবের উদয় হল। আমার কাছেই একটি বৃদ্ধা দাঁড়িয়েছিল; সে বড় কষ্টে নারায়ণ দর্শন করতে এসেছে। পা একেবারে ফুলে গিয়েছে, দাঁড়াবার শক্তি নেই, তবুও প্রাণপণ শক্তিতে একবার দাঁড়িয়ে নারায়ণের শ্রীমুখ নিরীক্ষণ করছে। তার মুখে এমন উজ্জ্বল প্রফুল্ল ভাব, চক্ষে এমন নিস্পন্দ সতৃষ্ণ দৃষ্টির একাগ্রতা যে, বোধ হল শারীরিক যন্ত্রণার কথা একটুও তার মনে নেই। তার যেন মনের ভাব, তার সকল কষ্ট দুঃখ এবার সার্থক হয়েছে। বৃদ্ধার সঙ্গে একটি বড় পুত্র ও একটি বিধবা কন্যা। আমরা যেদিন বদরিকাশ্রমে পৌঁছি, এরাও সেদিন এখানে এসেছিল। বৃদ্ধা অনেকক্ষণ নারায়ণ দর্শন করে শেষে ভক্তিভরে প্রণাম করলে। তারপর পুত্রটির দিকে চেয়ে বললে, ''বেটা জনম সফল কর্‌লিয়া।'' সেই কথা কয়টির মধ্যে যে কত আনন্দ, তা বর্ণনাতীত। ছেলেটির মার কথায় ভক্তিপূর্ণ হৃদয়ে নতজানু হয়ে মায়ের পদধূলি গ্রহণ করলেন, মাও আস্তে আস্তে জীবনের অবলম্বন ছেলেটিকে বুকের মধ্যে টেনে নিলে। সে দৃশ্য স্বর্গীয়; আমাদের সকলের চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। পুত্র মায়ের প্রতি কর্তব্যের এক অংশ সম্পূর্ণ করে অতুল আনন্দ বোধ করলে এবং মায়ের স্নেহপূর্ণ বুকের মধুর প্রশান্তির মধ্যে স্থান পেয়ে হয়তো সে মনে করলে, তার অপার্থিব পুরস্কার হয়ে গেল। হায় মাতৃহীন আমি – আমি মর্মে মর্মে মাতার অভাব অনুভব করলাম।

তারপর আমরা ধীরে ধীরে মন্দির হতে ''তপ্তকুণ্ড'' দেখতে চললাম। মন্দিরের বাহিরে একটু নীচেই একস্থলে পাথর দিয়ে বাঁধান জল রাখবার একটা অনতিবৃহৎ চৌবাচ্চা নির্মিত আছে, তার গভীরতা বেশি নয়। নারায়ণের মন্দিরের নীচে দিয়ে তার পাশে একটা বৃহৎ ঝরনা এসে পড়েছে। এ ঝরনার জল ভারি গরম; এত গরম যে তাতে স্নান চলে না। তাই পাণ্ডারা উক্ত চৌবাচ্চায় সেই ঝরনার জল এনে ফেলেছে আর এক দিক দিয়ে এক ঠাণ্ডা জলের ঝরনাও তার মধ্যে এসে মিশেছে, এবং এই দুই জল একত্র মিশে স্নানের উপযুক্ত ঈষদুষ্ণ জলে পরিণত হয়েছে। এই স্থানটির চারিপাশে পাথরের স্তম্ভ দিয়ে উপরে ছাদ তৈয়ারি করা হয়েছে। অনেকেই এখানে স্নান করছেন দেখলাম, আমারও স্নান করবার বড় ইচ্ছা হল। গায়ের কাপড় চোপড় খুলছি, স্বামিজী তাড়াতাড়ি আমাকে নিষেধ করলেন। আমি তাঁকে বললাম, এ গরম জলে স্নান করায় এমন কি আপত্তি হতে পারে ? তিনি বললেন, স্নান করায় ক্ষতি না হতে পারে, কিন্তু গায়ের কাপড় খুলে শরীর অনাবৃত করাতে বুকে হঠাৎ ঠাণ্ডা লাগতে পারে। তাঁর কঠোর শাসনে

অগত্যা আমাকে স্নান বন্ধ করতে হল। কিন্তু বৈদান্তিক ভায়া নিরঙ্কুশ, তিনি গায়ের কাপড় চোপড় খুলে দিব্য স্নান করতে লাগলেন। তাঁর সেই সজোরে গাত্রমার্জন এবং মৃদু হাস্যের অর্থ আমি বুঝলাম যে, তোমরা কোন কাজের লোক নও। অতি সাবধান হয়ে সর্বত্র নিষেধ-বিধি মানলে জীবনের অনেক সুখভোগ হতে বঞ্চিত থাকতে হয়।

বৈদান্তিকের স্নান প্রায় শেষ হয়েছে এমন সময় মহান্ত মহারাজা আমাকে ডেকে পাঠালেন। ইনি সেই যোশীমঠের মহান্ত, নারায়ণের সেবার ভার এখন ইহার উপর ন্যস্ত আছে। একটি কথা বলতে ভুলে গিয়েছি। এই মন্দির বন্ধ হলে তার চাবি মহান্তের কাছে থাকে না: গাড়োয়ালের রাজার (এখন তিহরির রাজা) এ মন্দির; তাঁরই কর্মচারীগণ এসে মন্দিরের দ্বার খুলে জিনিসপত্র সব বুঝে পেড়ে দিয়ে যায়, আর বন্ধের পূর্বে এসে সমস্ত বুঝে নিয়ে চাবি বন্ধ করে চলে যায়; অবশ্য জিনিসপত্র যে তারা স্থানান্তরিত করে তা নয়, সমস্তই মন্দিরের মধ্যে থাকে, তবে তারা একবার পরীক্ষা করে দেখে মাত্র ! এতদ্‌ভিন্ন বৎসর বৎসর যে লাভ হয় তা মহান্তরই প্রাপ্য ! মহান্ত আমাকে কেন ডাকলেন, তা বুঝতে পারলাম না; স্বামিজীকে আমার সঙ্গে যাবার জন্যে অনুরোধ করলাম, কিন্তু তিনি কোথাও যাওয়া পছন্দ করেন না, সুতরাং আমি চললাম। একটা বড় ঘরের ভিতর, একটা উঁচু গদির উপর কতকগুলি তাকিয়ার মধ্যে স্থূলদেহ মধ্যবয়সি মহান্ত-মহারাজ বসে আছেন, চারিদিকে ফরাসের উপর অন্যান্য লোক আছে; কেহ বাক্স সম্মুখে নিয়ে বসে আছে, কারও কাছে কতকগুলি খাতাপত্র , কেহ নিস্পরোয়া হয়ে ধূমপান করছে; দুই চারজন লোক একপাশে বসে খোশগল্প আরম্ভ করে দিয়েছে। মনে করেছিলাম, বুঝি বিভূতিভূষিত-অঙ্গ, ব্যাঘ্রচর্মাসন, কমণ্ডুলধারী, রুদ্রাক্ষশোভিত যোগীবরকে অগ্নিকুণ্ডের সম্মুখে উপবিষ্ট দেখবো, চারিদকে পূজার্চনার দ্রব্য এবং সংযত ও ধর্মালোচনা তৎপর বিনীত শিষ্যমণ্ডলী দেখা যাবে। কিংবা ইনি নারায়ণের সেবাইত; বিভূতি ব্যাঘচর্ম রুদ্রাক্ষ পরিবেষ্টিত যোগী না দেখি, বৈষ্ণবের মত একটা মানুষ নিশ্চয়ই দেখতে পাবো; কিন্তু দঃখের সঙ্গে বলতে হচ্ছে, সে আশায় ভারি নিরাশ হলাম। মহান্তর অফিসে উপস্থিত হয়ে যে দৃশ্য দেখলাম, বড়বাজারের কুঠিয়াল কি মাড়োয়ারি মহাজনের গদির সঙ্গেই তার তুলনা হতে পারে। একটু সম্ভ্রম একটু বিনয় - কোনও ভাব এখানে নেই; যেন ধর্ম শুধু ভান মাত্র, ব্যবসা করাই এ সমস্ত অনুষ্ঠানের উদ্দেশ্য। দেবতার দ্বারে হৃদয়ের দেবভাব অপেক্ষা অর্থের খ্যাতি, অর্থের সম্মান, প্রেম ভক্তি বিনয় প্রভৃতি অপেক্ষা অনেক অধিক। যেখানে অপার্থিব দেবমাহাত্ম্যের উপর তুচ্ছ সংসারের কোলাহল এবং হীনতা প্রতিষ্ঠিত, সেখানে দেবমর্যাদা বিড়ম্বিত।

আমি মহান্তের সম্মুখে উপস্থিত হবামাত্র ''আইএ বাবু সাব'' বলে মহান্ত অভিবাদন করলেন। সকলেই সরে' সরে' আমার জন্য একটা জায়গা করে দিলে। আমি মহান্তের অনুমতিক্রমে একপাশে উপবেশন করলাম; মহান্ত মহারাজ গল্প করতে লাগলেন। তাঁর গল্পে বাজে কথাই বেশি, ধর্ম প্রসঙ্গে তাঁর তেমন আগ্রহ দেখলাম না, বরং সে সম্বন্ধে কিছু বললে তিনি কৌশলক্রমে কথাটা উলটে দিতে চেষ্টা করলেন। সুতরাং অন্যান্য স্থানের মহান্তেরা যে শ্রেণীর লোক, ইনিও যে সে শ্রেণীর বেশি উপরে, তা মনে করবার বিশেষ কোন কারণ দেখলাম না ! যোশীমঠ সম্বন্ধে কথা হলে তিনি এই বললেন, উক্ত মঠ শঙ্করাচার্য স্বামীরই প্রতিষ্ঠিত। যোশীমঠে দুচারখানি পুস্তক আছে, তার কোন কোনখানি পাঠোপযুক্ত এবং তা হতে অনেক পুরাতন তথ্য সংগ্রহ করা যেতে

পারে; কিন্তু সে জন্য কষ্ট স্বীকার করে, এমন লোক প্রায়ই দেখা যায় না; সুতরাং পুস্তকগুলিতে যে সত্য সংগুপ্ত আছে তা শীগ্রই চিরবিলীন হয়ে যাবে। মহান্তের কাছে যে বিশেষ কিছু প্রত্যাশা নাই, তা তাঁর কথার ভাবেই বুঝতে পারলাম।

এই সমস্ত কথাবার্তা শেষ হলে তিনি আমাকে ডাকবার কারণ বললেন। তিনি বললেন যে, মন্দিরটি জীর্ণ হয়ে গেছে; এখন হতে যদি জীর্ণ–সংস্কার না করা হয়, ত হিন্দুর একটি প্রধান কীর্তি লোপ হবে। তাই তিনি জীর্ণ সংস্কারের কাজ আরম্ভ করে দিয়েছেন। কিন্তু এই কাজে বহু অর্থের প্রয়োজন, বিশেষ এদিকে তেমন বড়লোক বেশি আসেন না, অন্য লোকের দৃষ্টি নেই, সুতরাং মহান্ত মহাশয়ের ইচ্ছা ছোট বড় সকলের কাছে চাঁদা সংগ্রহ করে হিন্দুর এই তীর্থকে বজায় রাখেন। এ সমস্ত কথা মহান্ত একা বললেন না, তাঁর মোসাহেবরাও অনেক কথা বললেন। সমস্ত কথা শেষ হলে মহান্ত মহাশয় একখানি চাঁদার খাতা বের করে আমার হাতে দিলেন। আমি খাতাটি উলটেপালটে দেখে মহান্তের হাতে ফেরত দিলাম , এবং দীনতা জানিয়ে বললাম আমার অবস্থানুসারে যথাযোগ্য দিতে প্রস্তুত আছি; কিন্তু আমাদের কাছে যে টাকাকড়ি আছে তা অতি সামান্য, তা এই দীর্ঘ পাথেয় হিসাবে যথেষ্ট নয়, – সুতরাং তা হতে কিছু দান খয়রাত করা যায় না; তবে শঙ্করাচার্য প্রতিষ্ঠিত এই মন্দিরের একখানা পাথর গাঁথবার খরচের যদি সাহায্য করতে পারি, তা হলেও আমার অর্থ সার্থক। আমি পাঁচটি টাকা দিলুম। মহান্ত মহাশয় বললেন, ''ফরাসি হরফমে মৎ লিখিয়ে, আংরিজেমে দস্তখত কর দেনা'', তিনি মনে করেছিলেন, আমি যখন বাবু, তখন আমি ইংরেজি ফারসি উভয় বিদ্যাতেই পারদর্শী। কিন্তু আমি ত আর ফারসি জানিনে, আমি বললাম নাগরীতে দস্তখত করি; কিন্তু এ কথা শুনে মহান্ত ব্যস্তভাবে বললেন, ''নেহি নেহি বাবু, আংরেজী লিখ্‌নেসে দস্তখৎ কি কদর যাস্তি হোগা।'' বুঝলাম ইংরেজি দস্তখতের মান বেশি। মহান্তের এই এক কথাতে আরও অনেক বিষয় বুঝতে পারলাম। ইংরেজিতেই নাম সহি করে সেখান থেকে বের হলাম।

ব্যাসগুহা

৩০ মে, শনিবার। – মন্দির মেরামতের জন্য পাঁচটাকা দান করে এবং সেই দানের কথা ইংরেজি অক্ষরে নাম সহি দ্বারা খাতাভুক্ত করে বদরিনাথের প্রধান পাণ্ডা – মহাত্মা শঙ্করাচার্যের শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধির নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করলাম। সে সময়ে মনে একটা বড় আক্ষেপ জেগে উঠেছিল। কোথায় সেই জ্ঞান এবং ধর্মের অবতার মহাপণ্ডিত, নরদেবতা শঙ্করাচার্য – আর কোথায় ঘোর সংসারী বিষয়াসক্ত, পাণ্ডিত্যহীন, ব্যসননিরত এই সর্দার–পাণ্ডা। মহান হিমালয়ের অভ্রভেদী উচ্চতা হতেও সমুচ্চ মহত্ব ও জ্ঞান একদিকে, আর ক্ষুদ্র ধূলিকণা হতেও ক্ষুদ্রতর এই পাণ্ডাপুত্রটির আত্মাভিমান এবং ক্ষমতা–দর্প আর একদিকে; এ দুইয়ের মধ্যে তুলনা হয় না, কিন্তু তবু উভয়ের অবস্থান তুলনার উপযোগী। বাস্তবিক যাঁর উৎসাহের তেজে পৃথিবীপ্লাবিত বৌদ্ধধর্ম ভারতবর্ষ হতে নির্বাসিত হয়েছিল, হিন্দুধর্মের সংস্কারে বদ্ধপরিকর হয়ে যিনি সমস্ত হিন্দুজাতির কৃতজ্ঞতাভাজন হয়ে গেছেন, এবং সকলের অশান্ত আকুল হৃদয় গভীর আশাভরে যাঁর উপর নির্ভর করে শান্তিলাভ করেছিল, সেই শঙ্কর ও তাঁর এই পাণ্ডা,

এ উভয়ে এক জাতীয় জীব তা বিশ্বাসই হয় না। শঙ্করাচার্যের দুর্ভাগ্য – এরা সকলে আসন কলঙ্কিত করছে। এই স্থানের সম্বন্ধে পরে যে সকল কথা শুনেছি, তা আর কাগজে কলমে লেখা যায় না, এমনই অপবিত্র কথা ! তীর্থস্থানের অধিনায়কগণের কথা অনেকেই শুনেছেন; দেবতার নামে উৎসর্গীকৃত অর্থ কিরূপে অযথা ব্যয়িত হয়, তার নূতন দৃষ্টান্ত প্রয়োগ নিষ্প্রয়োজন। চক্ষের সম্মুখে আজও কলিকাতার প্রধান বিচারালয়ে অকারণে রাশি রাশি অর্থ জলস্রোতের মত ভেসে যাচ্ছে। দুখ–তাপ–পাপক্লিষ্ট শত শত নরনারী তাহাদের বহু কষ্টে উপার্জিত অর্থের দুই একটি পয়সা বাঁচিয়ে তাই নিয়ে তীর্থদর্শন করতে যায়, দেবচরণে সেই কষ্টোপার্জিত অর্থ দিয়ে আপনাকে কৃতার্থ বোধ করে; আর মঠের অধিকারী মহাশয়েরা বিলাস–লালসা তৃপ্তির জন্য সে অর্থ যা খুশি তাতে ব্যয় করেন।

বাইরে এসে দেখি স্বামিজী ও অচ্যুত বাবাজি আমার জন্যে অপেক্ষা করছেন। এইবার আমাদের মধ্যে প্রথম কথা উঠলো, এখন কোথায় যাওয়া যায় ? বাস্তবিকই এবার আমাদের নিরুদ্দেশ যাত্রা। যেখানে ও যে পথে লোক যায়, এত দিনে আমরা তা শেষ করলাম; এইবার হতে এক নূতন পথে যেতে হবে। সে পথে কখনও লোক চলে না, এবং যাত্রী দলও সে পথে যেতে আগ্রহ করে না। এই নূতন পথ দিয়ে আমাদের ব্যাসগুহা দেখতে যেতে হবে। নূতন পথে চলতে একজন পাণ্ডার সাহায্য লওয়া ভাল, স্থির করে একবার লছমীনারায়ণ পাণ্ডার খোঁজ করা গেল। সে পূর্বদিন রাত্রেই বদরিকাশ্রমে এসে সশরীরে হাজির হয়েছে। লছমীনারায়ণ দেবপ্রয়াগে আমাদের ভরসা দিয়েছিল যে শীঘ্রই সে নারায়ণ মন্দিরে এসে পৌঁছবে; কিন্তু, এত শীঘ্র আসবে তা একদিনও আমাদের মনে হয় নি ! তার এত তাড়াতাড়ি আসবার কারণ জিজ্ঞাসা করে জানতে পারলাম, নারায়ণ দর্শন জন্য যে ব্যাকুল হয়ে সে এসেছে তা নয়, কাশীনাথ জ্যোতিষী মহাশয় তার একজন সম্ভ্রান্ত যজমান; তাঁর কাছে বিলক্ষণ দশটাকা প্রাপ্তির সম্ভাবনা, কিন্তু "রামনাথ কি চাচীর" দ্বারা সে কাজটা যথা–বিহিত সম্পন্ন হবে, লছমীনারায়ণের সে আশা ছিল না; তাই সে প্রাণপণে হেঁটে এসেছে। জ্যোতিষী মহাশয় সেই রাত্রেই বদরিনাথ পৌঁছেছেন। আমরা তাঁকে পাণ্ডুকেশ্বরে রেখে এসেছিলাম; তারপর আমরা ঘুরতে ঘুরতে আসছি, তিনি বাহকস্কন্ধে নির্ভাবনায় আসছিলেন; সুতরাং আমাদের আগেই তাঁর এখানে পৌঁছিবার সম্ভাবনা বেশি ছিল।

আমাদের সঙ্গে ব্যাসগুহা পর্যন্ত যাবার জন্য লছমীনারায়ণকে বলা গেল; কিন্তু এ প্রস্তাব সে অস্বীকার করল; বলল, তার অনেক যাত্রী রাত্রে এসেছে, পরদিন সকালেও অনেকে এসে পৌঁছবে। এ রকম অবস্থায় তাদের নারায়ণ দর্শনের ব্যবস্থা না করে সে আমাদের সঙ্গে কি রকম করে অতদূর যায়। এ ছাড়া ব্যাসগুহা তার সম্পূর্ণ অজ্ঞাত; এবং এ পর্যন্ত কোন যাত্রী সে পথে অগ্রসর হয় নি। বিশেষ ব্যাসগুহা একটা তীর্থ বলেই গণ্য নয়। তার কথায় মন কেমন দমে গেল। কিন্তু এখান থেকে ফিরে যাওয়া হচ্ছে না; আর খানিকটা যেতেই হবে, সুতরাং এ পথে যাওয়াই ভাল। স্বামিজী ও আমি এ রকম সিদ্ধান্ত করে ফেললাম। বৈদান্তিক ভায়ার সাংসারিক আকর্ষণ কিছু ছিল বলে বোধ হয় না; কিন্তু এ পথে অগ্রসর হতে তিনি বিষম নারাজ; আমার ও স্বামিজীর মতলব শুনে তিনি ভীষণ চটে উঠলেন; বললেন, পাণ্ডারা যে পথ চেনে না তীর্থযাত্রীরা সে স্থানকে তীর্থের হিসাবে নগণ্য মনে করে, সেখানে এত কষ্ট করে যাবার কি দরকার ? শরীরকে

শুধু শুধু কষ্ট দেওয়াই যদি অভিপ্রেত হয়, তবে তার অনেক উপায় আছে। আমি ভায়ার উপর রাগ করে বললুম, ''তুমি বৃথা তীর্থভ্রমণের উদ্দেশ্যে এতকাল অতিবাহিত করলে। শুধু যাত্রীনির্দিষ্ট তীর্থে ঘুরে মন্দির এবং ঠাকুর দেখেই কি তুমি তোমার জীবনকে ধন্য ও হৃদয়কে পরিতৃপ্ত বোধ কর ? এই হিমালয়ের মহান গম্ভীর শান্তিপূর্ণ ক্রোড়ের মধ্যে কি এমন কোন তীর্থ নেই, যাকে যাত্রীদের দেবতা এবং দেবমন্দিরে পবিত্র ও বিখ্যাত না করলেও প্রকৃতির বিচিত্র শোভা এবং শান্তির কোমল উৎসে তা সমলঙ্কৃত ?'' বক্তৃতার দ্বারা ভায়াকে বিলক্ষণ বাধ্য করা গেল সুতরাং অবিলম্বেই তিনি আপত্তি ত্যাগ করলেন।

আমাদের যখন এই রকম তর্কবিতর্ক চলছিলো, সেই সময় সেখানে দু' –চারজন প্রৌঢ় পাণ্ডা উপস্থিত ছিলেন। আমরা ব্যাসগুহা দেখবার জন্য উৎসুক হয়েছি শুনে তাঁরা সকলেই ভারি বিস্ময় প্রকাশ করে বললেন, সেখানে যাবার কোনও রকম বন্দোবস্ত নেই; অলকানন্দা পার হতে হবে, কিন্তু কোথাও সাঁকো নেই; নদী জমে শক্ত হয়ে গিয়েছে; তারই উপর দিয়ে অতি সন্তর্পণে কোনও রকমে পার হতে হবে। হঠাৎ একটা চাপ বসে গিয়ে সবশুদ্ধ ডুবে যাবার কিছুমাত্র আটক নেই ! একজন পাণ্ডা বললেন, কিছুদিন আগে একজন অলকানন্দা পার হতে গিয়ে বরফ ভেঙে ডুবে গিয়েছিল। অতএব সেখানে যখন দেখবার যোগ্য কিছু নেই, তখন এত কষ্ট করে যাবার কি আবশ্যক ? আমরা কিন্তু এ যুক্তিতে কর্ণপাত করলাম না, এবং বলা বাহুল্য এ রকম যুক্তি অনুসারে চললে, আর এতদূর পর্যন্ত অগ্রসর হবার সম্ভাবনাই থাকতো না।

বরাবর এই একটা আশ্চর্য ব্যাপার দেখে আসা যাচ্ছে যে, যে সমস্ত যাত্রী তীর্থভ্রমণ করতে আসে, তারা শুধু দেবমন্দির ও দেবতা ছাড়া আর কিছুতেই মনোনিবেশ করে না। হয় তো তারা সেটা বাহুল্য জ্ঞান করে ; না হয়, একমনে, একপ্রাণে অভীষ্ট দেবতার চিন্তাতেই তারা তন্ময় হয়ে থাকে, এবং তাতেই তারা এমন নিবিষ্টচিত্তে পথ চলে যে, চতুর্দিকে আর যা কিছু দেখবার আছে, তার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপের অবসর পায় না। এ পর্যন্ত কত তীর্থযাত্রীর সাথে দেখা হল; তারা বাহ্যপ্রকৃতির সৌন্দর্য, চতুর্দিকের অভিনব দৃশ্যরাজির বৈচিত্র্যসম্বন্ধে কোন কথাই বলে না।

যাহা হউক, আপাতত ব্যাসগুহার উদ্দেশ্যেই রওনা হওয়া গেল। বদ্রিকাশ্রম ত্যাগ করে চলতে আরম্ভ করলাম। তিনটি প্রাণী পূর্ববৎ চলছি বটে, কিন্তু পথ অনির্দিষ্ট, অধিকতর দুর্গম এবং একান্ত নির্জন। চলতে চলতে ক্বচিৎ যদি কোন লোকের সঙ্গে দেখা হয় তো পথের কথা জিজ্ঞাসা করলে সে একটু অবাক হয়ে আমাদের দিকে চেয়ে থাকে; তার পর বলে, ''ইস্ তরফ কৈ জায়গা পর হোগা, মালুম নেহি,'' সুতরাং অন্য লোকের কাছে পথের সন্ধান জানার আশায় নিরাশ হয়ে আমরা নির্বাক ভাবে এবং কতকটা সন্দিগ্ধচিত্তে অলকানন্দার ধারে ধারে চলতে লাগলাম। আগে পাছে সেই উন্নত পর্বতশ্রেণী তুষারাচ্ছন্ন, বন্ধুর, তরুতৃণহীন; পর্বতের অন্ত নেই; মধ্যে শুধু সঙ্কীর্ণ বঙ্কিম অধিত্যকা ভেদ করে অলকানন্দা অস্ফুটশব্দে ছুটে চলেছে এবং তার কম্পিত জলপ্রবাহ কঠিন প্রস্তরভিত্তিতে এসে ধীরে ধীরে আঘাত করছে। ক্রমে বরফের স্তূপ আবার দৃশ্যমান হয়ে পড়লো। অলকানন্দার জলধারা অদৃশ্য হয়ে এলো; অবশেষে বরফের নদী ভিন্ন আর কিছুই দেখা গেল না। কঠিন বরফরাশিতে নদীগর্ভ সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন।

অনেকক্ষণ চলার পর আমরা তুষারাচ্ছন্ন নদীতীরে এসে দাঁড়ালুম। চারিদিকে শুধু ধু ধু করছে। নিম্নে ঊর্দ্ধে যে দিকে চাই শুধু বরফ; পথের চিহ্ণ নেই, নদীর চিহ্ণ নেই, গন্তব্যস্থল কোন দিকে ঠিক নেই, দিঙ্‌নির্ণয়ের পর্যন্ত উপায় নেই। আমরা তিন জনেই দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে বরফ নদীর তীরে দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম। যে দিক থেকে আমরা এসেছি, সে দিক ঠিক আছে – এখনও ফিরে যেতে পারি। অনির্দিষ্ট বিপদের মুখে প্রবেশ করবার পূর্বে আর একবার ভেবে দেখলাম; তার পর ভগবানের নাম স্মরণ করে নদী পার হওয়াই স্থির করলাম।

ব্যাসগুহা যে কোথায়, তা এখনও পর্যন্ত স্থির হয়নি। স্বামিজীর বিশ্বাস, আমাদের সম্মুখের পর্বতের গায়েই নিশ্চয়ই ব্যাসগুহা দেখতে পাওয়া যাবে। স্বামিজীর অনুমানের উপর নির্ভর করেই নদী পার হতে প্রবৃত্ত হলাম। এখানে নদী পার হওয়া বড়ই দুঃসাহসের কাজ। আগেই বলেছি, নদীর উপর কোনও সাঁকো নেই, তার উপর কোন স্থানে বরফ কি অবস্থায় আছে তা নির্ণয় করা দুরূহ। আমরা যে বরফরাশির উপর দাঁড়িয়ে আছি, তার নীচেই যে নদী নেই তাই বা ঠিক কি ? অতএব আর বেশি চিন্তা না করে তাড়াতাড়ি চলতে লাগলাম। বৈদান্তিক তার দীর্ঘ পার্বত্য-যষ্টি হস্তে পথিপ্রদর্শক হলেন। এক পা এক পা অগ্রসর হন, আর যষ্টিগাছাটি বরফে বসিয়ে দিয়ে জমাট বরফের গভীরতা পরীক্ষা করেন। আমিও বৈদান্তিকের সঙ্গে সঙ্গে চলতে প্রস্তুত হলাম, কিন্তু স্বামিজী আমাকে ভারি ধমক দিয়ে হটিয়ে দিলেন, এবং তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে অনুমতি করলেন; আরও বললেন, যদি আমি তাঁর কথার অবাধ্য হই, তবে তিনি তখনই সেখান থেকে ফিরে যাবেন; আমার মত উচ্ছৃঙ্খলমতি বালকের সঙ্গে তাঁর চলা পুষিয়ে উঠবে না। আমি হাস্যমুখে তাঁকে নির্ভয় হতে বললাম। কিন্তু তিনি পুনশ্চ ভয় দেখিয়ে বললেন, হঠাৎ আমার পা দুটো আমর অজ্ঞাতসারে বরফের মধ্যে বসে যেতে পারে, তখন পা টেনে তোলা তাঁদের দুজনের সাধ্যায়াত্ত হবে না। অগত্যা তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলাম, বুঝলাম স্বাধীনতা না থাকলে স্বর্গেও সুখ নেই, কিন্তু স্বামিজীর স্নেহ-কোমল ভর্ৎসনায় মনে অধীনতার সন্তাপ স্থান পায় না। আসল কথাটা এই, আমরা যে নদীর উপর দিয়ে চলে যাচ্ছি, সেই নদী যে কোনও মুহূর্তে আমাদিগকে তার হৃদয়ে চিরদিনের জন্য আশ্রয় দিতে পারে। আমি আগে গেলে আমিই আগে মারা যাবো, এই ভয়ে স্বামিজী আগে গেলেন, – নিজের জীবন সংকটাপন্ন করে তিনি আমাকে বাঁচাবেন বলেই তাঁর ভর্ৎসনা ! হায় সন্ন্যাসী ! কি মায়ার বাঁধনেই তুমি আটকে পড়েছ।

সেই তুষারাচ্ছন্ন নদীর পরিসর কতখানি তা জানা নেই, সুতরাং আমাদের সকলকে অতি সন্তর্পণে পদক্ষেপ করতে হল। অনেকক্ষণ হতে চলছি, কিন্তু তবু সতর্ক হয়ে যেতে হচ্ছে। আমি লক্ষ্য করে দেখলাম বৈদান্তিক ও স্বামিজী দুজনেই বেশ স্বচ্ছন্দভাবে চলে যাচ্ছেন, তাঁদের আকার প্রকারে এবং গতিতে ভয়ের কোনও চিহ্ণ দেখা গেল না; কিন্তু স্বীকার করতে লজ্জা নেই, আমার মনে বিলক্ষণ ভয়ের সঞ্চার হচ্ছিল। সংসারের বন্ধন কাটিয়েছি, সন্ন্যাস অবলম্বন করা গেছে, পৃথিবীতে সুখ নেই, এবং বেঁচে থাকবার যে কিছু প্রলোভন তাও দূর হয়েছে, কিন্তু তবুও জীবনের মায়া বিসর্জন দিতে পারি নি। যার কোনও কাজ নেই, সেও জীবনটাকে মূল্যবান মনে করে। জীবন বিসর্জন দেওয়া সহজ বলে মুখে যতই আস্ফালন করি না কেন, যখন বিপদের মেঘ চারিদিকে ঘন হয়ে আসে এবং সংসারের উন্মত্ত তরঙ্গ ফেনিল হয়ে ওঠে, তখন আমরা নিরাশ্রয় হাত দুখানি

কৃতাঞ্জলিবদ্ধ করে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি; তখন আমরা বুঝতে পারি, আমরা শুধু কাপুরুষ নই, ভগবানের চিরমঙ্গল ইচ্ছার উপর নির্ভর করতেও আমরা অশক্ত; আমরা দুর্বল এবং বিশ্বাসহীন।

অনেকক্ষণ পরে একটা চড়াইয়ের উপর উঠা গেল, তখন নির্ভয় হলাম, কারণ সেটা আর নদীগর্ভ হতে পারে না। পাহাড়ের উপরে উঠে অনেক অনুসন্ধানেও ব্যাসগুহার কোনও সন্ধান পাওয়া গেল না। চারিদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু কোথাও গুহার নামও নেই। ছোট ছোট দু'একখানি গুহা থাকলেও তা বরফে ঢাকা। পাহাড়ের অনেকখানি ঘুরে বহুকষ্টে সেই উঁচু জায়গাটাতে উঠলাম। স্বামিজী শুনেছিলেন, বরফাচ্ছন্ন পর্বতের মধ্যে ব্যাসগুহার সম্মুখে কিছুমাত্র বরফ নেই, সে জায়গাটা শৈবালদলে সমাচ্ছন্ন। এইস্থানে উপনীত হবামাত্র সেই দৃশ্য আমাদের চোখে পড়ে গেল, সুতরাং আমরা সহজেই বুঝতে পারলাম, এ জায়গাটাই ব্যাসগুহার সম্মুখভাগ। এত ভয়, উদ্বেগ এবং পরিশ্রমের পর আমাদের আকাঙ্ক্ষিত বস্তু আবিষ্কৃত হল দেখে আমরা অত্যন্ত আনন্দ বোধ করলাম। বাঙালির ছেলে লিভিংস্টোন, স্ট্যানলের মত বিপদসংকুল অনাবিষ্কৃত দেশ আবিষ্কার করিনি এবং জীবনে সে আশাও নেই, কিন্তু স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে অন্ধভাবে রাস্তা হাতড়ে ব্যাসগুহায় উপস্থিত হওয়াতে আমার মনে ভারি অহংকারের সঞ্চার হল। মনে করতে লাগলাম, দায়ে পড়লে আমরাও লিভিংস্টোন, স্ট্যানলের মত একা একটা বৃহৎ কাজ করে ফেলতে পারি। সমস্ত বিশ্ব–সংসারের লোক তখন বিস্ময়–বিহ্বল নেত্রে এই বঙ্গবীরের দিকে চেয়ে কি ভাববে, তা কল্পনা করে বেশ আরাম বোধ হল এবং অনেকখানি আত্ম–প্রসাদও ভোগ করা গেল।

ব্যাসগুহার সম্মুখের প্রাঙ্গণটা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, একটা ছোট অনাবৃত উঠানের মত। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, এখানে বিন্দুমাত্র বরফ নেই, অথচ আশেপাশে স্তূপাকার বরফ। সেই রিষিশ্রেষ্ঠের কোন মায়ামন্ত্র বলে চিরদিনের জন্য এখান থেকে বরফরাশি তিরোহিত হয়েছে, তা আমাদের মত ক্ষুদ্র মানব–বুদ্ধির অগম্য। আমরা অবাক হয়ে তার কারণ খুঁজতে লাগলাম, কিন্তু কোনও কারণই নির্দেশ করতে পারলাম না। এই বরফহীন গুহাপ্রাঙ্গণটি যে নীরস কালো পাথরমাত্র, তাও নয়; পাথরের উপর ক্রমাগত জল পড়লে যেমন একরকম সবুজ পাতলা শেওলা জন্মে, এখানে তেমনি জন্মিয়ে আছে। আর শৈবালদল পাতলা নয়, গালিচার আসনের মত পুরু; তার রং বড় চক্ষুতৃপ্তিকর, বিশেষত তার মধ্যে আবার ছোট ছোট লাল ও সাদা ফুল ফুটে প্রকৃতির হস্তনির্মিত সেই আসনখানিকে আরও সুন্দর এবং প্রীতিকর করে তুলেছে।

অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমরা সেই মনোহর আসনখানির দিকে চেয়ে র্ইলাম। সেই পুরু শৈবালরাশির উপরে খুব ছোট ছোট লাল ও সাদা ফুল ফুটে রয়েছে, তাতে আসনখানিকে মণিমুক্তাখচিত বলে বোধ হচ্ছে। এমন আশ্চর্য দৃশ্য আর কখনো দেখেছি বলে মনে হল না। এ রকম জিনিস আমার কাছে এই নূতন। আমার সঙ্গে কোন বৈজ্ঞানিক পণ্ডিত থাকলে হয় তো এই বরফ রাজ্যে এ রকম প্রাকৃতিক–বৈচিত্র্যের কারণ অবগত হবার জন্য চেষ্টা করতেন এবং হয় তো কৃতকার্যও হতে পারতেন; কিন্তু আমরা কেহই বৈজ্ঞানিক নই; কোন একটা সুন্দর জিনিস দেখলে তাকে বিশ্লেষণ না করে তার সৌন্দর্য উপলব্ধি করেই কেবল আমরা আনন্দিত হই। জ্যোৎস্না–পুলকিত

শুভ্র শারদ যামিনীতে পূর্ণচন্দ্রের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে ক্ষুদ্র শিশু হতে প্রেমিক কবি পর্যন্ত সকলেই সুখ এবং তৃপ্তি অনুভব করে। চন্দ্র কি বস্তু, দূরবীক্ষণ যন্ত্রে তাকে পর্যবেক্ষণ করলে তার মধ্যে কতকগুলি পর্বত, সাগর এবং মরুভূমি আবিষ্কার করা যায়, তা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিষয়, কিন্তু তাঁর এই গবেষণাজনিত আনন্দ, শিশু ও কবির আনন্দ অপেক্ষা অধিক কি না তা কে বলবে ? ইদানীং বৈজ্ঞানিকেরা প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন যে, মঙ্গলগ্রহে মনুষ্য অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর জীবের বাস আছে। সেই সকল অপার্থিব প্রাণী ক্রমাগত লাল আলো দেখিয়ে আমাদের পৃথিবীর মনুষ্যের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করবার চেষ্টা করছে আর একজন কবি হয় তো সেই মঙ্গল গ্রহকে অনন্ত গগনোদ্যানের একটি লোহিত কুসুম বলে বিশ্বাস করেই সন্তুষ্ট। হয় তো এ ভ্রম; কিন্তু কত সময় আমরা ভ্রান্তিতেই সন্তুষ্ট থাকি। আমাদের মত উদ্দেশ্যহীন জীবনের সুদীর্ঘ যাত্রাটাই কি ভ্রম নয় ? কিন্তু এ ভ্রম দূর হয়ে যায়, আমরা স্বপ্ন হতে হঠাৎ জেগে উঠি এবং কঠোর সত্যের অতিপরিস্ফুট কঠিন শিলাতলে নিক্ষিপ্ত হই, তখন শান্তির আশায় আর একটা অভিনব ভ্রমের কুহক রচনার জন্য আমাদের প্রাণ আকুল হয়ে উঠে।

যা হোক, এ দার্শনিক তত্ত্ব এখানে থাক। ব্যাসদেবের আসন দেখতে দেখতে মাথার মধ্যে এতখানি দার্শনিক ভাব জাগিয়ে তোলা অনেকেরই বাহুল্য বোধ হবে। আসন–দর্শন ত্যাগ করে আমরা তিন জনেই গুহার মধ্যে প্রবেশ করলাম। ব্যাসগুহার নাম শুনে ভেবেছিলাম, এ বুঝি একটা ছোট গুহা; তার মধ্যে ব্যাসদেব এবং বড় জোর তাঁর লোটা কম্বল ধরতে পারে; কিন্তু গুহায় প্রবেশ করে দেখতে পেলাম, সে এক প্রকাণ্ড গহ্বর, তার মধ্যে এক–শো দেড়–শো লোক অনায়াসে বসতে পারে; তার মধ্যে বিস্তীর্ণ দেওয়াল, তাতে যুগান্তের কালি ও ধোঁয়ার দাগ লেগে আছে। ব্যাসদেবের গুহা, কাজেই এখানে যাগযজ্ঞের অভাব ছিল না, এ হয় তো তারই ধোঁয়ার চিহ্ন ! আমি কল্পনাচক্ষে মহাভারতীয় যুগের হোম যজ্ঞ সমাকীর্ণ এই সুবিস্তীর্ণ আশ্রমে একটি শান্তিপূর্ণ পবিত্র তপোবনের চিহ্ন দেখতে পেলাম। শুনেছি থিওজফীষ্ট মহাশয়েরা বলেন, এক একটা জায়গায় বৈদ্যুতিক হাওয়া খুব ভাল; সেই সেই জায়গা হিন্দুদিগের তীর্থস্থান। এ কথাটা কতদূর সত্য তা জানি নে। এ জায়গাটা যদিও তীর্থের লিস্ট হতে নিজের নাম খারিজ করেছে, তবু যে শান্তি পবিত্রতা ও স্বর্গীয়ভাব এই গিরি–অন্তরালে সংগুপ্ত আছে, অনেক তীর্থে তা একান্তই দুর্লভ। আমরা গুহার মধ্যে অনেকক্ষণ বসে রইলাম, পৌরাণিক স্মৃতির তরঙ্গ আমাদের প্লাবিত করতে লাগলো ! এমন স্থানে এসে কি গান না করে থাকা যায় ? স্বামিজী আমাকে গান করতে অনুরোধ করলেন, এবং নিজেই আরম্ভ করলেন –

''মিটিল সব ক্ষুধা, তাঁর প্রেমসুধা,
চলো রে ঘরে লয়ে যাই।''

পথশ্রমে এই দারুণ ক্লান্তির পর ভাঙা গলাতে গুহা প্রতিধ্বনিত করে এই গানটি বার বার গাওয়া গেল; এমন মিষ্টি লাগলো যে, নিজেরাই মোহিত হয়ে পড়লাম। যাঁরা ভাল গায়ক তাঁরা এখানে গান আরম্ভ করলে বুঝি পৃথিবী স্বর্গ হয়ে যায় ! আমি দুই এক পালটা গেয়ে ছেড়ে দিতে চাই, স্বামিজী আবার আর একটি গান আরম্ভ করেন।

আমাকে আবার গাইতে হয়, তাঁর ক্ষুধা যেন আর মেটে না; শেষটা তাঁকে দেখে বোধ হল, তাঁর যেন কিছুতেই তৃষ্ণা মিটল না।

আমরা এইভাবে অনেকক্ষণ কাটিয়ে দিলাম। বেলা একটা বেজে গেল; আর বেশি দেরি করলে পথে কোনও বিপদে পড়তে পারি মনে করে আবার উঠে পড়লাম ! তবু কি সেখান থেকে উঠতে ইচ্ছা করে ? আর সেখানে আসবো সে আশা নেই ভেবে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে সে স্থান থেকে বিদায় নিলাম। এমন কত স্থান হতে বিদায় নিয়েছি, ভবিষ্যতে আরও কিছু সুন্দর দৃশ্য দেখতে পাব, এই আশাতেই এমন সকল স্থানের প্রলোভন ছাড়তে পেরেছি, নতুবা হয় তো চিরজীবন এই সকল পুণ্যদৃশ্যে কাছে পড়ে থাকতাম।

গুহা ত্যাগ করে তিন জনে নদীতীরে এলাম। যে রাস্তা দিয়ে নদী পার হয়েছিলাম, তার চিহ্ন মাত্র দেখা গেল না, সুতরাং আবার পূর্ব্ববৎ সন্তর্পণে নদী পার হতে হল, কিন্তু নদী পার হয়ে দেখি আমাদের পথ ভুল হয়ে গেছে। তখন ব্যাকুল হয়ে পথ খুঁজতে লাগলাম এবং তিন মাইলের জায়গায় সাত মাইল ঘুরে অপরাহ্ন পাঁচটার পর বদরিকাশ্রমে পুনঃপ্রবেশ করলাম। আমাদের বিলম্ব দেখে পাণ্ডা বাবাজিরা আমাদের নামে খরচ লিখে বসেছিল; আমাদের সশরীরে এবং সুস্থভাবে ফিরতে দেখে তারা খুব খুশি হল এবং আমরা কি দেখলাম তা বলবার জন্য আমাদের অনুরোধ করল। লোকগুলি বুদ্ধিমান সন্দেহ নাই: আমাদের এত কষ্টের অভিজ্ঞতা দুটি বাহবা দিয়েই আয়ত্ত করে নিতে চায়।

বিশ্রাম

৩১ মে, রবিবার। – আজ ইংরেজি মাসের শেষ দিনে খ্রিস্টানদিগের বিশ্রামবারে ভগবানের অনুগ্রহে অখ্রিস্টান আমরাও বিশ্রাম গ্রহণ করলাম। এ পথে বদরিকাশ্রমই শেষ তীর্থ। তীর্থের তালিকার মধ্যে ব্যাসগুহার নাম নেই, তবুও আমরা সন্ধানে সন্ধানে সেখানে ঘুরে এলাম। এখন নিকটে বা দূরে অন্য কোনও তীর্থের সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না। কাজেই আমাদের হাতে আর কোনো কাজ নেই। এতদিন কাজের মধ্যে ছিলাম; ভাবনা চিন্তা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা, নিদ্রা কিছুতেই বড় ব্যাকুল করতে পারে নি। যখন সংকটাপন্ন বিপদরাশি পাষাণস্তূপের মত জীবনের পথ রোধ করে দাঁড়িয়েছে, তখন সেই বিপদজাল হতে উদ্ধার হবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করা গিয়েছে। তারপর আর সে কথা মনে হয় নি। নূতন উৎসাহ নূতন বল এবং অপেক্ষাকৃত অধিকতর স্ফূর্তিতে নব নব পথে অগ্রসর হওয়া গেছে। ক্ষুধার সময় একমুষ্টি আহার জুটলে ভাল, না জুটলো পথ হতে দুটো ফলমূল সংগ্রহ করে আহার করা যেত, অথবা পরিপূর্ণ মাত্রায় উপবাস। নিদ্রার জন্যে কোনো দিন কিছু আয়োজন করতে হয় নি, কিন্তু বিনা আয়োজনে, কি গিরিগুহা, কি অনাবৃত নদীতীর, কোথাও তাঁর শুভাগমনের ব্যাঘাত জন্মেনি। আজ একমাসেরও অধিক পূর্বে যে ব্রত মাথায় নিয়ে বদরিনাথের এই তুষার শৈলমণ্ডিত সুপবিত্র পীঠতল দেখতে অগ্রসর হয়েছিলাম – আজ তার শেষ। তাই আজ শ্রান্তিভরে হৃদয় ভেঙে পড়েছে, এতদিন ঘুরে বেড়ালাম – যে আশায় এত দেশভ্রমণ, তার কিছুই পূর্ণ হলো না। প্রকৃতির

দৃশ্য বৈচিত্র্যে সাধকের একান্ত সাধনায় শত শত ভক্ত হৃদয়ের নিষ্ঠা ও ভক্তিতে যে মহান ভাব, যে পবিত্রতা, যে একটা অব্যক্ত মাধুর্যের পরিচয় পেয়েছি, তা প্রকৃতই শান্তিপ্রদ; কিন্তু সে শান্তি ক্ষণস্থায়ী; হৃদয়ের অসীম পিপাসা তাতে প্রশমিত হয় না; প্রাণের কঙ্কালসার জীর্ণ আবরণ ভেদ করে একটা দুর্দমনীয় অতৃপ্তি এখনও হাহাকার করছে। বিশ্বের সমস্ত সুন্দর জিনিস তাকে এনে দিচ্ছি, সে একবার আগ্রহের সঙ্গে হাতে করে নিচ্ছে, তার পর তুচ্ছ জিনিসের মত দূরে ফেলে দিচ্ছে। কতবার হয় তো পরশমণি এনে তার হাতে সমর্পণ করে দিয়েছি, কিন্তু কাচখণ্ডের মত সে তা দূরে ফেলে দিয়েছে। হায় যদি সে একবার চিন্তে পারতো তা হলে হয় তো তার এই তৃষিত ক্রন্দন, এই জীবনব্যাপী দীর্ঘনিঃশ্বাস থেমে যেত।

আজ আর কোনো কাজ নেই, আজ শুধু বিশ্রাম করবো ভেবে বদরিকাশ্রমের শুভ্র তুষারমণ্ডিত ক্ষুদ্র উপত্যকার একখানি ছোট ঘরে কম্বল জড়িয়ে বেশ গরম হয়ে বসা গেল। কিন্তু চিন্তার আর বিরাম নেই; আজ আবার পুরাতন সমস্ত কথা নূতন করে মনে হতে লাগলো। বোধ হলো, জীবনটা আগাগোড়া একটা নাটক; এক অংশের সঙ্গে আর এক অংশের কোনও সংশ্রব নেই; যবনিকা পড়ছে এবং যবনিকা উঠছে; আর আমি তারই মধ্যে কখন ছাত্র, কখন শিক্ষক, কখন সংসারী, কখন বৈরাগীর অভিনয় করে যাচ্ছি। কেউ করতালি দিচ্ছে, কারও বা বুকে বেদনা এবং চোখে অশ্রুর সঞ্চার হচ্ছে; জিজ্ঞাসা করছে আর কতদূর ? এ জীবন ট্র্যাজিডিতে আমিই পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, অন্যেরা ত দূরের কথা; এখন এ পর্বতের প্রান্ত হতে দেহের বৃন্তটুকু থেকে জীবন খসে পড়লেই বুঝি নাটকাভিনয়ের অবসান হবে। জানি না কোথায় এর শেষ অঙ্কের সমাপ্তি। যেখানেই হোক আমার কিন্তু বিশ্রাম নিতান্ত দরকার হয়ে পড়েছে।

শৈশবের কথা, যৌবনের কথা একবার সেই রাজ্যের সুখ–কুঞ্জ পল্লীগ্রাম, একবার যৌবনের কর্মবৈচিত্র্যে পূর্ণ কলিকাতা, ঘুরে ফিরে সেইগুলিই এই পাষাণ প্রাচীরবেষ্টিত হিমালয়ের উপত্যকার মধ্যে আমার কর্মশ্রান্ত ক্লান্ত হৃদয়কে আন্দোলিত করতে লাগলো। এই লোটা, কম্বল এই সন্ন্যাস শুধু বিড়ম্বনা। হৃদয়ের সুখ দুঃখ লোটা–কম্বলে নিয়ন্ত্রিত হবার কথা নয়, যা ফেলে এসেছি, তাদের আসক্তি ও আকর্ষণ এখনও চিরনবীন। বাল্যকালে কোনদিন গৃহপ্রান্তে একটা খেজুর গাছ পুতে এসেছিলাম সে আজ শাখাবাহু বিস্তার করে এখনও যেন আমাকে আহ্বান করছে; বাড়ির অদূরবর্তী গৌরী নদী – সকালে সূর্য উঠবার সময় তার চড়ার উপর বালিগুলি চিকচিক করতো; ছোট ছোট সঙ্গীদের সঙ্গে তারই উপর লাফালাফি করে বেড়াতাম, সে যেন সে দিন ! আবার বর্ষাকালে যখন সমস্ত চড়া ডুবে যেত, চড়ার উপরের বনঝাউ গুলিকে নত করে নদীর স্রোত চলত তখন আমরা কতবার সেখানে সাঁতার কেটেছি; পরিশ্রান্ত হলেই ঝাউগাছের আগা ধরে বিশ্রাম করতাম এবং কদাচিৎ দূর থেকে মার গলার সাড়া পেলেই বাবলা গাছের সারের ভিতর দিয়ে বানের জলে আকাণ্ড নিমজ্জিত কচুবনকে পদদলিত করে সরকারদের গোয়াল ঘরের ভিতর গিয়ে লুকিয়ে থাকতাম। একদিন পায়ে একটা বাবলার কাঁটা বিঁধেছিল। এখনও মনে করতে চোখে জল আসে – মা আমার সেই কোমল পা'খানি কোলের উপর নিয়ে ছুঁচ দিয়ে কত যত্নে সেই কাটাটা তুলে দিয়েছিলেন। সামান্য একটা কাঁটা বের করবেন, তাতে কত যত্ন, কত ভয় সাবধানতা, – যেন তাঁর প্রাণের সমস্ত আগ্রহ সেই ক্ষুদ্র ছুঁচ–বৃন্তে ভর করেছিল। কথাটা সামান্য এবং সে দিন

বহুকাল চলে গেছে, কিন্তু জীবনের এই মরুপ্রান্তে শৈশবসুখের সেই ইতিহাসটুকু এখনো ভুলিনি।

সমস্ত সকাল–বেলাটা সেই গৃহকোণে বসে সেই রকম চিন্তায় কেটে গেল। স্বামিজী কোথায় বেড়াতে গিয়েছিলেন; বৈদান্তিক ভায়া বোধ করি, কোন জায়গায় তর্কের গন্ধ পেয়েছিলেন; তিনি অনেকক্ষণ হতে এ অঞ্চল ছাড়া। বেলা প্রায় দশটা সাড়ে–দশটার সময় স্বামিজী কুটিরে এসে উপস্থিত হলেন। আমাকে চিন্তামগ্ন দেখে তিনি কিছু শঙ্কিত হলেন, স্নেহ মধুরস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন,''তোমার কি কিছু অসুখ হয়েছে ?'' তাঁর সেই কোমল স্নেহের স্বরে আমি অনেকটা তৃপ্তি অনুভব করলাম, বললাম, ''না আমার অসুখ হয নি, আমি আজ বিশ্রাম করছি'' – তিনি হাফ ছেড়ে বললেন, ''তবু ভাল !'' আমি যে তখন কি গুরুতর বিশ্রামে প্রবৃত্ত তা তিনি বোধ করি বুঝতে পারেন নি। যা হোক ক্রমাগত এই পথশ্রম দুশ্চিন্তা এবং ক্লান্তিতে আমি একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়েছি, তা তিনি কতটা অনুমান করতে পারলেন, – সুতরাং আমাকে একটু প্রফুল্ল করবার জন্য অনেক বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক তত্ত্বের অবতারণা করলেন। সবই পুরানো কথা – সেই সংসার অসার, জীবন মায়াময়, আসক্তি সকল দঃখের মূল, সুখ দঃখ হতে হৃদয়কে অব্যাহত রাখাই প্রকৃত মনুষ্যত্ব লাভের মূল উপায়। পাঁজি পুঁথিতে এবং ধর্মপ্রচারকদিগের মুখে এই বাঁধি বোল বহুদিন হতে শুনে আসা যাচ্ছে, সুতরাং এ সকল কথা শুনতে আর তত আগ্রহ বোধ হলো না। তখন তিনি তাঁর যৌবনকালের ভ্রমণ বৃত্তান্ত আমাকে বলতে আরম্ভ করলেন। আসামের পাহাড়ে পাহাড়ে কেমন তিনি ঘুরে বেড়িয়েছেন, ভগবৎকৃপায় কতবার তিনি আসন্ন বিপদের হাত থেকে কেমন করে রক্ষা পেয়েছেন, সেই কথা বলতে লাগলেন; কিন্তু আমার সে নিস্তেজ ভাব কিছুতেই দূর হলো না।

দুপুরের সময় একাই বেড়াতে বেরুলাম। ভিড় অনেক কম, যাত্রীরা প্রায় সকলেই বাসায় গেছে – এখনও পথিপ্রান্তে তীর্থযাত্রার কতক কতক নিদর্শন আছে; রাস্তা জনহীন, মধ্যাহ্নের রৌদ্রে আরও নিরালা বলে বোধ হতে লাগলো; রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে; উপরে পর্বতশৃঙ্গে গলিত তুষার চিক চিক করছে; দূরে একটা গাছে পাতা নড়ছে এবং তুষারনির্মুক্ত ধূসর গাত্র উঁচু নীচু ফাটল সংযুক্ত, দেখতে মোটেই ভাল লাগছে না। রাস্তা দিয়ে যেতে মনে হলো আমাদের সেই বঙ্গের সমতল ক্ষেত্রের খানিকটা শস্য–শ্যামল খোলা মাঠ, অবাধ বায়ুর মধুর হিল্লোল, নিকটে একটা ছোট খাল, জেলেরা তাতে বাসজাল ফেলে মাছ ধরছে, বটতলায় রাখালেরা মিলে জটলা করছে – আর শস্যক্ষেত্রের দিকে একটা গোরুকে ছুটতে দেখে দৌড়ে এসে তাকে ঠেঙাচ্ছে, বুঝি এই রকম প্রাচীন ও অভ্যস্ত দৃশ্যের মধ্যে গেলে আমার প্রাণ জুড়িয়ে যায়। বাঙালির ছেলে ক্রমাগত এই রকম লোটা কম্বল ঘাড়ে করে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরতে আর কিছুতেই ভাল লাগছে না। এ পাহাড় প্রকৃতির সঙ্গে আমার প্রকৃতির কোন রকম মিশ খাচ্ছে না। সুখ চেয়ে স্বস্তি ভাল – অতএব এখন মনে করছি একবার বাড়ি ফিরে যাব; এই সন্ন্যাস অথবা তার চেয়েও অতিরিক্ত কিছু আমার আর পুষিয়ে উঠছে না ভাবছি –
''এখন ঘরের ছেলে, বাঁচি ঘরে ফিরে গেলে,
দু'দণ্ড সময় পেলে নাবার খাবার।''

যারা আমার এই ভ্রমণ বৃত্তান্ত একটু ঔৎসুক্যের সঙ্গে পড়ছিলেন, এবং প্রতি মুহূর্তে আমাকে একটা দিগ্‌গজ সাধুরূপে পরিণত হওয়া দেখবার আশায় ধৈর্যাবলম্বন করেছিলেন, তাঁরা হয় তো এতদিনের পরে আমার এই লোটা কম্বল এবং বক্তৃতার মধ্যে থেকে আমার স্বরূপ নিরীক্ষণ করে ভারি নিরুৎসাহ হয়ে পড়বেন, কারো কারো মুখ দিয়ে দু'চারিটি কটুবাক্যও বের হতে পারে। আমার তাতে আপত্তি নাই, এ ছদ্মবেশের চেয়ে সে বরং ভাল।

আমার মন ঢাউস ঘুড়ির মত অনন্ত বিস্তৃত কল্পনারাজ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে কিন্তু আমি বাজারের পথ ছাড়িনি। ঘুরতে ঘুরতে বাজারের মধ্যে এসে দেখলাম, একটা জায়গায় অনেকগুলি লোক জড় হয়েছে। প্রথমেই মনে হলো হয় ত কোনো সাধুর কিঞ্চিৎ গাঁজার দরকার হয়েছে, তাই সে কোন রকম বুজরুকি দেখিয়ে গাঁজার অর্থ সংগ্রহের চেষ্টায় আছে। ব্যাপারটা কি দেখবার জন্য আমিও ভিড়ের মধ্যে মিশে গেলাম। দেখলাম সাধু সন্ন্যাসী আমার সেই পূর্বপরিচিত পণ্ডিত কাশীনাথ জ্যোতিষী। জ্যোতিষী মহাশয় সেই সমবেত ক্ষুৎকাতর পাহাড়ীদের খাদ্যসামগ্রী বিতরণ করছেন। কাকেও পয়সা, কাকেও কাপড় দান করছেন, তাঁর মিঠে কথায় সকলেই সন্তুষ্ট হয়েছে। এই রকম ব্যবহারে তিনি অনেক জায়গায় লোকের উপর আধিপত্য স্থাপন করে নিয়েছেন। তাঁর হৃদয়টা স্বভাবতই দয়ালু, চিত্ত উদার বলে বোধ হয়; দোষের মধ্যে তিনি একটু প্রশংসাপ্রিয়। নির্দোষ কটা লোক ? সে জন্যে তাঁকে বড় নিন্দা করা যায় না। পূর্বেই বলেছি একবার তাঁহার অনুগ্রহের উৎপাতে আমি বিষম বিব্রত হয়ে পড়েছিলাম, আজ তাঁর সঙ্গে দেখা হতেই আগ্রহে তিনি কাছে ডাকলেন; আমার কুশল জিজ্ঞাসা করলেন, পথে আর কোন অসুখ হয়েছিল কি না, তারও খোঁজ নিলেন। তাঁর সমস্ত কথার উত্তর দিয়ে শান্ত অপরাধীর মত তাঁর সম্মুখে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমাকে বসতে বলে তাঁর ভৃত্যকে তিনি তাঁর বাক্সটা আনতে আদেশ দিলেন। আবার বাক্স ! সর্বনাশ ! এখনি হয় তো তিনি হরেক রকম ভাষায় লেখা একতাড়া সার্টিফিকেট খুলে বসবেন আর এই সব পাহাড়ীদের সম্মুখে আমাকে তার ব্যাখ্যা করতে হবে ? কি কুক্ষণেই আজ বাজারে পা দিয়েছিলাম ! মনে বিলক্ষণ অনুতাপের উদয় হলো; কিন্তু সে জন্য জ্যোতিষী মহাশয়ের বাক্সের শুভাগমন বন্ধ রইল না।

যা হোক শীঘ্রই আমার ভয় দূর হল; দেখলাম এবার আর তিনি সার্টিফিকেটের তাড়ায় হাত দিলেন না, বাক্সের মধ্য হতে একখানা খাম বের করে হাস্যপূর্ণ–মুখে আমার দিকে চাইলেন এবং সেই খামখানি আমার হাতে দিলেন। খামখানি চতুষ্কোণ, সুন্দর মসৃণ এবং পুরু, ডাকহরকরাদের ময়লা হাতের সংস্পর্শে কিঞ্চিৎ শ্রীভ্রষ্ট। খামের সম্মুখে সুন্দর ইংরেজি অক্ষরে জ্যোতিষী মহাশয়ের নাম লেখা অপর দিকে স্বর্ণবর্ণে অঙ্কিত একটা মনোগ্রাম; মনোগ্রামটি দেখে লেখকের নাম ঠিক ধরতে পারলাম না। ডাকঘরের মোহর দেখে বুঝলাম, এ চিঠি কলিকাতা থেকে আসছে। চিঠিখানি হাতে করে কি কর্তব্য ভাবছি; তখন জ্যোতিষী মহাশয় চিঠিখানা পড়তে আমায় অনুমতি করলেন। পত্র খুলে দেখলাম, কলিকাতা হতে মহারাজ সার যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর বাহাদুর জ্যোতিষী মহাশয়কে এই পত্রখানি লিখেছেন। হিন্দিভাষায় লেখা মহারাজের স্বাক্ষর ইংরেজিতে। জানিনে পত্রখানি রচনা কার, কিন্তু যারই রচনা হোক ভাষাটি অত্যন্ত সুন্দর, হিন্দি ভাল লিখতে না পারি, বহুদিন এ হিন্দিভাষার দেশে থেকে ভাষার ভালমন্দ বুঝবার

একটু ক্ষমতা হয়েছিল। বহুদূরদেশ প্রবাসী একজন হিন্দুস্থানী ব্রাহ্মণের জন্য মহারাজ বাহাদুরের এরূপ যত্ন প্রশংসনীয়। জ্যোতিষী মহাশয়ের শরীর ভাল নয় তাই মহারাজ তাঁকে দেশভ্রমণ ত্যাগ করে শীঘ্রই দেশে অথবা কলিকাতায় প্রত্যাগমনের জন্য বারবার অনুরোধ করে পত্র লিখেছেন। জ্যোতিষী মহাশয় আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন আমার সঙ্গে মহারাজের আলাপ আছে কি ন। মহারাজের অনেক মহৎ গুণের কথাও আমাকে বললেন, তিনি যে অনেক বড় রাজা ও মহারাজা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ তাও দুচারটি উদাহরণ দিয়ে প্রমাণ করলেন। প্রশংসাভাজন লোকের প্রশংসা করাই কর্তব্য কিন্তু আমার সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দের বিষয় এই যে কতকগুলি বিদেশি লোক একত্র হয়ে এই দূরবর্তী হিমালয়ের অন্তরালে আমার একজন স্বদেশি ও এবং স্বজাতীয় এমন প্রশংসা করলেন। স্বজাতীর সমস্ত লোকের মধ্যে পরস্পর যে একটা হৃদয়ের গভীর টান আছে সেদিন তা আমি বেশ বুঝেছিলাম; বুঝি শতলক্ষ বাঙালির মধ্যে দাঁড়িয়ে বাঙালির প্রশংসা শুনলে মনে এমন আনন্দের সঞ্চার হতো না; কিন্তু এখানে বাঙালি আমি একা – স্বদেশ আমার বহু পশ্চাতে; সেই প্রাতঃসূর্যের স্নিগ্ধ মধুর কিরণোজ্জ্বল আমার মাতৃভূমি সেই নদীমেখলা শস্য–শ্যামলা বঙ্গদেশ – আমার মা বাবা ভাই বোনের পবিত্র স্মৃতিভূষিত চিরবাঞ্ছিত ভূস্বর্গ আমার তৃষিত হৃদয়ের একমাত্র আকাঙ্খার ধন ! এখানে প্রত্যেক বাঙালির স্মৃতিই আমার কাছে পরম আদরের বস্তু, আমার বোধ হতে লাগলো, জ্যোতিষী মহাশয়ের নিকট আমার একজন প্রিয়তম পরমাত্মীয়ের গল্প শুনছি।

জ্যোতিষী মহাশয়ের একটা বাহাদুরি এই যে, তিনি গল্প করে কখনও ক্লান্ত হন না। ছেলেবেলায় বর্ষাকালে কতদিন সন্ধ্যাবেলা ঘরের মধ্যে মাদুর বিছিয়ে শুয়েছি, আর স্তিমিত প্রদীপের কাছে বসে পিসিমা তাঁর দৈত্যদানব রাক্ষস–রাক্ষসীর রূপকথা বলতেন। আষাঢ়ের সেই দীর্ঘ দিনের অবসানে খেলা–শ্রান্ত ক্লান্ত শিশু শরীরটি নিতান্ত আলস্য–বিজড়িত হয়ে উঠতো; তারপর মেঘখণ্ডিত রাত্রি, মেঘের ডাক, বৃষ্টির ঝম্ ঝম্ শব্দ, সেই শব্দে বিশ্বের সমস্ত নিদ্রা একত্র জড় হয়ে কোমল নয়ন–পল্লব ঢেকে ফেলতো। পিসিমার অসম্ভব আষাঢ়ে গল্পের অসম্ভব নায়কটি, তার প্রেয়সীর অনুরোধে যখন অতল মহাসমুদ্রে ডুব দিয়ে অঞ্জলি পুরে পদ্মরাগমণি তুলছে, ঠিক সেই সময়ে আমাদের ''হুঁ'' বলা বন্ধ হয়ে যেত; পিসিমাও তার শ্রোতাদিগকে নিদ্রা–কাতর দেখে দুঃখিত মনে হরিনামের মালায় অধিক করে মনঃসংযোগ করতেন ! কিন্তু জ্যোতিষী মশাই গল্প করবার সময় পিসিমার চেয়েও বাড়িয়ে তোলেন। কেউ তাঁর কথায় ''হুঁ'' বলুক আর না বলুক, শুনুক আর না শুনুক, তিনি অনর্গল বলে যান, এবং বোধ করি তাতে তাঁর তৃপ্তির অভাব হয় না। তবে সৌভাগ্যবশত তাঁর নিবিষ্টচিত্ত সহিষ্ণু শ্রোতা প্রায়ই দেখা যায়। আজ গল্পের অনুরোধে বেলা একটা পর্যন্ত জ্যোতিষী মহাশয়ের স্নানাহার হয় নি; আমি তাঁকে সে বেলার মত সভাভঙ্গ করতে অনুরোধ করলাম। তিনি উঠে গেলেন আমি সে স্থান পরিত্যাগ করলাম।

বাজারের দিক ছেড়ে যে দিক দিয়ে বদরিকাশ্রন যেতে হয়, সেই দিকে খানিকদূর গেলাম। কিছুদূর গিয়ে দেখি, একদল সাধু আসছে। পাঠকগণের হয় তো মনে আছে, আমরা যখন এই পথে আসি, তখন দ্বিতীয় দিনে একদল উদাসী সাধুর সঙ্গে আমাদের দেখা হয়েছিল – এ সেই দল; কেদারনাথ দর্শন করে আজ এখানে এসেছে। সাধুদের কাহারও কাহারও সঙ্গে আমার সামান্য পরিচয় হয়েছিল। তাদের সঙ্গে যথারীতি

অভিবাদন ও প্রত্যাভিবাদন শেষ হতে না হতেই আমার সেই পূর্ব পরিচিত বাঙালী সাধুটি এসে উপস্থিত হলেন, এবং আনন্দের সঙ্গে আমাকে আলিঙ্গন করলেন। পরিষ্কার বাংলায় বললেন, ''ভাই, আর যে তোমার সঙ্গে দেখা হবে এ আশা ছিল না'' – সেই সকল সাধুকে পেয়ে আমার বড়ই আনন্দ হলো। আজ আমার মনের অবস্থা অতি খারাপ; এ অবস্থায় আমার সহধর্মী একজন স্বদেশি লাভ বিধাতার বিশেষ অনুগ্রহ বলে মনে হলো ! সাধুকে সঙ্গে নিয়ে আড্ডার দিকে চললাম। তাঁর সঙ্গে খান দুই পুঁথি, একটা কমণ্ডুল, একটা ছেঁড়া কম্বল। তাঁর তখনও আহারাদি হয় নি। আমি বাজার হতে তাঁকে খাদ্যসামগ্রী কিনে দিতে চাইলাম, কিন্তু তিনি তাতে নিষেধ করলেন, বললেন সঙ্গীদের কারও খাওয়া দাওয়া হয় নি, এ অবস্থায় তাঁর আহারাদি শেষ করা নিয়ম বহির্ভূত। কোনদিনই বেলা চারিটার আগে তাঁর আহার হয় না, কারণ দলে লোক অনেক, তার উপর গ্রন্থ সাহেবের পূজা আছে; পূজা ও ভোগের পর ইহারা আগে অতিথি অভ্যাগতদিগের আহার করায়, পরে নিজেদের ব্যবস্থা।

আমরা ঘুরতে ঘুরতে বেলা তিনটার সময় বাসায় ফিরে এলাম। স্বামিজী ও শ্রীমান অচ্যুতানন্দ বাসাতেই ছিলেন। আমরা চারিজন গল্প আরম্ভ করলাম। কিন্তু সংসারে অবিমিশ্র সুখ কোথায় ? গল্পের আরম্ভেই অচ্যুত ভায়া আগন্তুক সাধুর সঙ্গে তর্ক করবার এক বিপুল আয়োজন করে বসলেন। সাধুটির তখনও আহার হয় নাই এবং পথশ্রমে তিনি নিতান্ত ক্লান্ত, সুতরাং তিনি তর্কের সুবিধা সত্ত্বেও তাহাতে মনযোগ দিলেন না। বেলা প্রায় চারটে বাজে দেখে আগন্তুক সাধু উঠে গেলেন, বললেন শীঘ্রই আবার ফিরে আসবেন। আসন্ন তর্কের আশা বিলুপ্ত হওয়াতে বৈদান্তিক নিরুৎসাহ চিত্তে নিশ্চলদাসের বেদান্তদর্শন খুলে বসলেন। আমি দেখলাম, বেচারা নিতান্ত অসুবিধায় পড়েছে, অতএব প্রস্তাব করলাম, ''এস এই তীর্থস্থানে বসে আমরা একটু শাস্ত্রালোচনা করি।'' এই রকম শাস্ত্রালোচনা যে তর্কের ভূমিকা, তা স্বামিজীর বুঝতে বাকি রইল না। তিনি বললেন, ''তোমরা বাপু শাস্ত্র চর্চা কর, আমি একটু বাহিরে যাই।'' স্বামিজী রণে ভঙ্গ দিলেন, আমরা মায়াবাদ, অদ্বৈতবাদ, বিবর্তনবাদ প্রভৃতি নিয়ে এক ঘোর দার্শনিক তর্ক জুড়ে দিলাম। আমার উদ্দেশ্য অচ্যুত ভায়াকে কিছু জব্দ করা, সুতরাং যত তর্ক করি না করি, ক্রমাগতই বলি, ''আরে ভাই, তুমি এই সোজা কথাটা বুঝতে পারছ না; এটা যার মাথায় না আসে, তার পক্ষে তর্ক না করাই নিরাপদ।'' বুদ্ধির উপর দোষারোপ করলে, অতি ভালমানুষরও রাগ হয়। বৈদান্তিক আরও অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন, এবং অধিক উৎসাহের সঙ্গে নানা রকমের শ্লোক আওড়াতে লাগলেন, আমি বলি, ''হল না, – হল না, ও শ্লোক ঠিক এখানে খাটবে না।'' ''কেন খাটবে না'' বলে তিনি আবার সেই শ্লোকের ব্যাখ্যা আরম্ভ করেন, কোন্ টিকাকার কি বলে গেছেন তা পর্যন্ত বাদ গেল না।

ক্রমে সন্ধ্যা উপস্থিত। স্বামিজীর সঙ্গে সাধু কুটিরে প্রবেশ করলেন; তখনও আমাদের তর্ক সমানভাবে চলছে। স্বামিজী বৈদান্তিককে ডেকে বললেন ''রাত্রি হয়ে এল, শুধু তর্কতে ক্ষুধানিবৃত্তির কোন সম্ভাবনা নেই, এখন তর্ক ছেড়ে আহারের বন্দোবস্তে মন দিলে হয় না কি ?'' প্রবল যুদ্ধের মধ্যে শান্তির শ্বেত নিশান দেখালে যেমন অর্ধপথে যুদ্ধনিবৃত্তি হয়, তেমনই স্বামিজীর এই কথায় তর্কযুদ্ধ হঠাৎ থেমে গেল ! পৃথিবীর অনেক তর্ক অন্নচিন্তায় নিষ্পত্তি হয়ে যায়; আমাদেরও তাই হলো। সেই সন্ধ্যাকালে

দিবা ও রাত্রি, আলো ও অন্ধকারের মধুর মিলনক্ষণে স্বামিজী ও আগন্তুক সাধু সংযত হৃদয়ে পুরাণের শান্ত–গম্ভীর বিষয় আলোচনা করতে লাগলেন; তখন দূরে মন্দিরে শঙ্খ ঘণ্টা ধ্বনিত হচ্ছিল, দূরে সন্ন্যাসীর দল সমস্বরে ভজন আরম্ভ করেছিল; আমার প্রাণের মধ্য হতে একটা ব্যাকুল স্বর নিতান্ত কাতর ভাবে যেন গাহিতে লাগিল –

''কী করিলি মোহের ছলনে।
গৃহ তেয়াগিয়ে, প্রবাসে ভ্রমিলি,
পথ হারাইলি গহনে।
   (ঐ) সময় চলে গেল, আঁধার হয়ে এল
      মেঘ ছাইল গগনে।
      শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না,
      বিঁধিছে কণ্টক চরণে।''

অনেক রাত্রি পর্যন্ত এই গানটি পুনঃ পুনঃ আমার মনে ধ্বনিত হতে লাগল। কেবলই মনে হতে লাগল, ''শ্রান্ত দেহ আর চলিতে চাহে না, – বিঁধিছে কণ্টক চরণে !'' নানকের কথা ও কবীরের দোঁহা আবৃত্তি করে অনেক রাত্রে আগন্তুক সাধু ও স্বামিজী শয়ন করলেন, আমিও কুটিরের একপ্রান্তে কম্বলশায়ী হলাম। এবারের মত আমাদের তীর্থযাত্রা শেষ হলো। সকালে আমরা দেশে ফিরব, – দেখি নূতন পথ নূতন দেশ দিয়ে ফিরে যেতে যদি কোন রত্নের সন্ধান পাই।

প্রত্যাবর্তন

২৯ মে, শুক্রবার। – অপরাহ্নে বদরিকাশ্রমে উপস্থিত হই। শনি, রবিবারে সেই পবিত্র তীর্থেই কাটানো গেল। আমাদের হিন্দুদিগের মধ্যে একটা নিয়ম আছে, প্রত্যেক তীর্থস্থানেই তে–রাত্রি বাস করতে হয়। আমরাও হিন্দুধর্মের সকল নিয়ম অক্ষরে অক্ষরে পালন না করলেও তীর্থ স্থানে তে–রাত্রিবাসের পুণ্য অর্জন করা গেল।

তিনদিন কাটানো গেল, তবু এখান হতে ফিরতে ইচ্ছা হয় না, এমন সুন্দর স্থান ! ভারতে সুন্দর অনেক স্থানই দেখা গিয়াছে, কিন্তু এমন শান্তিলাভ আর কোথাও হয় নি। অনন্ত সুন্দরের পরিপূর্ণ সত্তায় আত্মাকে বিসর্জন দিয়ে যে তৃপ্তি, তা এখানেই পাওয়া যায়। তৃষিত পান্থের জীবন ব্যাপী পিপাসা নিবৃত্তি হয়। কিন্তু হায়, তথাপি চপল চঞ্চল চিত্ত অধীর হয়ে উঠে এবং সূর্যের উজ্জ্বল আলো, চন্দ্রের সুবিমল স্নিগ্ধ হাসি, নীল আকাশ ও আমাদের মাতৃস্বরূপিণী, ফলপুষ্প শোভিনী বসুন্ধরা সমস্ত অন্ধকার বলে প্রতীয়মান হয়।

তাই এই নিভৃত পার্বত্য–কুঞ্জে শান্তির আলয়ে এসেও মধ্যে মধ্যে প্রাণটা দূরদেশে ছুটে যেতে চায়। যখন পথভ্রমণে পা দুটি অসাড় হয়ে এসেছে এবং মন আর কোথাও যেতে রাজি হচ্ছে না, তখন একটা বদখেয়াল দুরন্ত স্কুল মাস্টারের মত কানটা ধরে নাড়া দিচ্ছে, আর বলছে, ''আর কাজ কি এখানে, কম্বল ঘাড়ে করে বেড়িয়ে পড়া যাক।''

ইচ্ছা না থাকলেও মন এ কথার বিরুদ্ধে কাজ করতে সমর্থ নয়। সুতরাং দেশের দিকেই ফিরতে হচ্ছে।

কিন্তু আর এক মুশকিল। আমি একা নই; আমার ন্যায় বাধাহীন, বন্ধন-শূন্য, উদ্দাম, অসংযত প্রাণীর কণ্ঠরজ্জু আর দুইজন পথিকের করলগ্ন, তাঁরা হচ্ছেন বৈদান্তিক ভায়া ও স্বামিজী। এমন সাদৃশ্যহীন তিনটি মনুষ্য একসূত্রে গাঁথা কতকটা বিস্ময়কর বটে। কিন্তু আর বুঝি শেষরক্ষা হয় না। বৈদান্তিক এখানে আহার করছেন, আর মহাস্ফূর্তিতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। বহুদিন পরে ইচ্ছেমত সময়ে আহার এবং উপযুক্ত কালে নিদ্রা লাভ করতে পেরে ভায়া আপন খেয়ালেই ঘুরে বেড়ান কাকেও গ্রাহ্য করেন না। দেশে ফিরবার কথা বললেই গম্ভীরভাবে বলেন, ''গৃহধর্মে বিরক্ত সন্ন্যাসীর এ উপযুক্ত কথা বটে !'' কথাটা ঠিক কি ভাবে আমার কানে প্রবেশ করল, তা জান ? আমার বোধ হলো নিশীথ রাত্রে কারারুদ্ধ জগৎসিংহের কাছে আয়েশাকে দেখে শ্লেষরুদ্ধ কণ্ঠে ওসমান যখন বলেছেন, ''নবাবপুত্রীর পক্ষে এ উপযুক্ত বটে !'' কি বলবো, হৃদয়ে আয়েশার মত আবেগ ছিল না, থাকলে বৈদান্তিককে বলতাম, - কি বলতাম এখন সে কথা বলা ভারি শক্ত; তবে তাকে কখনই পল্লীমাতার অজস্র স্নেহ-রস-পুষ্ট মা-হারা আর্ত সন্তান বলে অভিহিত করতাম না।

বৈদান্তিকের কথায় নিরুৎসাহ হয়ে স্বামিজীর কাছে বদরিকাশ্রম ত্যাগের প্রস্তাব করলাম। তিনি বললেন, ''আরও দিন কতক থাকা যাক। চিরদিনই ত ঘুরছি, এখন দিনকতক বিশ্রাম করা মন্দ কি ?'' আমি মনে করলাম বৃদ্ধ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। তাঁর অপরাধ কি ? তাঁর জীবনে পথশ্রম অল্প হয় নি। আমি জীবনের মধ্যাহ্নকালে তাঁকে সংসারযুদ্ধে পরাভূত, অক্ষম, বৃদ্ধ মনে করেছিলাম; কিন্তু এরূপ মনে করার আমার কোন অধিকার নাই। যে বয়সে লোকে পৌত্রপৌত্রী-পরিবেষ্টিত হয়ে আরাম উপভোগ করে, সে বয়সে তিনি অসুরের মত পাহাড়ে পাহাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন ! এরূপ অবস্থায় দুদিন বিশ্রামের জন্য তাঁর হৃদয় ব্যগ্র হবে, তার আর আশ্চর্য কি ? আশ্চর্যের বিষয় এই যে, তিনি আজ হঠাৎ আমাকে উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। শুষ্ক কঠোর উপদেশের উপর আমার বড় শ্রদ্ধা নেই, তাও তিনি জানতেন; তবুও স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে তাঁর এ কষ্ট স্বীকারের আবশ্যকতা বুঝলাম না। শুধু মাথার উপর অবিরল ধারে উপদেশস্রোত বর্ষণ হতে লাগল। ক্রমে তাঁর আসাম-ভ্রমণের কথা; 'কুলি কাহিনী' হতে আরম্ভ করে - কবীর, নানক ও তুলসীদাসের দোঁহা পর্যন্ত কিছুই বাদ গেলনা। স্বামিজী যখন দেখলেন যে তাঁর উপদেশে কোনই ফল হবার সম্ভাবনা নেই, আমার সংকল্প আমি ছাড়ছিনে, এবং এই রকমে চিরজীবনটা দেশে দেশে ঘুরে কাটানোই আমার অভিপ্রেত - তখন দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, ''তবে কালই বেড়িয়ে পড়া যাক !'' সুতরাং বৈদান্তিককে হাত করা আর কঠিন হলো না। তিনজনে পরামর্শ করে ঠিক করা গেল - কালই প্রাতঃকালে বদরিনাথ পরিত্যাগ করতে হবে।

অপরাহ্নে পাণ্ডা লছমীনারায়ণ আমাদের আড্ডায় আহারের কোনো রকম আয়োজন করতে নিষেধ করলেন। বুঝলাম তার বাড়িতে আয়োজন হচ্ছে। সন্ধ্যাকালে আর কোনো কাজ নেই, শেষবারের জন্য বদরিনাথ প্রদক্ষিণ করতে বের হলাম।

বাজারের মধ্যে উপস্থিত হয়ে দেখলাম কাশীনাথ জ্যোতিষী মহাশয় অনেকগুলি পাণ্ডা সন্ন্যাসী পরিবৃত হয়ে একটা ঘরে বসে আছেন। আমাকে নিকটে ডাকলেন। এ সময় আমার মনটা বড়ো ভাল ছিল না, কিন্তু তাঁর কথা অগ্রাহ্য করতে পারলাম না। তাঁর নিকটে উপস্থিত হ'লে তাঁর ইংরেজি সার্টিফিকেট আমাকে দিয়ে তর্জমা করিয়ে নিলেন; তার পর আমার প্রশংসা আরম্ভ হলো; ভবিষ্যতে আমার যে মঙ্গল হবে সে দৈববাণীও করলেন এবং আমরা শীঘ্রই বদরিনাথ ছাড়ছি শুনে আমাকে পথ খরচের সাহায্য করতে চাইলেন। আমি তাঁকে ধন্যবাদ দিয়ে এবং তাঁর এই অযাচিত অনুগ্রহ প্রকাশের জন্য কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সেখান হতে বিদায় হলাম। বিদায়কালে তিনি আমাকে বিশেষ অনুরোধ করলেন, যেন কলিকাতাতে আমি তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। আমার দুর্ভাগ্য, বঙ্গদেশে ফিরে আর তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয় নি।

এখানকার পোস্ট অফিসে গেলাম। পোস্টমাস্টারের সঙ্গে খানিক আলাপ করে নারায়ণের মন্দিরের দিকে যাচ্ছিলাম, পথের মধ্যে শুনলাম মন্দির দ্বার বন্ধ হয়ে গেছে সুতরাং আর নারায়ণ দর্শন হলো না। যখন বাসায় ফিরলাম তখন ঘণ্টাখানেক রাত্রি হয়েছিল।

কিয়ৎক্ষণ পরেই পাণ্ডা লছমীনারায়ণ আর তার কর্মচারী পাণ্ডা বেণীপ্রসাদ এক হাঁড়ি উৎকৃষ্ট খিচুড়ি ও একটা থালে খানিক তরকারি, তিন চারি রকমের চাটনি, আর কতকগুলো পেঁড়া নিয়ে উপস্থিত হলো। রসনেন্দ্রিয় এ সকলের আস্বাদন সুখ বহুকাল অনুভব করে নি। আমি যথেষ্ট আশ্বস্ত হলাম। স্বামিজী একবার বৈদান্তিকের দিকে চেয়ে দেখলেন এই আশাতিরিক্ত ভোজন দ্রব্য দেখে ভায়ার কি আনন্দ ! তাঁর সেই লুব্ধ ব্যগ্র দৃষ্টির কথা অনেক কাল মনে থাকবে ! আহার বিষয়ে আমিও পশ্চাদপদ নহি, এখন পর্বতের মধ্যে কঠোর সন্ন্যাসে আমার আহার প্রবৃত্তিটা কিছু খর্ব হয়ে পড়েছিল। আজ পূর্ণ উৎসাহে লছমীনারায়ণের আনীত দ্রব্যগুলির সদ্ব্যবহার করা গেল। স্বামিজী বললেন, ''অচ্যুত, এবার আমাদের যাত্রা ভাল, রাস্তায় আহারের কষ্ট হবে না।'' স্বামিজীর এই ভবিষ্যৎ-বাণী পূর্ণ হয়েছিল - কিন্তু অচ্যুত ভায়ার অদৃষ্টে সে সৌভাগ্য ঘটেনি - কয়েকদিন পরেই তিনি আমাদের সঙ্গ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন।

আহারান্তে পাণ্ডাদের কিছু দান করা গেল - পরিমাণে অধিক নয়। ভবিষ্যতে আরও কিছু দান করবার আশা দেওয়া গিয়েছিল; কিন্তু তা আর পূর্ণ হবার কোন সম্ভাবনা নেই। রাত্রেই পাণ্ডাদের কাছে বিদায় নিলাম। সে সময়ে লছমীনারায়ণ আমাকে একটা অনুরোধ করেছিলেন, - তা এই যে আমরা বদরিকাশ্রমে এসে যতদিন এখানে ছিলাম, - ততদিন আমাদের কোন অসুবিধা ভোগ করতে হয় নি, পাণ্ডা লছমীনারায়ণ ভারি 'জবর' পাণ্ডা, সে আমাদের খুব যত্ন করে রেখেছিল; এই কথা কটা খবরের কাগজে ছাপার অক্ষরে প্রকাশ করতে হবে। তার বিশ্বাস আমাদের মত বড় বড় (?) লোকে যদি ছাপার অক্ষরে তার জন্যে দু'কথা লেখে, তা হলে তা অব্যর্থ; তার পসার অনতিবিলম্বে ভারি জাঁকিয়ে উঠবে । আমি সেই সরল-প্রকৃতি, উপকারী পাণ্ডার অনুরোধ রক্ষা করেছিলাম। আমার জনৈক বন্ধুর দ্বারা পশ্চিমদেশের দুই একখানি হিন্দি সংবাদপত্রে লছমীনারায়ণের গুণের কথা, বিশেষতঃ সে দেবপ্রয়াগে যে রকম কষ্ট স্বীকার করে দক্ষতার সঙ্গে আমাদের হৃতসর্বস্ব উদ্ধার করেছিল, তা সেই পত্রের মধ্যে

বিশেষরূপে উল্লেখ করা গিয়েছিল। এই প্রশংসাপত্র প্রকাশ করাতে লছমীনারায়ণের কোন উপকার হয়েছে কি না এবং তার পসার কিরূপ বৃদ্ধি পেয়েছে, তা জানতে পারি নি, তবে এ কথা স্পষ্ট বুঝতে পারা গিয়েছিল যে, সর্বত্রই মানব হৃদয়ের প্রবৃত্তি একই রকম। খবরের কাগজে নাম প্রকাশের জন্য আমরা সুসভ্য মানব-সন্তানগুলি কি নিদারুণ আয়াস স্বীকার্ই না করি ? পর্বতবাসী শিক্ষিত পাণ্ডাপুত্রের নিকটও এ প্রলোভন সামান্য নয়। নারায়ণক্ষেত্রে রাত্রি কেটে গেল।

১ জুন, সোমবার। - অতি ভোরে যাত্রা করা গেল। আজ আমাদের নূতন রকমের 'প্রোগ্রাম'। আমি প্রস্তাবকারী, আর স্বামিজী সমর্থনকারী, কাজেই অচ্যুতানন্দ আমাদের মতেই বাধ্য হলেন। আমরা স্থির করলাম - গত রাত্রের মত হনুমান চটিতে অল্পকাল বিশ্রাম করে এবং সম্ভব হলে সেখান থেকে জলযোগ শেষ করে রওনা হব। পাণ্ডুকেশ্বরে সেবার শীরঃপীড়ায় অত্যন্ত কাতর হয়ে পড়েছিলাম, - জীবনের আশা বেশি ছিল না; সেই কথা মনে হওয়াতে পাণ্ডুকেশ্বরের প্রতি সহানুভূতি নিতান্ত হ্রাস হয়েছিল। জানি যে তাতে পাণ্ডুকেশ্বরের কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি নাই, তথাপি স্থির করলাম - সেখানে এক মুহূর্তও অপেক্ষা করা হবে না। পাণ্ডুকেশ্বরে যদি সে দিন না থাকি - তা হলে আমাদের একেবারে বিষ্ণুপ্রয়াগে আড্ডা নিতে হবে। নারায়ণ হতে বিষ্ণুপ্রয়াগ আঠারো মাইল; সমতলক্ষেত্রে আঠারো মাইল পথ পদব্রজে চলা তেমন কিছু কঠিন কাজ নয় - অনেকেই চলেছেন। কিন্তু এই পার্বত্য পথে আঠারো মাইলের মধ্যে যে চরাই ও উৎরাই, এ রকম অতি কমই দেখা যায়। ইহা একদিনে হেঁটে শেষ করা প্রচুর সামর্থ্যের কাজ। স্বামিজী বৃদ্ধ বয়সেও এই দুর্গম পথ অনায়াসে অতিক্রম করতে প্রস্তুত, শুনে আমার মনে অত্যন্ত আনন্দ হলো।

নির্জন, সংকীর্ণ, পার্বত্য-পথ দিয়ে তিনজনে চলছি। কারো মুখে কথা নেই, সকলেই নিজ নিজ চিন্তায় ব্যস্ত। মনটা ভারি উৎক্ষিপ্ত - চিরদিনের জন্য বদরিকাশ্রম ছাড়বার পূর্বে সুন্দর পথ, ঘাট, পরিচিত অপরিচিত প্রত্যেক লোকের বাড়ি - তুষারাচ্ছন্ন বঙ্কিম গিরি-নদী-ঊর্দ্ধে অগণ্য তুঙ্গশৃঙ্গ এবং পর্বতের মধ্যদেশে সমুন্নত সুন্দর বৃক্ষরাজি দেখতে দেখতে অগ্রসর হলাম। অনেকখানি বেলা হলো, আমরা হনুমানচটিতে উপস্থিত হয়ে জলযোগের জোগাড়ে মনোনিবেশ করলাম। অধিক বিলম্ব হলো না - প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে আবার চলতে আরম্ভ করা গেল। প্রায় আধ মাইল যাবার পর মধ্যপথে দেখি - একজন বাঙালি ভদ্রলোক আমাদের দিকে আসছেন। পোশাক আধাসন্ন্যাসী আধা-গৃহস্থ রকমের, গৈরিক বসন, অথচ পায়ে জুতো, মাথায় ছাতা আছে; বর্ণ গৌর; চেহারা দেখে মনে হলো ভদ্রলোকটি সম্ভ্রান্তবংশোদ্ভব; বয়স চল্লিশ বিয়াল্লিশ বৎসর হবে। আমি ও স্বামিজী একত্রেই চলছিলাম। পথিক স্বামিজীকে দেখে ''নমস্কার মশায়'' বলে অভিবাদন করলেন। স্বামিজী কিন্তু তাঁকে চিনতে না পারায় তিনি বললেন, ''মশায় আমাকে চিনতে পারছেন না, আপনার সঙ্গে সেই আমার বম্বে কংগ্রেসে দেখা ?'' স্বামিজী তথাপি তাকে চিনতে না পারায় তিনি কিছু বেশি সংকুচিত হয়ে পড়লেন। পথিক বদরিকাশ্রম সম্বন্ধে দুই চারিটা জ্ঞাতব্য কথা জিজ্ঞাসা করে চলে গেলেন, নিজের কোনো পরিচয়ই দিলেন না। তাঁর পরিচয় জানবার জন্য আমার ভারি কৌতূহল হয়েছিল, কিন্তু স্বামিজীকে নীরব দেখে আমার কোনো কথা জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না; কারণ এ

পর্যন্ত তাঁর যা কিছু আলাপ তা স্বামিজীর সঙ্গেই হচ্ছিল, আমি মধ্যে থেকে দু'এক কথা জিজ্ঞাসা করে কেন নিজের বর্বরতার পরিচয় দিই।

লোকটি বদরিকাশ্রমের উদ্দেশ্যে চলে গেলেন। আমরাও গন্তব্য পথে চললাম। স্বামিজী বারবার বলতে লাগলেন, আমি যেন পাণ্ডুকেশ্বর হতে বিষ্ণুপ্রয়াগ পর্যন্ত ভয়ানক রাস্তাটা খুব আস্তে আস্তে চলি। এদিকে প্রত্যেক কাজে তাঁর উপদেশের বিরুদ্ধাচারণ করা অভ্যাস হয়ে গেলেও আমি অতি সাবধানে এবং আস্তে আস্তে চলতে কৃতসঙ্কল্প হলাম। কিন্তু তবু চলতে চলতে সহসা গতি বৃদ্ধি হয়ে যায় – স্বামিজী অনেক পেছনে পড়েন, – আবার তাঁর জন্য খানিক অপেক্ষা করি।

ক্রমে পাণ্ডুকেশ্বরের বাজারের মধ্যে উপস্থিত হলাম। বেলা তখন প্রায় দুটো; সূর্য পশ্চিম আকাশে একটু ঢলে পড়েছেন; রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে; ভয়ানক রৌদ্র, পাহাড়গুলো অগ্নিময় – জলহীন, ধূসর, উলঙ্গ। বাজারের মধ্যে কদাচিৎ এক আধজন লোক দেখা যাচ্ছে। একখানা দোকান খোলা। দোকানদার সেখানে নেই; আর একখানা দোকান – যে দোকানে আমি গতবারে মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করেছিলাম, সেখানা বন্ধ; বোধ করি দোকানি গ্রামান্তরে পণ্যদ্রব্য সংগ্রহের চেষ্টায় গিয়েছে। আমি একবার ঘৃণাভরে সে দিকে অবজ্ঞাপূর্ণ দৃষ্টিনিক্ষেপ করলাম। বড় ক্লান্তি বোধ হয়েছিল, – এক একবার ইচ্ছা হচ্ছিল, একটু বিশ্রাম করা যাক। কিন্তু প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলাম না। যেমন সবেগে আসছিলাম, তেমনই চলতে লাগলাম। দূর পাহাড়ের গায়ে বহুদূর বিস্তৃত বৃক্ষশ্রেণী, তার নীচ দিয়ে যদি আমাদের গন্তব্য পথ হতো, তবে সেই স্নিগ্ধ ছায়াযুক্ত অরণ্য উপত্যকার শ্যামল শোভা দেখতে দেখতে বেশ আরামের সঙ্গে পথ অতিক্রম করা যেত।

আরাম ভোগের কল্পনা করছি, দেবতার বুঝি তা সহ্য হলো না। চেয়ে দেখি সম্মুখে এক প্রকাণ্ড চড়াই। এতক্ষণে চড়াই উতরাই-এর আরম্ভ হলো; সুতরাং বিনা প্রতিবাদে অধিকতর উৎসাহের সঙ্গে চলতে আরম্ভ করলাম। পদদ্বয় অবসন্ন হয়ে এল, কিন্তু বিরাম নাই। বেলা প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, বিষ্ণুপ্রয়াগ ভিন্ন এ পথে আর কোথাও 'আড্ডা' পাওয়া যাবে না। বৃদ্ধ স্বামিজীকেও গতিবৃদ্ধি করতে হলো।

বেলা ঘণ্টাখানেক থাকতে আমরা বিষ্ণুপ্রয়াগে এসে উপস্থিত হলাম। পূর্বের সেই মন্দিরে এবারও বাসা করা গেল। যে দোকানদারের জিম্মায় মন্দির ছিল, সে আমাদের দেখে বিশেষ উল্লাস প্রকাশ করলে। আমরা কেমন ছিলাম, পথে কোনও কষ্ট হয় নাই ত ইত্যাদি অনেক কথা জিজ্ঞাসা করল। আমি একা দোকানে বসে। যেদিন এখান থেকে বদরিনাথ যাই, সেই দিনের সঙ্গে আজকার প্রভেদ অনুভব করতে লাগলাম। সে দিন কতখানি উদ্যম, উৎসাহ, একটা সুগভীর আকাঙ্ক্ষা এবং একাগ্রতা হৃদয়ের সমস্ত অভাব ও কষ্ট দূর করেছিল। আমরা একটা উদ্দেশ্য একটা ব্রত ধারণ করে চলেছিলাম। সে ব্রত শেষ হয়েছে, এখন হৃদয় শূন্য ! এই কথা ভাবছি, এমন সময়ে স্বামিজী এবং পশ্চাতে বৈদান্তিক ভায়া পরম স্মিতমুখে দর্শন দিলেন। বৈদান্তিককে সহসা ওষ্ঠমূলে হাস্যরসের অবতারণার কারণ জিজ্ঞাসা করাতে তিনি উত্তর দিলেন, ''আজ খুব প্রতিজ্ঞা-পালন করা গেছে। একদমে আঠারো মাইল, এই পাহাড়ে রাস্তা। এর চেয়ে জঙ্গলে বসে অনাহারে চক্ষু মুদে তপস্যা করা সহজ।'' দোকানদারের পুত্র

তার ক্ষুদ্র দেবতাটিকে মন্দিরের মধ্যে জাঁকিয়ে বসাল। আমরা সে রাত্রে প্রচুর অর্থ ব্যয় করে অপ্রচুর আহার্য সংগ্রহ পূর্বক কোন রকমে উদর-দেবতাকে পরিতৃপ্ত করালাম। অনুষ্ঠানের যেটুকু ত্রুটি হলো, তা নিদ্রাতেই পুষিয়ে গেল। বহুকাল এমন নিদ্রাসুখ অনুভব করা যায়নি।

২ জুন, মঙ্গলবার। – এবার ফেরত পথ; কাজেই কবে কতদূর গিয়ে কোথায় আড্ডা নিতে হবে, তা পূর্বেই স্থির করতে পারতাম। বিষ্ণুপ্রয়াগ হতে স্থির করা গেল, সকালে নয় মাইল চলে দ্বিপ্রহরে কুমারচটিতে থাকা যাবে। পূর্বদিন আঠারো মাইল চলে আমাদের শরীর কিছু বেশি শ্রান্ত হয়ে পড়েছে; কাজেই গতি কিছু মন্থর। তার উপর আর এক বিপদ; শেষরাত্রি থেকে ভারি মেঘ হয়েছিল। আমরা যখন রওনা হই তখন অল্প অল্প বৃষ্টি পড়ছিল, কিন্তু অপেক্ষা না করে বেড়িয়ে পড়া গেল। খানিক পথ অতিক্রম করতে না করতেই বৃষ্টি ভয়ানক চেপে এল। সর্বশরীর ভিজে গেল, তার উপর কম্বল ভিজে গিয়ে এমন ভারি হয়ে পড়লো যে তা আর সঙ্গে নেওয়া যায় না। নিকটে তেমন কোনও আড্ডা নেই যে বিশ্রাম করি। অগত্যা ভিজতে ভিজতেই চলতে হলো। যদি একবার ঝুপঝাপ করে বৃষ্টি হয়ে থেমে যায়, তাকে পারা যায়; কিন্তু এ পার্বত্য বৃষ্টি, সে রকম নয় ত ! খানিকক্ষণ বৃষ্টি হয়ে গেল – চারিদিক বেশ ফর্সা হলো, একটু একটু রোদও উঠলো। কোথা থেকে হঠাৎ একখানা ঘোলা মেঘ এসে আবার খানিক বর্ষণ করে গেল। যেন সোহাগের অশ্রু ! সে বেশ হাসছে; হঠাৎ কি একটা কারণ ঘটলো কি ঘটলো না – অমনি প্রবল অশ্রুবর্ষণ আরম্ভ হলো, সকলেই ব্যতিব্যস্ত। সকালে ঘণ্টা তিনেকের মধ্যে আমরা আট দশবার ভিজলাম; ভারি বিরক্ত বোধ হতে লাগল; দুই তিনটি চড়াই উতরাই পার হবার সময় পা পিছলে দুই একবার পদস্খলনের সম্ভাবনাও বড় প্রবল হয়ে উঠেছিল ! সুখের বিষয় খুব সামলানো গেছে !

আজ সকাল হতে আমাদের নূতন পথ। কুমারচটি থেকে বের হয়ে যারা যোশীমঠে যায়, তারা খানিকদূর অগ্রসর হয়ে উপরের পথে যোশীমঠে প্রবেশ করে; আর যারা বরাবর বিষ্ণুপ্রয়াগে আসে তাদের পথ নীচের দিক দিয়ে। আমরা বদরিনাথ দর্শনে আসবার সময় উপরের পথে যোশীমঠে গিয়েছিলাম এবং সেখান হতে একটা প্রকাণ্ড উতরাই দিয়ে বিষ্ণুপ্রয়াগে নেমেছিলাম। এবারে বিষ্ণুপ্রয়াগে টানা সাঁকো পার হয়ে আর চড়াইয়ে উঠলাম না; নীচের পথে ধীরে ধীরে উঠতে লাগলাম। এ পথটা মন্দ নয়। খানিকদূর পর্যন্ত অলকানন্দার খুব নিকট দিয়ে গিয়েছে; তারপর যোশীমঠের পথের সঙ্গে মিশবার জন্যে আস্তে আস্তে উপরে উঠেছে।

এ পথে একটা অতি সুন্দর দৃশ্য দেখলাম। বেলা প্রায় এগারোটা; মেঘ কেটে গিয়েছে এবং সূর্য পাহাড়ের অন্তরাল ছেড়ে ঊর্দ্ধে অনেক দূর উঠেছে; কিন্তু তখনও সমস্ত প্রকৃতি সিক্ত; তাতেই বোধ হচ্ছে, এখনও বেলা বেশি হয় নি। আমরা ধীরে ধীরে গ্রাম্য পথে প্রবেশ করে দেখলাম, একটি গৃহস্থের মেয়ে শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে; বিবাহের পর এই তার প্রথম শ্বশুরবাড়ি যাত্রা। তখন আমোদে উৎসাহের মধ্যে গিয়ে শ্বশুরালয়ে দুই একদিন ছিল, আর আজ কতদিনের জন্য ঘরকন্না করতে যাচ্ছে। তাই তার মা, মাসি, বোন এবং নিতান্ত আপনার জনের ন্যায় পাড়াপড়শিরা এসে রাস্তার ধারে তাকে ঘিরে দাঁড়িয়ে বিদায় দিচ্ছে। মেয়েদের কারো চোখ দিয়ে জল পড়ছে, কেউ তার হাতখানি ধরে কত স্নেহের কথা বলছে। কিন্তু একটা ব্যাপার আমার সবচেয়ে মধুর বোধ হলো।

যে মেয়েটি শ্বশুরবাড়ি যাচ্ছে, তার কোলে একটি বছর দুইয়ের ছোট ছেলে; অনুমান করলাম সে তার ছোট ভাই। ভাইটি কিছুতেই তার শ্বশুরবাড়ি গমনোন্মুখ দিদির কোল ছাড়বে না। যতই সকলে তাকে সাগ্রহে ডাকছে, ততই সে তার দিদির ঘাড়টি দু'হাতে ধরে বারে বারে মুখ ফিরছে, বুঝি সে কত কালের মত তার দিদির স্নেহময় ক্রোড় হতে নির্বাসিত হতে বসেছে, তা বুঝতে পেরেই শিশু তার আজন্মের স্নেহাধিকার ত্যাগ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করছে এবং অন্যান্য ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা একটা আসন্ন বিপদের কল্পনা করে ডাগর চক্ষু মেলে চেয়ে রয়েছে।

আমি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখতে লাগলাম। এই পর্বতের উপরে পাহাড়ে মেয়ের বিদায় দৃশ্য; কিন্তু এই দৃশ্য আমাদের প্রীতিরসসিক্ত মাতৃভূমি, বহুদূরবর্তী বঙ্গের একটা মৃদুস্মৃতি মনের মধ্যে জাগিয়ে দিলে। সে যে বাংলা, আর এ যে পশ্চিমদেশ, তা আমি ভুলে গেলাম; শুধু মনে হলো সেখানেও যেমন মা, ভাই এখানেও তেমনি। দুই দেশের মধ্যে প্রভেদ বিস্তর, কিন্তু হৃদয় ও স্নেহের মধ্যে সর্বত্রই অমর সম্বন্ধ সংস্থাপিত। বৈদান্তিক ভায়া বোধ করি, এ সমস্ত বিষয়ে এমন গভীরভাবে চিন্তা করেন না, সুতরাং মুগ্ধ হৃদয়ে এমন বিদায় দৃশ্য দেখছি দেখে তিনি বিদ্রূপ করে বললেন আবার ভাব লাগলো বুঝি। পথে ঘাটে এ রকম করে ভাব লাগলে চলা যায় না।ও আমি তাঁর কথার কোন উত্তর দিলাম না – শুধু কঠোর দৃষ্টিতে একবার তাঁর দিকে চেয়ে চলতে লাগলাম।

আমার সঙ্গে জামাইটিও অগ্রসর হলো, সেই মেয়েটি আমার আগে আগে চলতে লাগলো। যুবক স্ত্রী নিয়ে ঘরে যাচ্ছে; তার চিন্তা, তার কল্পনা ও সুখ প্রেমস্বর্গচ্যুত সন্ন্যাসীর আয়ত্তাধীন নয়। সংসারের এই মোহবন্ধনই সোনার বাঁধন।

কুমরচটির কাছেই যুবকের বাড়ি। সে সস্ত্রীক বাড়ির দিকে গেল, আমরা চটিতে প্রবেশ করলাম। এখনও অনেক বেলা আছে, কিন্তু আজ শরীর বড় অবসন্ন; তার উপর আবার দুর্যোগ আরম্ভ হলো। কতক্ষণ আকাশ বেশ পরিষ্কার ছিল, ভয়ানক মেঘ ক'রে পুনর্বার বৃষ্টি আরম্ভ হলো। পর্বত-প্রান্তে এক অন্ধকার কোণে একা পড়ে কত কথাই মনে পড়তে লাগলো; শুধুই বোধ হতে লাগলো, –

''সংসার স্রোত জাহ্নবী-সম বহু দূরে গেছে সরিয়া,
এ শুধু ঊষর বালুকা ধূসর মরুরূপে আছে মরিয়া !
নাহি কোনো গতি, নাহি কোনো গান,
নাহি কোনো কাজ, নাহি কোনো প্রাণ,
ব'সে আছে এক মহানির্বাণ আঁধার-মুকুট পরিয়া।''

২ জুন, মঙ্গলবার। – অনেক বেলা থাকতে কুমারচটিতে পৌঁছান গিয়াছিল। চারিদিকে মেঘ খুব আঁধার করে এসেছিল বলে বোধ হচ্ছিল বুঝি আর বেলা নাই। খানিকক্ষণ ঝুপঝাপ বৃষ্ট-বর্ষণের পর্ই মেঘ কেটে গেল, আকাশ পরিষ্কার হলো, রোদ উঠলো। তখন মনে হলো এখনও অনেক বেলা আছে। যদি বেড়িয়ে পড়া যায় ত অনেক পথ এগিয়ে থাকা যাবে। স্বামিজীর কাছে এই প্রস্তাব করলাম, তাতে তিনি রাজি হলেন। আর দেরি কি ? অমনি লাঠি হাতে, ভিজে কম্বল ঘাড়ে নিয়ে চটি হতে রওনা হওয়া গেল; কিন্তু

সে পাহাড়ে রাস্তায় বেশি দূর যাওয়া হলো না। সূর্য পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়লো; পাহাড়ের অন্তরাল হতে অস্তমিত তপনের আলোতে যতক্ষণ বেশ পথ দেখা গেল, আমরা চলতে লাগলাম। সন্ধ্যার সঙ্গে সঙ্গে আকাশে খুব মেঘ করে এল। আমরাও একটা ক্ষুদ্র চটিতে রাত্রের মত আশ্রয় নিলাম। চটির নাম ''পাতালগঙ্গা''। বদরিনাথে যাবার সময় আমরা এ চটিতে ছিলাম না, এমন কি এটা তখন আমাদের নজরেই পড়ে নি; হয় ত তখন এ চটির জন্ম হয় নি ! চটির নীচে দিয়ে যে ক্ষুদ্রকায়া ঝরনাটি বয়ে যাচ্ছিল, তারই নাম অনুসারে এর নাম পাতালগঙ্গা হয়েছে। পাতালগঙ্গা সত্য সত্যই পাতালগঙ্গা; রাস্তা থেকে অনেক নীচে নেমে তবে নদীর কাছে আসা যায়। কিন্তু চটিওয়ালাদের জলের সন্ধানে নদীতীর পর্যন্ত যেতে হয় না; চটির গায়েই একটা ঝরনা আছে, তাতেই জল-কষ্ট নিবারণ হয়। এ দেশের চটি সকল দূরত্ব হিসাবে নির্মিত হয় না। যেখানে ঘর বাঁধিবার সুবিধা, ঝরনা খুব নিকটে এবং জায়গাটা চটিওয়ালার বাড়ির যথাসম্ভব কাছে, সেইখানেই একটা চটি খোলা হয়। আমরা লক্ষ্য করে দেখেছি, কোন জায়গায় সাত আট মাইল তফাতে একটা চটি, আবার কোথাও মাইলে মাইলে চটি। আর সে সকল চটিরই বা কি শোভা। তা নির্মান করবার জন্য চটিওয়ালাকে কিছুমাত্র বেগ পেতে হয় না, খরচপত্রও কিছু নেই বললেই হয়। গিরিরাজ হিমালয়ের কোলের মধ্যে হাজার হাজার গাছ রয়েছে, তার তলে প্রচুর লম্বা লম্বা ঘাস। গোটাকতক গাছের ডাল, আর বোঝা কতক ঘাস কেটে আনলে ঘণ্টা দুয়েকের মধ্যে একটা চটির ঘর তৈয়েরি হয়ে যায়। আর সেই পর্ণকুটিরে আশ্রয় নেবার জন্য কত ঝড়বৃষ্টিময়ী অন্ধকার রাত্রিতে আমরা ব্যাকুল হয়ে উঠেছি; তাও সব দিন অদৃষ্টে জুটে ওঠে নি। সেই পর্ণকুটিরে এসে অমরা যে রকম অকাতরে নিদ্রা যেতাম, তা মনে হলে এখনও কাতর হয়ে পড়ি। তখন কোনও ভাবনা-চিন্তা ছিল না; কেমন করে যে দিনপাত হবে সে কথাও মনে আসতো না; ভগবানের নাম নিয়ে সমস্ত দিন ঘুরে দারুণ পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে চটিতে এসে পড়তাম, খাওয়া দাওয়া হোক না হোক, কম্বল গায়ে জড়িয়ে শুয়ে পড়া যেত, আর কোথা থেকে হাটের ঘুম, মাঠের ঘুম, জঙ্গলের ঘুম এসে চোখের পাতা আচ্ছন্ন করে ফেলতো। ক্কচিৎ সেই সুখসুপ্তির মধ্যে বাল্যের নিশ্চিত জীবনের যৌবনের আবেশপূর্ণ সুখ-স্বপ্নের কথা মনে পড়তো। কখন মনে হতো, পাঠ্যাবস্থায় কলিকাতার সেই ক্ষুদ্র বাসাটিতে একখানি শতরঞ্চ বিছনো তক্তাপোষের উপর শুয়ে নবীন পণ্ডিত মহাশয়ের প্রকাণ্ডাকার সটিক রঘুবংশখানাতে, না হয় চামড়া বাঁধানো বিরাট দেহ দু' ভল্যুম ওয়েবস্টারের ডিক্সনারিতে মাথা রেখে নিদ্রা যাচ্ছি। ও হরি! জেগে দেখলাম হিমালয়ের মধ্যে একটা ভাঙা চটিতে ছেঁড়া কম্বল জড়িয়ে দিব্বি আরামে শুয়ে আছি, মাথার নীচে একটা ঘাসের আঁটি। বৈসাদৃশ্যটা বড় কম নয় ভেবে মনে মনে ভারি হাসি আসতো।

পাতালগঙ্গা চটিতে ঘর বেশি নেই, যাত্রীর সংখ্যাও নিতান্ত অল্প। যাত্রীর মধ্যে আপাতত আমরা তিনটি প্রাণী এবং একটা বিপুলকায় পাহাড়ী। আমরা যে ঘরে বাসা নিলাম, সেই ঘরের মধ্যে এক কোণে একটা লোক একটা কম্বলে মাথা হতে পা পর্যন্ত সর্বশরীর ঢেকে পড়ে রয়েছে দেখলাম। মনে হলো হয় ত কোনো পথশ্রান্ত সন্ন্যাসী এই নির্জন কুটিরে সাধন-ভজনের পরিবর্তে নিদ্রাদেবীর উপাসনা করছেন; আমরা ঘরের মধ্যে শোরগোল করলেই বিরক্ত হয়ে তিনি হুহুঙ্কারে উঠে বসবেন। বাস্তবিক আমাদের কথাবার্তায় লোকটা উঠে বসলো; কিন্তু সে সন্ন্যাসী নয়, ষোলো সতেরো বৎসর বয়সের একটি

বালক। ষোলো সতেরো বৎসর বয়স হলে অনেকে দেখতে যুবকের মত হয়, কিন্তু ছেলেটিকে অনেক ছোট বলে বোধ হলো; শরীর ভারি রোগা। বোধ হলো, এখনও সে রোগ ভোগ করছে। আমরা তার সঙ্গে আলাপ করতে লাগলাম, স্বামিজী তার কাছে বসে গেলেন; আমাদের সঙ্গী পাহাড়ী আহারের জোগাড় করতে গেল।

আলাপ করে দেখলাম, ছেলেটি অল্প-বিস্তর বাংলা কথাও জানে, তবে বেশি বাংলা বলে না; কিন্তু সে যেটুকু বাংলা বলে তা বাঙালির উচ্চারিত বাংলার মত, খোট্টাই ধরণের নহে। তার উচ্চারণ আমাদের মতই সহজ এবং সরল, কণ্ঠস্বর বিষাদাপ্লুত। আমার মনে ঘোর সন্দেহ হলো, এ হয় ত বাঙালি; হয় ত কোনো কারণে মা বাপের উপর রাগ করে, কি মা বাপ নেই পরের কাছে উপেক্ষা বা অনাদর পেয়ে অভিমান করে কোনো যাত্রীর দলের সঙ্গে এ অঞ্চলে এসে পড়েছে। তার পর অনাহারে, পথশ্রমে এবং রোগে ক্লান্ত ও জর্জরিত হয়ে এই নির্জন পর্বতের নির্জনতর প্রান্তে জীবনমধ্যাহ্নের পূর্বেই অতর্কিত সন্ধ্যায় জীবন বিসর্জনের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে। একবার আমার জীবনের সঙ্গে তার জীবনের তুলনা করে দেখলাম। সংসারে আমি সকল বন্ধনশূন্য, এও কি তাই ? চলতে চলতে পথিপ্রান্তে মৃত্যুকেই কি সে জীবনের শেষ ব্রত মনে করেছে ? আমার ন্যায় জীবনের সমস্ত বাসনা, সমস্ত আশা ও আকাঙ্ক্ষাগুলিকে হৃদয় থেকে একে একে খুলে নিয়ে নদীস্রোতে ভাসিয়ে দিতে ত শূন্যমনে তাকে সংসার ত্যাগ করতে হয় নি ? তার পথ ও আমার পথ কখনও এক হতে পারে না; তার এই নবীন জীবনের নূতন উৎসাহ, অভিনব আশা, জাগ্রত আকাঙ্ক্ষা এবং প্রাণব্যাপী উচ্চাভিলাষ, সমস্ত পরিত্যাগ করে সে জীর্ণ চীর গ্রহণপূর্বক এক অনির্দিষ্ট জীবনপথে অন্ধের ন্যায় চলতে আরম্ভ করেছে ? এমন কদাচ দেখতে পাওয়া যায়। আর যদি তার মা বাপ থাকে, তবে তাঁদের আজ কি কষ্ট ! অভিমানী বালক হয় ত আজ এই রোগশয্যায় গভীর যাতনার মধ্যে বুঝতে পাচ্ছে, এ পৃথিবীতে যাদের কেউ নাই, তাদের কি দুর্ভাগ্য ! জ্বর ও উদরাময়ে কষ্ট পাচ্ছে, এমন সময় যদি স্নেহময়ী মা এসে একটু গায়ে হাত বুলিয়ে দিতেন, কোমলহৃদয়া ছোট ভগিনীটি এসে যদি তার পাণ্ডুর শীর্ণ মুখখানির উপর দুটি করুণ চক্ষুর কোমল দৃষ্টি স্থাপন করে বলতো ''দাদা, এখন কেমন আছ'' তা হ'লে হয় ত তার রোগযন্ত্রণা অর্ধেক কমে যেত। কিন্তু তার দিকে ফিরে চেয়ে যে একবার আহা বলে, এমন লোকটি নাই। পৃথিবীর এমন আলো তার কাছে অন্ধকার এবং জীবজগতের হর্ষকাকলি বোধ করি তার কাছে একটা বিকট আর্তনাদের মত বোধ হচ্ছে। বালকের কথা ভেবে আমার প্রাণ বড় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। তন্ন তন্ন করে তার সম্বন্ধে কথা জিজ্ঞাসা করতে লাগলাম। সব কথার ঠিক উত্তর পেলাম না। তবে জানতে পারলাম, আজ দু দিন হতে এখানে সে পড়ে আছে; কত লোক যাচ্ছে আসছে, কিন্তু তাকে একটা কথাও জিজ্ঞাসা করে না; সঙ্গে দু তিনটি টাকা ও আনা কয়েক পয়সা আছে; যখন একটু ভাল থাকে, দু পয়সার বুট ভাজা না হয় বহুকালের প্রস্তুত ধূলিপূর্ণ দুর্গন্ধময় পচা প্যাড়া কিনে ক্ষুধাশান্তি করে। উদরাময় ও জ্বরের চমৎকার পথ্য ! অন্য সম্বলের মধ্যে একখানি ছেঁড়া কম্বল, একটা কমণ্ডুল, আর একটা ছোট ঝুলি; তার মধ্যে হয় ত দু চারখানি ছেঁড়া কাপড় থাকতে পারে। সেটা আর অনুসন্ধান করা দরকার মনে হলো না। ছেলেটি ইংরেজিও জানে; শুনলাম সে আম্বালা স্কুলে এনট্রান্স পর্যন্ত পড়েছিল, পরীক্ষাও দিয়েছিল, কিন্তু পাশ করতে পারে নি। আমি একবার সন্দেহাকুল চক্ষে তার দিকে চেয়ে দেখলাম। এনট্রান্স ফেল করে বাড়ি ছেড়ে পালিয়ে আসে নি ত

? আমি তাকে এনট্রান্সের পাঠ্যপুস্তক সম্বন্ধে প্রশ্ন করলাম; তাতে সে যে সকল বইএর নাম করলে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের তা পাঠ্য কি না তা আমি তখন ঠিক জানতাম না; তবে সে সকল বই আমাদের কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যশ্রেণীভুক্ত বটে। ঠে ভূক ওফ ঢোর্থসি কখনো পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্সের পাঠ্য ছিল বলে আমার মনে হয় না; তবে ১৮৮৮ সালে ঐ বই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এনট্রান্সের জন্য নির্বাচিত হয়েছিল; সুতরাং বালকটি বাঙালি বলে আমার সন্দেহ দৃঢ়তর হলো ! এমন সময় সে কি কাজের জন্য কুটিরের বাহিরে গেল। আমি স্বামিজীকে আমার সন্দেহের কথা জ্ঞাপন করলাম। তিনি কিঞ্চিৎ আবেগের সঙ্গে উত্তর করলেন, ''ঠিক ও বাঙালি, তাতে আর সন্দেহ নেই। আমাদের কাছে নিশ্চয়ই সমস্ত কথা গোপন করছে।'' ছেলেটি আবার বাহির থেকে ভিতরে এসে বসলো। স্বামিজী তার নাড়ি পরীক্ষা করে বললেন, তখনও খুব জ্বর আছে, উত্তাপ ১০৩ ডিগ্রির কম নয়। স্বামিজী বালকের মুখের উপর তীব্র দৃষ্টি রেখে তাকে আমার সন্দেহের কথা বললেন। কিন্তু সে যে বাঙালি, তা কিছুতেই স্বীকার করলে না। সে বললে আম্বালাতেই তার বাড়ি; মা বাপ কলেরায় মারা গেছে, একটি মাত্র ভগিনী আছে, সেও শ্বশুরগৃহে। মনের দুঃখে সে গৃহত্যাগ করেছে। তার বাড়িতে যখন কেউ নেই, তখন পাহাড় পর্বতই তার বাড়ি; তার কাছে ঘর বাড়ি, জঙ্গল সব সমান। সে বাঙালি নয় এ কথা প্রমাণের জন্য সে বিস্তর চেষ্টা করলে, এবং তার সেই চেষ্টা দেখে আমাদের আরও মনে হলো, সে নিশ্চয়ই বাঙালি, কোনো বিশেষ কারণে আত্মগোপন করেছে। আমি শেষে তাকে বললাম সে যদি বাড়ি থেকে রাগ করে এসে থাকে, তবে আমরা তাকে আবার বাড়ি পৌঁছিয়ে দিতে প্রস্তুত আছি; আর যদি সে একান্তই বাড়ি ফিরে যেতে না চায় তা হলে সে আমাদের সঙ্গে যেতে পারে। দেরাদুনে গিয়ে তার জন্যে যা হয় করা যাবে। সে আমার এ কথার কোনো স্পষ্ট উত্তর না দিয়ে বললে, ''আপনারা কেন আমাকে বাঙালি মনে করছেন। আম্বালায় যে সকল বাঙালি বাবু আছেন, তাঁদের কাছে আমি বাংলা শিখেছি !'' তার এ কথার উত্তর দেওয়া আবশ্যক মনে করলাম না। আমাদের পাহাড়ি সঙ্গী এমন সময়ে এসে খবর দিলে যে, আমাদের খাবার প্রস্তুত। বালকটিকে জিজ্ঞাসা করায় সে বললে, তার অত্যন্ত ক্ষুধা হয়েছে, কাজেই আমাদের জন্যে প্রস্তুত খাদ্যদ্রব্যের অংশ তাকে দেওয়া গেল। সে খাদ্যটা কি শুনবেন ? মোটা মোটা আধপোড়া রুটি, আর খোসাওয়ালা কলায়ের ডাল। ১০৩ ডিগ্রি জ্বর আর উদরাময়গ্রস্ত রোগীকে যদি এ দেশে এ রকম পথ্য দেওয়া হতো, তা হলে আমরা ছুল্লব্লে হোমিচিদে নোত অমৌন্তিং তো মুর্দের এই অভিযোগে শেষে দায়রা সোপর্দ হতাম; কিন্তু এ পর্বতের মধ্যে এ ছাড়া অন্য পথ্য কোথায় মিলবে ? রাত্রে বালকটি দু তিনবার উঠে বাইরে গেল, আমাদের ভয় হলো বুঝি সে আজই পেটের ব্যারামে মারা যায় ! যে পথ্যের ব্যবস্থা, তাতে ভয় হবার্ই কথা; কিন্তু ছেলেটি বললে, তার অবস্থা অনেক ভাল, এমন পরিপক্ক ডাল রুটি বহুদিন তার অদৃষ্টে জোটে নি। নিজে কষ্টে–সৃষ্টে যা পারতো তাই বানিয়ে নিতো। আমরা বুঝলাম, এ 'বিষস্য বিষমৌষধম' অর্থাৎ ইংরজি কথায় হোমিওপ্যাথি মতে চিকিৎসা হয়েছে। ভরসা করি আমার ডাক্তার বন্ধুরা এ ঔষধের সমর্থন করবেন। নিদ্রায় অনিদ্রায় কোনো রকমে রাত্রি কেটে গেল।

৩ জুন, বুধবার। – খুব ভোরে পাতালগঙ্গা চটি ত্যাগ করলাম। ছেলেটি আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলতে লাগলো। তাকে নিয়ে আমাদের কিছু অসুবিধা হলো; কিন্তু সে দিকে দৃকপাত না করে তার সঙ্গে অতি আস্তে আস্তে চলতে লাগলাম। তার শরীর মোটেই চলবার মত নয়; এদিকে তার জন্য পাতালগঙ্গায় দু-তিন দিন বসে থাকাও অসম্ভব, সুতরাং ধীরে ধীরে অগ্রসর হওয়াই সঙ্গত বলে বোধ হলো। চটি ত্যাগ করবার আগে স্থির করা গেল, যে, আজ যে রকমেই হোক দুপুরের সময় পিপুলকুঠিতে পৌঁছে আহারাদি করতে হবে।

দুপুরের সময় পিপুলকুঠিতে পৌঁছান গেল। ছেলেটি সঙ্গে না থাকলে আমরা বেলা দশটার মধ্যেই এখানে এসে উপস্থিত হতে পারতাম; কিন্তু তা আর ঘটে ওঠেনি। আধ মাইল চলি, আর একটা গাছের ছায়ায় , কি ঝরনার কাছে এসে বসি; ঝরনা দেখলেই ছেলেটি বসতে চায়, অঞ্জলি পুরে জলপান করে; একটু বিশ্রাম করবার পর উঠে ধীরে ধীরে চলতে আরম্ভ করে।

পিপুলকুঠিতে আমাদের সেই পূর্বেকার চটিতে বাসা করা গেল। কিন্তু আজ পিপুলকুঠির ভাব সম্পূর্ণ পরিবর্তিত দেখলাম। গতরাত্রে এখানকার এক বেনিয়ার দোকানে চুরি হয়ে গিয়েছে। নগদ টাকা এবং সোনা-রূপার গহনা প্রভৃতিতে অনেক টাকা গিয়েছে। চোর মশায় কি উপায়ে গৃহপ্রবেশ করে এই সাধু অনুষ্ঠানে কৃতকার্য হয়েছেন, তা কেউ ঠিক করতে পারে নি, কিন্তু তিনি যে বমাল সমেত দরজা খুলে বেড়িয়ে গেছেন, তা স্পষ্ট বুঝতে পারা গেল। লালসাঙার থানায় খবর পাঠানো হয়েছে; দু এক ঘণ্টার মধ্যেই পুলিশের লোক এসে উপস্থিত হবে; সুতরাং বাজারের লোক কিছু ভীত ও ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। আমরা পূর্ববারে যে দোকানঘরে আড্ডা নিয়েছিলাম, তার সম্মুখেই এই বেনিয়ার দোকান। কারো প্রতি সন্দেহ হয় কি না জিজ্ঞাসা করায় সে বললে কাকে সে সন্দেহ করবে ? তার ত কোনো 'দুশমন' নেই; কারো সে কখনও অনিষ্ট করে নাই; কেন যে তার সর্বনাশ হলো, বিধাতাই জানেন, এই বলে বেচারি কাঁদতে লাগলো। দোকানে কোনো চাকর আছে কিনা জিজ্ঞাসা করায় জানতে পারলাম, দুই জন চাকর দোকানের মধ্যেই থাকে; বেনিয়া নিজে থাকে না, সপরিবারে দোকানের উপরতলায় থাকে। বেনিয়ার আর কোনো ভাই নেই, ছেলেপুলেগুলি সকলেই ছোট।

বেলা প্রায় একটার সময় দুই তিন জন লালপাগড়ি কনস্টেবল সঙ্গে নিয়ে পুলিশের জমাদার সাহেব সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। আমরা আমাদের চটির মধ্যে বসে জানালা দিয়ে জমাদার সাহেবের কাণ্ড-কারখানা দেখতে লাগলাম। মনে করেছিলাম, জমাদার এসেই চুরির তদারক আরম্ভ করবেন; কিন্তু তার সে রকম ভাব কিছুই দেখা গেল না। ঘোড়া হতে নেমেই জিজ্ঞাসা করা হলো, কোথায় তাঁর বাসা দেওয়া হয়েছে এবং তা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কি না। কথার ভাবে বোধ হলো, মেজাজটা বড় গরম। জমাদার সাহেব একে সরকারি লোক, তার উপর সরকারি কাজে এসেছেন সুতরাং তাঁর ক্যারদানিতে ক্ষুদ্র পার্বত্য বাজার সশঙ্কিত হয়ে উঠলো; কখন কার মাথা যায় তার ঠিক নেই।

যে বাসাটা জমাদার সাহেবের জন্য ঠিক করা হয়েছিল, দুর্ভাগ্যক্রমে তা তাঁর পছন্দ হলো না। তিনি গম্ভীর মুখে এবং ভারি রাগ করে আমাদের চটির পাশে আর একটা বাড়ির বারান্দার একটা চারপায়ার উপর বসে পড়লেন। বেনিয়া তার সকল কষ্ট ভুলে হাস্যমুখে প্রচুর উপহারের সঙ্গে জমাদার সাহেবের অভ্যর্থনা করতে পারে নি, এই তার অপরাধ, এবং এই অপরাধের জন্য তিনি কনস্টেবল বেষ্টিত হয়ে তর্জন গর্জন পূর্বক বলতে লাগলেন, যে চুরির কথা সমস্ত মিথ্যা, এই শঠ বেনিয়া অনর্থক সরকারকে হয়রান করবার জন্য চুরির এজাহার দিয়েছে, বাজারের লোকের এতে যোগ আছে। শুনে বাজারের লোক আতঙ্কে আড়ষ্ট হয়ে পড়লো। জমাদারকে শান্ত করবার জন্য অবিলম্বে তাঁর সম্মুখে স্তূপাকার খাদ্যদ্রব্যের অর্ঘ্য এনে হাজির করা হলো। নানা রকমের জিনিস। সে সকল এতই বেশি যে, জমাদার সাহেব সগোষ্ঠী মিলে তিন দিনেও তা উদরস্থ করতে পারবেন না। এই উপহারস্তূপ দেখে হাকিম সাহেবের মেজাজটা একটু নরম হলো; তিনি আয়াস স্বীকার করে তখন ধূমপানে মনোনিবেশ করলেন। ধূমপান শেষ হলে বোধ করি চুরির কথাটা তাঁর মনে পড়লো। তিনি নিকটস্থ লোকগুলির দিকে চেয়ে জিজ্ঞাসা করলেন ''কোন দোকানে চুরি হয়েছে ?'' – দশ বারোজন লোক এক সঙ্গে তাঁর কথার জবাব দিল। বেনিয়া কাঁদতে কাঁদতে এসে তার সর্বনাশ হয়েছে এই কথা 'আরজ' করতে যাচ্ছিল, এমন সময় জমাদার সাহেব হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন ''ব্যস, চুপ।'' – হতভাগ্য বেনিয়া সঙ্গে সঙ্গে সাত আট জন দোকানি এই হুঙ্কার শব্দে বিচলিত হয়ে দশ হাত তফাতে সরে দাঁড়ালো। হায় ! এই দূর পার্বত্যপ্রদেশে এখানেও সেই বঙ্গীয় পুলিশের অভিন্ন মূর্তি; তেমনই কর্কশ এবং কঠোর। ইহারাই আবার দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন কর্তা। বুঝি পুলিশ সর্বত্রই সমান।

হঠাৎ একটা কঠিন হুকুম জারি হলো। জমাদার সাহেব হুকুম দিলেন যে, আজ বাজারের দোকানদার কি 'মুসাফির' লোক যত আছে, চুরি তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত কেহই স্থানান্তরে যেতে পারবে না। আমাদের চটিওয়ালা মনে করেছিল আমরা বুঝি জমাদার সাহেবের এই কঠিন আদেশ শুনতে পাইনি , তাই সে আমাদের কাছে এসে সংবাদ দিলে আজ আমাদের পিপুলকুঠিতে থাকতে হবে; চুরি তদন্ত শেষ না হলে আমরা স্থানান্তরে যেতে পারছিনে। স্বামিজী বললেন, ''সুসংবাদ বটে ! একেই বলে উদোর ঘাড়ে বুদোর বোঝা।'' যে ভাবে জমাদার সাহেব তদন্ত আরম্ভ করেছেন, তাতে তদন্ত শেষ না হওয়া পর্যন্ত যদি এখানে অপেক্ষা করতে হয়, ত ইংরেজি মাসের এ কটা দিন এখানেই কাটিয়ে যেতে হবে। যা হোক, যা হয় করা যাবে ভেবে আমরা আহারাদিতে মনঃসংযোগ করলাম। এদিকে জমাদার সাহেব ষোড়শ উপাচারে আহার সম্পন্ন করে নিদ্রাদেবীর উপাসনায় প্রবৃত্ত হলেন। বেলা তিনটের পর আমরা চটি ত্যাগ করা মনস্থ করলাম; কিন্তু জমাদার সাহেবের কঠোর হুকুম লঙ্ঘন করলে পাছে বিপদে পড়তে হয়, এই ভেবে একটা উপায় স্থির করা আবশ্যক বলে বোধ হলো।

জমাদার সাহেব তখন নিশ্চিন্তমনে গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত; দোকানদারেরা কেহ কেহ দ্বারপ্রান্তে বসে হুজুরের নিদ্রাভঙ্গের প্রতীক্ষা করছে। আমরা কি করি, তাই ভাবতে লাগলাম। স্বামিজী বললেন, জমাদার সাহেবকে বলে চলে যাওয়াই ভাল। কিন্তু সে ভারটা কে গ্রহণ করবে ? একটু গুছিয়ে কথা বলা চাই, এবং আবশ্যক হলে ভয়

দেখানও কর্তব্য হবে। এই রকম অভিনয়ে আমা অপেক্ষা স্বামিজী পটু নহেন, সুতরাং আমি এই কার্যভার গ্রহণে সম্মত হলাম।

জমাদার সাহেবের আড্ডায় হাজির হয়ে দেখলাম, সাহেব ঘোরতর নাসিকা গর্জন করে নিদ্রা যাচ্ছেন, কনস্টেবলরা নিকটেই বসে আছে। আমি একজন কনস্টেবলকে বললাম যে, প্রভুকে একবার জাগানো দরকার – বিশেষ কাজ আছে। কনস্টেবলের কানে বোধ করি এ রকম অদ্ভুত কথা আর কখনও প্রবেশ করে নি; ঘুমন্ত জমাদারকে জাগানো, আর ঘুমন্ত বাঘের গায়ে খোঁচা মারা, এ তারা একই রকম দুঃসাহসের কাজ বলে মনে করে; সুতরাং অবাক হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে র্ইল। আমি নাছোড়বান্দা; পুনর্বার তাকে এ কথা বলা হলো। এবার কনস্টেবল সাহেব ভ্রুকুটিভঙ্গে আমার দিকে চাইলেন, পাছে হুজুরের নিদ্রাভঙ্গ হয়, এই ভয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠতে পারলেন না। আমি দেখলাম এ এক বিষম সমস্যা। শেষে খুব চেঁচিয়ে কথা কইতে লাগলাম, অভিপ্রায় আমার গলার আওয়াজে জমাদার সাহেবের নিদ্রাভঙ্গ হোক। ফলেও তাই হলো। আমার কণ্ঠস্বরে প্রভুর নিদ্রাভঙ্গ হলো; তিনি চক্ষু রক্তবর্ণ করে বললেন ''কোন্ চিল্লাতা হ্যায় ?'' সঙ্গে সঙ্গে উঠে বসলেন। সম্মুখেই আমাকে দেখে ভারি গরম হয়ে কর্কশস্বরে জিজ্ঞাসা করলেন ''ক্যা মাঙ্‌তা'' ? অনেকদিন এদেশে থেকে পুলিশের লোকের চরিত্র সম্বন্ধে আমার অনেকখানি অভিজ্ঞতা জন্মেছে। এরা প্রবলের কাছে মেষশাবক, কিন্তু দুর্বলের বাঘ ! সুতরাং জমাদার সাহেব ''ক্যা মাঙ্গতা'' বলবামাত্র আমিও তেমনি সুরে আমার অভিপ্রায় জ্ঞাপন করলাম। আমরা যে তখনই চলে যেতে চাই, কোথা হতে এসেছি, কোথা যাব, আমরা কজন আছি, সমস্ত তাঁকে খুলে বলা হলো। তিনি ''আবি নেহি হোগা'' বলে ফরসির নলে মুখ লাগালেন ! আমি দেখলাম, সহজে কার্যসিদ্ধির সম্ভাবনা নেই; তখন আর একটু চড়া মেজাজে ইংরেজি ও হিন্দুস্থানিতে মিশিয়ে কথা বলতে আরম্ভ করলাম। তাকে সোজাসুজি জানিয়ে দিলাম যে, সে যদি আর একদণ্ডও আমাদের আটকে রাখে, তবে তার মস্তক ভক্ষণের সুব্যবস্থা করবো। রাস্তায় কোথাও কোনো পুলিশের লোক কোনোরকম কুব্যাবহার করলে তখনই ইনস্পেক্টারকে জানাবার ভার আমার উপর আছে। ইনস্পেক্টারের সঙ্গে যে আমার বন্ধুত্ব আছে, সে কথাও তাকে জানিয়ে দিলাম এবং আজ কয়দিন হলো কর্ণপ্রয়াগে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হয়েছে, তাও বললাম। জমাদার যে ভাবে চুরি তদন্ত করছেন, আমি তা দেখে যাচ্ছি; এ কথা গোপন থাকবে না।

আমার কথা শুনে লোকটা একদম নরম হয়ে গেল। কাপুরুষদের বিশেষত্ব এই যে, তারা প্রথমে মুখে যতই তর্জন করুক না কেন, ভয়ের কোন কারণ উপস্থিত হলেই একেবারে পৃষ্ঠভঙ্গ দেয়। এ ক্ষেত্রেও তা হলো। জমাদার সাহেব ফরসি ছেড়ে আমার সঙ্গে ভদ্রালাপ আরম্ভ করলেন এবং আমাদের প্রতি আদেশ দিলেন যে, আমরা যখন ইনস্পেক্টারের জানিত লোক এবং ইনস্পেক্টারের সঙ্গে বন্ধুতাও আছে, তখন আমরা 'চোট্টা কি ডাকু' হতেই পারি নে; অমরা যখন ইচ্ছা চটি ত্যাগ করতে পারি; অনেকেই সন্ন্যাসীর সাজ নিয়ে চুরি ডাকাতি করে বেড়ায় বলে, সকলের প্রতি তাঁকে পুলিশোচিত সন্দিগ্ধভাব প্রকাশ করতে হয় এবং ইহা তাহাদের দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতার ফল। আমরা যদি খানিক আগে আত্মপ্রকাশ করতাম, তা হলে তাঁকে বাধ্য হয়ে এ রকম রূঢ়তা প্রকাশ করতে হতো না। তিনি আরও প্রকাশ করলেন যে, চুরির তদন্ত

তিনি অনেক আগেই আরম্ভ করতেন, কিন্তু আজ তাঁর ''তবিয়ত আচ্ছা নেই'' তাই কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তদন্ত আরম্ভ করা মনস্থ করেছেন; এতে সরকারি কাজের কোনো ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। আর আমি এ সকল কথা যেন ইনস্পেক্টারের গোচর না করি। হাস্যমুখে তাকে অভয়দান করে চটি ত্যাগ করবার উদ্যোগ করতে লগলাম।

সেই এক বাজার পাহাড়ি লোকের মধ্যে দারোগা সাহেবকে খুব খানিকটে অপদস্থ করে আমরা চটি ত্যাগ করলাম। বলা বাহুল্য তখন মনে মনে প্রচুর আত্মপ্রসাদ লাভ করা গিয়েছিল; এবং দারোগার দর্প চূর্ণ করবার দরুন তার পরেও কিছু ক্ষোভের কারণ জন্মায় নি, তবে মনটা বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। থানার দারোগা মফঃস্বলের সর্বত্রই যমের এক একটি আধুনিক সংস্করণ; কনস্টেবলগুলি যমদূত; কিন্তু সেকালের যম ও যমদূতের সঙ্গে একালের দারোগা এবং কনস্টেবলদের অনেক বিষয়ে পার্থক্য দেখা যায়। দারোগা সাহেবদের হাতে যমদূতের ন্যায় কোনো রকম দণ্ড না থাকলেও তাঁদের দোর্দণ্ডপ্রতাপে মফঃস্বলবাসীদিগের সন্ত্রস্ত থাকতে হয়, এবং যদিও যমদূতদিগের শেল, শূল, মুষল, মুদ্গর ও পাশ একালে লৌহনির্মিত হাতকড়া ও রুল নামক অনতিদীর্ঘ কাষ্ঠদণ্ডে পরিণত হয়েছে, তথাপি সাহসপূর্বক বলা যায় যে, যম ও যমদূতের হাতে অন্তত সাধুদিগের কোন আশঙ্কা ছিল না, কিন্তু পুলিশের হাতে সাধু অসাধু কারও রক্ষা নেই। অতএব এ রকম ক্ষমতাশালী দারোগা সাহেব তাঁর হাতের মধ্যে একজন নগ্নপদ রুক্ষকেশ, কম্বলধারী মুসাফির সন্ন্যাসীর কাছে এরূপভাবে অপদস্থ হয়ে তাঁর অমোঘ হুকুম ফিরিয়ে নিতে বাধ্য হয়ে সাধারণের সম্মুখে যে গৌরব হতে বঞ্চিত হলেন, তাঁর সেই হৃতগৌরব পুনরুদ্ধার করতে তাঁকে অনেক হয়রান হতে হবে এবং আমাদের দোষে হয় ত অনেক নির্দোষী বেচারা তাঁর হাতে অনেক যন্ত্রণা সহ্য করবে। অনেক অসাধু লোকের এ রকম স্বভাব যে, যদি তারা নিজের কুকর্মের জন্যে কারও কাছে নিগ্রহ ভোগ করে, তা হলে আর পাঁচটা নিরীহ লোককে নিগৃহীত করতে না পারলে তারা কিছুতেই শান্তি পায় না; যতক্ষণ সে রকম কোনো সুবিধা না পায় ততক্ষণ মনে করে তার অপমানটা সুদ সমেত অনাদায় থেকে গেল।

এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে এবং তৎসম্বন্ধে বৈদান্তিক ভায়া ও স্বামিজীর সঙ্গে রহস্যালাপ করতে করতে আমরা অপরাহ্নে পর্বতগাত্রস্থ সঙ্কীর্ণ পথ ধরে চলতে লাগলাম। তখনও সূর্য অস্ত যায় নি। সূর্য ধূসর পাহাড়ের অন্তরালে খানিকটে ঢলে পড়েছিল, এবং তার লাল আভা পার্বত্য গাছপালার উপর দিয়ে আকাশের অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়েছিল। অল্পক্ষণ পরে পাহাড়ের পশ্চিম দিগন্তে একটু মেঘ দেখতে পেলাম; সূর্যাস্তের পূর্বে নীল আকাশের লোহিতাভ প্রদেশের অতি ঊর্ধ্বে দুই একটা কাল পাখি যেমন ছোট দেখায় তেমনি ক্ষুদ্র একখণ্ড মেঘ; – ক্রমে মেঘখানি বড় হতে লাগলো; শেষে মোড় ঘুরে দেখি সম্মুখে পাহাড়ের উপর মেঘের দল সার বেঁধে দাঁড়িয়ে গেছে; বোধ হলো যেন তারা পরামর্শবদ্ধ হয়ে কোন আগন্তুক শত্রুর প্রতীক্ষা করছে। আমরা বৃষ্টির জন্য প্রস্তুত ছিলাম না। সন্ধ্যার প্রাক্কালে দুর্গম দীর্ঘ পথের উপর সহসা এরকম ঘনঘটা দেখে মনটা বড় অপ্রসন্ন হয়ে উঠলো; ভাবলাম আর যাই হোক, দারোগার শাপটা হাতে হাতে ফলে গেল। দেখছি কলিযুগেরও কিছু মাহাত্ম্য আছে; সত্যযুগে শুনেছি ব্রাহ্মণ যোগী–রিষির শাপে অগ্নিবর্ষণ হতো, ব্রহ্মতেজে অভিশপ্ত ব্যক্তি দগ্ধ হয়ে যেত, আর কলির এই শেষে মুসলমান দারোগার শাপে বুঝি অজস্র বৃষ্টি ধারায়

আমরা ভেসে যাই। এখন কোথায় আশ্রয় নেওয়া যায়, এই চিন্তায় মন ব্যাকুল হয়ে উঠলো।

কিন্তু এখানে আশ্রয় জুটানোও বড় সহজ কথা নয়। এ শহর অঞ্চলের পথ নয় যে, ঝড়বৃষ্টির উপক্রম দেখলে কোনো বাড়ির দুয়ারে আশ্রয় নেব। একবার পথে বেরুলে সহজে গ্রাম চোখে পড়ে না; যদিও দুই বা চারি ক্রোশ অন্তর এক আধখানা গ্রাম দেখা যায়, সে গ্রাম আর কিছুই নয়, পাঁচ সাত কি বড় জোর দশখানি কুটির সমষ্টি মাত্র। গোটাকতক মহিষ, ছাগল আর জনকতক স্ত্রী পুরুষ এবং তাহাদের ছেলেমেয়ে এই গ্রামের অধিবাসী। যে কয়খানা কুটির, তা হয় ত তাদের নিজের ব্যবহারের জন্যই যথেষ্ট নয়। এই পথে চলতে চলতে অনেক সময় বিপদে পড়ে এ রকম গ্রামে গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় নিতে হয়েছে, কিন্তু ঘরে আশ্রয় নিয়ে সমস্ত রাত্রি বাহিরেই কাটিয়েছি। আমাদের দেশে একটা কথা আছে; একবার একটা লোককে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, সে এতটা পথ কি রকম করে এল, তাতে সে লোকটা উত্তর করেছিল যে, ''নৌকাতেই এসেছি, তবে সমস্ত রাস্তাটা গুন-টেনে।'' আমাদের এই পার্বত্য আশ্রয়ও ঠিক সেই রকমের; গৃহস্থের ঘরে আশ্রয় পাওয়া গিয়েছিল বটে কিন্তু সমস্ত রাত্রি অনাবৃত আকাশতলেই কাটাতে হয়েছে। কেউ মনে করবেন না যে, আমি গ্রামবাসীদের আতিথেয়তার দোষ দিচ্ছি; তারা বাস্তবিক অত্যন্ত আতিথেয়। পার্বত্য গৃহস্থ দুর্গম হিমালয়ের নিভৃত বুকের মধ্যে মাঝে মাঝে দেখতে পাওয়া যায়, তাই অনেক যাত্রীর প্রাণরক্ষা হয়। বাস্তবিক যদিও তারা গরীব এবং কায়ক্লেশে পর্বত বিদীর্ণ করে যে মুষ্টিমেয় গম বা ভুট্টা সংগ্রহ করে, তাই তিনখানা রুটির একখানা ক্ষুধিত অতিথিকে দিতে কিছুমাত্র কাতর হয় না; এবং অতিথির প্রতি তাদের যে যত্ন, আগ্রহ, তা অপার্থিব। কিন্তু পরের জন্য নূতন করে ঘর বেঁধে রাখতে পারে না। পাহাড়ের গায়ে বৈঠকখানা তৈয়েরি করবার মত জমিও মেলে না। অনেক খুঁজে পাহাড়ের যেখানে সামান্য একটু চাষের উপযুক্ত জায়গা পায়, তাই এক কোণে দুই পাঁচ ঘর গৃহস্থ ছোট ছোট কুটির তৈয়েরি করে, বাকি জমিটা চাষ করে। কাজেই অতিথির মাথা রাখবার মত স্থান কখন মেলে, কখন মেলে না।

যা হোক আমাদের সম্মুখে ত আপাততঃ বৃষ্টি উপস্থিত, ঝড় হওয়াও আশ্চর্য নয়। তিনটি প্রাণী ঘোর তুফান মাথায় করে চলেছি, এক একবার আকাশের দিকে চাচ্ছি, আর অগ্রসর হচ্ছি। কিছু লক্ষ্য নেই তবু ব্যস্তসমস্ত হয়ে ছুটে চলেছি, - কথাটা আশ্চর্য বটে, কিন্তু আমরা কেউ নির্বাক হয়ে চলছি নে। দারোগার সঙ্গে আমার যে কথান্তর হয়েছিল, তা লক্ষ্য করে বৈদান্তিক ভায়া উল্লেখ করলেন যে, লোকের সঙ্গে ঝগড়া বিবাদ করা সাধু সন্ন্যাসী মানুষের উচিত নয়, তাতে প্রত্যবায় আছে। তাঁর মত নৈয়ায়িক প্রবর যে, এই শব্দবিন্যাসের মধ্য হইতে 'অকারণ' কথাটা অনায়াসে বাদ দিলেন, সে জন্যে তাঁর সঙ্গে তর্ক করবার প্রলোভনটা সংবরণ করা দায় হলো। আমি সবে গৌরচন্দ্রিকা ফেঁদে বিষম একটা তর্কজাল বিস্তার করবো এবং সেই অবসরে অনেকদূর নির্ভাবনায় যাওয়া যাবে ঠিক করেছি, এমন সময় স্বামিজী আমাদের ডেকে বললেন সম্মুখে একটা ভয়ানক ঝড় উঠেছে ; সময় থাকতে আমাদের সাবধান হওয়া দরকার, আর তর্ক করবার সময় নাই। স্বামিজী আমাদের আগে আগে যাচ্ছিলেন। এক মিনিটের মধ্যে ঝড় আমাদের উপর এসে পড়লো। স্বামিজী তৎক্ষণাৎ পাহাড়ে ঠেস

দিয়ে বসে পড়লেন। প্রবল বাতাসে কতকগুলো পাতা উড়ে স্বামিজীকে ছেয়ে ফেললে, তিনি ব্যতিব্যস্ত হয়ে পড়লেন, কিন্তু দেখলাম বৈদান্তিক ভায়া তর্ক করতে বিশেষ মজবুদ হলেও তাঁর উপস্থিত বুদ্ধিটা আমার চেয়ে অনেক বেশি। তিনি অন্য উপায় না দেখে এবং বেশি কিছু বিবেচনা না করে আমাকে কোলের মধ্যে চেপে ধরে রাস্তার পাশে উবু হয়ে শুয়ে পড়লেন। আমি তাঁর শরীরের নীচে পড়ে রইলাম; তিনি তাঁর বিপুল শরীর দিয়ে আমাকে ঢেকে রাখলেন। বাতাসটা আমাদের উপর দিয়ে এত জোরে বয়ে গেল, এবং আমাদের এত নাড়া দিল যে, বোধ হলো যেন সেই দণ্ডেই আমাদের দু'জনকে উড়িয়ে নিয়ে রাস্তার পাশে গভীর খাদের মধ্যে ফেলে দেবে; কিন্তু দেখলাম বৈদান্তিকের শরীরে অসাধারণ বল। সেই প্রবল ঝঞ্ঝাবাতটা তিনি অকাতরে সহ্য করলেন। আমাদের নাক মুখের ভিতরে যে কত ছাইভস্ম প্রবেশ করলো তার শেষ নাই। বাতাস চলে গেলে আমরা চেয়ে দেখলাম, গাছের পাতা ধুলো কাঁকর আর রাস্তার ছোট ছোট পাথরের মধ্যে আমরা সমাহিত হয়েছি; দু'জনেই গা-ঝেড়ে উঠলাম; উঠে দেখি বৈদান্তিক ভায়ার পিঠ জায়গায় জায়গায় কেটে গেছে, এবং সেখান হতে অল্প অল্প রক্ত পড়ছে; পাঁচ সাত জায়গায় ছড়ে গিয়েছে। বড় বড় কাঁকর খুব জোরে এসে পিঠে লাগাতেই এ রকম হয়েছে। আমার কোনো ক্ষতি হয় নি, শুধু একবার দম আটকে গিয়েছিল। ঝড় বৃষ্টির সময় পক্ষীমাতা যেমন তার ক্ষুদ্র অসহায় শিশুটিকে বুকের মধ্যে নিয়ে তার হৃদয়ের সমস্ত স্নেহ ও যত্ন এবং সুকোমল প্রসারিত পক্ষপুট দিয়ে ব্যাকুল আবেগের সঙ্গে ঢেকে রাখে, আজ এই ঘোর ঝঞ্ঝাবাতের মধ্যে বৈদান্তিক তেমনি নিজের শারীরিক কষ্ট উপেক্ষা করে শরীর দিয়ে আমাকে রক্ষা করেছেন; নিজের যে কষ্ট হয়েছে, সে দিকে একটুও লক্ষ্য নেই। আমার শরীরে যে আঘাত লাগে নি এতেই তাঁর মহা আনন্দ। বৈদান্তিকের সহৃদয়তা, মহত্ত্ব এবং আমার প্রতি করুণ স্নেহ দেখে স্বতঃই আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতা-রসে ভিজে গেল। বিপদের সময় ভিন্ন যে মানুষ চেনা যায় না, বিপদই মানুষের কষ্টিপাথর, তা তখন বুঝতে পারলাম। এই সংসারবিরাগী, শুষ্কহৃদয়, তর্কপ্রিয়, পরুষভাষী বৈদান্তিকের সঙ্গে অনেক দিন হতেই একত্র ঘুরে বেড়াচ্ছি। শরীর শক্ত, মানুষ প্রকাণ্ড উঁচু, চুলগুলো আবড়া-খাবড়া, ঠিক খেজুর গাছের মত; মনে হতো এর মধ্যে শুধু তর্কেরই ইন্ধন সঞ্চিত আছে; এতে আর কিছু পদার্থ নেই; কিন্তু আজ বুঝতে পারলাম, এই কঠিন দেহের মধ্যে একখানি অতি সুকোমল স্নেহার্দ্র হৃদয় আছে, এবং তার ঐ অতি বিশাল বক্ষ আর্তের স্নেহনীড়। কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাসে আমার চক্ষে জল এলো। আমরা উঠে দাঁড়ালে স্বামিজী তাড়াতাড়ি আমাদের কাছে ছুটে এলেন; আমরা কেমন করে রক্ষা পেয়েছি শুনে তিনি বৈদান্তিকের গায়ে তাঁর স্নেহাশীর্বাদপূর্ণ হাতখানি বুলিয়ে দিলেন। স্বামিজীর ভাবে বোধ হলো, আমাকে এমন করে রক্ষা করেছেন বলে বৈদান্তিককে তিনি তাঁর প্রাণের মধ্য হতে নীরব আশীর্বাদ প্রেরণ করেছিলেন। দুই সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীর এ কি ব্যবহার ? বৈদান্তিক বিপদের সময় আমার কাছে ছিলেন, ধর্মশাস্ত্র অনুসারে তিনি না হয় নিজের প্রাণ দিয়ে পরের প্রাণ রক্ষা করেছেন; কিন্তু স্বামিজী সংসারের উপর বীতস্পৃহ হয়ে লোটা কম্বল মাত্র সার করে বেরিয়ে পড়েছেন; তাঁর এ আসক্তি, মায়াবন্ধন, এ বিড়ম্বনা কেন ? কোথায় ভগবানের নামে বিভোর হয়ে তিনি সময় কাটাবেন, না শুধু আমার সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের জন্য তিনি ব্যস্ত। এই পর্বতের মধ্যে শত কার্যে আমার প্রতি তাঁর স্নেহের পরিচয় পেয়েছি। আজ দেখলাম আমার জন্য তাঁর আগ্রহ, উৎকণ্ঠা - স্নেহবন্ধনে বদ্ধ গৃহীর আগ্রহ, উৎকণ্ঠা অপেক্ষা অল্প আসক্তি বর্জিত নয়। তাই একবার আমার ইচ্ছা হলো তাঁকে চেঁচিয়ে বলি, সাধু সন্ন্যাসী, এই

কি তোমার সংসার ত্যাগ, ইহাই নাম কি মায়ার বন্ধন ছেদন ? সমস্ত ছেড়ে হিমালয়ের মধ্যে এসেও তোমার আসক্তি বিদূরিত হলো না। শেষে কি বলবে যে, ''এই লেড়কা হামকো বিগাড় দিয়া'' – কিন্তু এত কথা মুখ দিয়ে বাহির হলো না; শুধু বললাম ''আমার প্রতি আপনার মায়া ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে, এটা কিন্তু ভাল নয়।'' তিনি এবার জবাবে আমাকে যা বলেছিলেন, তেমন দেববাণী আমি আর কখনও শুনি নি; তিনি বললেন ''আমি সংসার ছেড়ে এসেছি, সংসারে আমার কেউ নাই, তোমার সঙ্গেও আমার কোনো সম্বন্ধ নেই। তোমার উপর আমার হৃদয়ের নিঃস্বার্থ স্নেহবর্ষণ করে আমি প্রেমময়ের প্রেম–মন্দিরে প্রবেশের পথ উন্মুক্ত করছি। তুমি আমার কে ?''

আমি নিরুত্তর হলাম। অল্প অল্প বৃষ্টি পড়তে আরম্ভ হলো, তাতে পথ আরও পিচ্ছিল; ও দুরারোহ হয়ে উঠলো। আমরা তিনটি প্রাণী নীরবেই চলছি, কিন্তু মন বোধ করি চিন্তাশূন্য নয় ! চারিদিকে ঘোর মেঘ, দূরে পাহাড়ের কোলে বড় বড় গাছগুলোতে বাতাস বেধে একটা অস্পষ্ট বিকট শব্দ উঠছে, যেন বহুদূরে উন্মত্ত দৈত্যদল দুর্ভেদ্য পর্বতদুর্গ বিদীর্ণ করবার জন্যে প্রবল আস্ফালন করছে। আমরা কখন অতিধীরে, কখন দ্রুতপদে চলে অনেক বিলম্বে নারায়ণচটি নামক একটা খুব ছোট চটিতে উপস্থিত হলাম। শুনলাম এ জায়গাটা পিপুলকুঠি হতে সবে দু মাইল। শুনে আমার বিশ্বাস হলো না, আমাদের দেশে দু মাইল তফাত বললে এ–পাড়া ও–পাড়া বুঝায়; বৌবাজার হতে শ্যামবাজার দু মাইলের বেশি নয়; কিন্তু এ কি রকম গজের দু মাইল তা বুঝতে পারলাম না; এ যদি দু মাইল রাস্তা হয়, তা হলে স্বীকার করতে হবে, এর সঙ্গে আরো পাঁচ সাত মাইল 'ফাউ' যোগ করা ছিল।

আমি ইতঃপূর্বে আমাদের সঙ্গেকার যে রোগা ছেলেটির কথা বলেছি , আমরা তাকে কাতর দেখে আহারান্তেই রওনা হয়েছিলাম, কারণ সে যে রকম রোগা, তাতে সে আমাদের সঙ্গে চলতে পারবে, সে ভরসা ছিল না; তার উপর যদি তাকে আগে রওনা না করা যেতো তা হলে দেখছি, পথে এই দৈবদুর্যোগের মধ্যে সে নিশ্চয়ই মারা পড়তো। যাহোক দারোগা সাহেব আমাদের চটি ত্যাগ করবার নিষেধবার্তা জারি করবার পূর্বেই সে বেরিয়ে পড়েছিল। কথা ছিল, সে সম্মুখের চটিতে এস আমাদের জন্যে অপেক্ষা করবে; আমরা নারায়ণচটিতে পৌঁছে দেখলাম, সে আমাদের অপেক্ষায় বসে আছে। পথে জল ঝড়ে আমাদের কি দুরবস্থা হচ্ছে ভেবে বেচারি বড়ই চিন্তিত ও বিমর্ষ হয়ে বসেছিল। আমরা ভিজতে ভিজতে নারায়ণচটিতে উপস্থিত হলাম; আমাদের দেখতে পেয়ে তার রোগক্লিষ্ট শুষ্কমুখে মৃদু হাসির রেখা ফুটে উঠলো, আমারাও তাকে সুস্থদেহে সেখানে উপস্থিত দেখে খুব আনন্দিত হলাম।

নারায়ণচটিতে যখন পৌঁছানো গেল, তখনও দেখলাম বেলা আছে। পাতলা মেঘের দল ছিন্নবিচ্ছিন্ন হয়ে, চারিদিকে উড়ে যাচ্ছে; রোদ একটুও নেই; গাছের ডালে নানারকম পাখি বসে তাদের সিক্ত পাখা ঝাড়ছে, আর কলরব করছে। এখানে দু পাঁচজন মানুষের মুখ দেখে আমরা অনেকটা আশ্বস্ত হলাম। এ চটিও পাহাড়ের এক অতি নির্জন নেপথ্যে; লোকালয় নেই বললেও অত্যুক্তি হয় না; তবু এখানে এসে মনে হলো, আমরা জনমানবশূন্য নির্জন প্রান্তর ছেড়ে যেন একটা গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করছি। পুরুষেরা

নিশ্চিন্ত মনে গল্প বলছে; মেয়েরা দু তিনজন মুখোমুখি দাঁড়িয়ে হাসছে, কথাবার্তা বলছে, অপরিচিত কয়েকজন সন্ন্যাসীকে দেখে কৌতুক-বিস্ফারিত চোখে আমাদের দিকে চেয়ে জনান্তিকে কি বলা-কহা করছে; আর ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা এদিকে ওদিকে দৌড়ে বেড়াচ্ছে; পথের উপর ইতঃস্তত বিক্ষিপ্ত রাশীকৃত ভিজে কাঁকর জড় করছে, কিম্বা অদূরবর্তী গাছের তলা হতে রাশি রাশি শুকনো পাতা কুড়িয়ে আনছে। চারিদিকে বেশ একটা জীবনের হিল্লোল; এবং সজীবতার লক্ষণ প্রকাশ পাচ্ছে।

এই চটিতে দুখানা ঘর। ঘর দুখানা নিতান্ত চটির মতন নয়, একটু বড় বড়। আমরা বদরিনারায়ণে যাবার সময় এ চটিটা দেখতে পাইনি। এই রাস্তা দিয়েই গিয়েছি,তাতে আর সন্দেহ নাই, কিন্তু তখনও বোধ হয় এ চটি খোলা হয় নি, কিম্বা হয় ত কোনো গৃহস্থের বাড়ি ভেবে এদিকে না তাকিয়েই চলে গিয়েছি। সম্ভবত তখন বিশেষ দরকার হয় নি বলেই এ বিষয়ে উপেক্ষা করেছিলাম, এখন ফিরবার সময় এই চটির সম্ভাবনার কথা একবারও আমাদের মনে হয় নি বলেই আমরা মেঘ দেখে ভারি ভয় পেয়েছিলাম; কারণ আমাদের মনে হয়েছিল, এত নিকটে বুঝি আর চটি পাওয়া যাবে না। যা হোক, এই চটিতে আমরা আজ কয়জন মাত্র যাত্রী। অন্য কোনো যাত্রী নেই দেখে আমাদের মনে বড়ই ভরসা হলো, কারণ যদি আমাদের আগে কোন যাত্রীর দল আসতো, তা হলে চটিতে যে সামান্য খাদ্য সামগ্রী পাবার সম্ভাবনা, তা তারা পঙ্গপালের মত সমস্ত নিঃশেষ করে চটির দোকানখানিকে গজভুক্ত কপিত্থবৎ নিতান্ত অসার করে রাখত; আমরা দারুণ পথশ্রমে, এবং তা অপেক্ষাও নিদারুণ ক্ষুধা নিয়ে অনাহারেই পড়ে থাকতাম। যৎকিঞ্চিৎ পানাহার হতে বঞ্চিত হতে হবে না ভেবে, আমরা অনেক পরিমাণে আশ্বস্ত ও আনন্দিত হলাম। বৈদান্তিক ভায়া পেটের চিন্তাতে এতই বিভোর হয়ে পড়েছেন যে, তাঁহার পিঠের বেদনার দিকে কিছুমাত্র ভ্রূক্ষেপ নাই। চটিতে যাত্রীর ভিড় নেই দেখে তিনি হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। তাঁর সেই দীর্ঘ নিঃশ্বাসকে ভাষায় তর্জমা করতে হলে এই ভাবখানা দাঁড়ায় যে ''রাম, বাঁচা গেল, একটা বাজে লোকও এখানে আসে নি দেখছি, তা হলে এখানে দুটো খাবার এবং একটু মাথা রেখে আরাম করবার অসুবিধা হবে না''।

চটিতেই দোকানদারকে দেখতে পেলাম। তার বাড়িও এই চটির নিতান্ত কাছে, একেবারে লাগাও বললেই হয়। রাস্তার বাঁ-ধারে পাহাড়ের ঢালুর দিকে দু খানা দোকানঘর, আর ডান পাশে একটু উঁচু জমিতে তার বসত বাড়ি। দোকানের সম্মুখে দাঁড়িয়ে একটু উপর দিকে নজর করলেই তার বাড়ি দেখতে পাওয়া যায়। আজ এতদিন পরে তার সেই পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ছোট চটিখানার কথা লিখছি, এখনও যেন সেই ঘর, দ্বার, বাড়ি আমার চক্ষুর সম্মুখে চিত্রের মত ভাসছে। তার বাড়িখানিও বেশ সুন্দর। আমাদের বঙ্গদেশের সমভূমিতে পল্লীগ্রামের সাধারণ গৃহস্থ বাড়ি যে রকমের, ঠিক সেই রকম নয় বটে, কিন্তু তার সেই পার্বত্য পল্লীর সামান্য বাড়িটাতে আমাদের পল্লীগ্রামের অনেকটা ভাব পরিস্ফুট দেখা গেল, তেমনই জাঁকজমকহীন, পরিষ্কার সরল মাধুর্যমণ্ডিত, রাঙামাটির দেওয়ালের উপর নানা রকমের ফল ফুল লতা পাতা কাটা, পল্লীগ্রামের অজ্ঞাতনামা রবিবর্মার হাতে তৈয়েরি অদ্ভুত রকমের পাখির ছবি; ছবিগুলিতে যে পরিমাণেই শিল্পচাতুর্যের অভাব থাকুক, কিন্তু সেই অশিক্ষিত হস্তের অঙ্কনভঙ্গির মধ্যে একটা আগ্রহের ভাব ফুটে উঠেছিল। সুন্দর করে আঁকবার জন্যে

একটা ব্যাকুলতা, আর তাতে স্থায়িত্ব স্থাপনের আকাঙ্খা তার প্রত্যেক রেখার মধ্যে দেখা যাচ্ছিল, আর সেইটিই সকলের চেয়ে আমার কাছে সজীব এবং সুন্দর বলে বোধ হচ্ছিল। পৃথিবীতে সকলে সকল বিষয়ে সিদ্ধিলাভ করে না, কিন্তু যারা সিদ্ধিলাভের জন্যে চেষ্টা করে, অসিদ্ধ হলেও তাদের প্রাণপণ চেষ্টাটা উপেক্ষার বস্তু নয়।

দোকানদারের বাড়িতে দুখানা ঘর; একখানা বেশ বড়, তাতেই সে সপরিবারে বাস করে, আর একখানা ছোট কুঁড়ে – বোধ হলো গোয়াল ঘর, তখন সে ঘরের মধ্যে গোরু ছিল না। একটা মাঝারি গোছের বেলগাছতলাতে দু তিনটে গোরু বাঁধা ছিল, এবং একটা ছোট বাছুর পাহাড়ের একধারে ছোটাছুটি করে বেড়াচ্ছিল। বাছুরটা এক-একবার তার মায়ের দৃষ্টির বাহিরে গেলেই তার পয়স্বিনী মাতা মাথা উঁচু করে প্রসারিত চক্ষে ঘন ঘন সে দিকে তাকিয়ে দেখছে, যেন সেই রজ্জু-বদ্ধ গাভিটির সকরুণ মাতৃস্নেহ অক্ষয় কবচ হয়ে তার চঞ্চল বৎসটিকে কোন অনিশ্চিত বিপদ হতে রক্ষা করতে চায়। এই বেলগাছের অদূরে আরও একটা বেলগাছ এবং দুটো পেয়ারা গাছ। এখন বর্ষার পূর্বাভাস মাত্র ফুল এবং ছোট ছোট ফলে পেয়ারা গাছ দুটি ভরে গিয়েছে। গোয়ালের পাশে এক ঝাড় কলাগাছ, তেমন সবল নয় এবং পাতাগুলো ছোট ছোট, যেন পাহাড়ের শুষ্ক নীরস জমি হতে তারা যথেষ্ট পরিমাণে খাদ্যরস সংগ্রহ করতে পারছে না। দোকানদারের বাড়ির ঠিক নীচে দিয়ে একটা ঝরনা বয়ে যাচ্ছে; জল গভীর নয়, কিন্তু অতি নির্মল, এবং এই ক্ষুদ্র গ্রামখানির প্রাণস্বরূপিণী। দোকানদারের বাড়ির সম্মুখে একটুখানি সমতল জমি আছে, মাঝখানে একটা মধ্য-আকৃতির বটগাছ; গোড়াটা পাথর দিয়ে বাঁধানো; আমাদের দেশে কোনো কোনো গাছের তলা যেমন ইট পাথর দিয়ে বাঁধানো হয়; সে রকম নয়; কতকগুলো বড় বড় পাথর গোল করে গাছের গোড়ায় দেওয়া। পাথরগুলি সমস্তই আল্‌গা, তবে তার উপর বসলে ধসে পড়বার কোনো সম্ভাবনা নেই। সকালে সন্ধ্যায় অনেকেই এই গাছের তলায় বসে গল্প গুজবে দুদণ্ড কাটিয়ে দেয়; ধরতে গেলে এই গাছতলাটাই দোকানদারটির বৈঠকখানা। আমরা এই দোকানদারের দোকানে রাত্রির মত আশ্রয় নিলাম।

আমরা যে দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলাম, সেই দোকানদারের বাড়ি ও দোকান খুব কাছাকাছি বলে সে দোকান এবং ঘরের দু-জায়গার কাজই চালাতে পরে। তার কটি ছেলেমেয়ে তা জানি নে, তবে একটি একটু বড় মেয়ে দোকানে এসে আমাদের জিনিসপত্র এনে দিয়েছিল।

আমরা আজ সত্যসত্যই একটা প্রকাণ্ড ভোজের আয়োজন করে ফেললাম। দোকানে চাউল মিললো না, এ পাহাড়ে রাস্তায় অতি কম জায়গাতেই চাউল পাওয়া যায়, অনেকদিন পরে পিপুলকুঠিতে একদিন পাওয়া গিয়েছিল। চাল না পাবার কারণ এই যে ভাতভক্ত বাঙালি এদিকে প্রায়ই তীর্থ করতে আসে না; যে দু-পাঁচজন আসে, তারা অল্প দিনের মধ্যে অগত্যা ডাল রুটিতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। দোকানদারের মেয়ে আমাদের জন্যে আটা নিয়ে এল। আটার চেহারার বর্ণনাটা এখানে দিতে পারলাম না; সেটা আমার দোষ নয়, বাঙলা ভাষায় তার উপযুক্ত দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করার চেষ্টায় একেবারে হয়রাণ হয়ে গিয়েছি; তবে কাব্যরসবঞ্চিত বৈদান্তিকের মুখে একটা উপমার কথা শুনা গিয়েছিল। তিনি আটার রং দেখে বলেছিলেন ''এ কি আটা ? তবু ভাল;

আমি ভাবছি বুঝি খোল পিষে এনে দিয়েছে।'' – কথাটা শুনে আমার মনে একটু তত্ত্বকথার উদয় হলো; আমি বললাম, ''আমাদের মনরূপ গাড়োয়ান এই দেহরূপ গোরুগুলোর নাকে দড়ি দিয়ে ক্রমাগত ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে; কাঁধের জোয়ালও নামছেনা, যাত্রার অবসান নেই। শুধু মহাপ্রাণীটাকে কোন রকমে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে সন্ধ্যাবেলা এই রকম চারটে খোল বিছলির বন্দোবস্ত হচ্ছে। স্বামিজী সকল অবস্থাতেই অটল; তিনি বললেন, ''অচ্যুত, আজ তুমি যেমন পিঠে খেয়েছ, তেমনি এই আটা দিয়ে লুচি তৈয়েরি করে তোমাকে পিঠে খাওয়াতে পারতাম ত বড় আনন্দ হতো।'' – ''সে ত আর কঠিন কথা নয়'' বলে আমি দোকানদারের দোকানে প্রবেশ করলাম এবং তার ঘিয়ের ভাঁড়টা দিয়ে সমস্ত ঘিটুকু নিয়ে এলাম। দোকানদার আমাদের এই ভোজন ব্যাপারে স্বয়ং পরিশ্রম দ্বারা সাহায্য করতে অঙ্গীকার করলে। সে তার বাড়ি হতে জিনিসপত্র এনে আমাদের জোগাড় করে দিলে, তার মেয়েটি আমাদের কাছেই বসে র্ইল। উনুন জ্বলছে, আটা মাখা হচ্ছে, একটি ছোট প্রদীপে ছোট ঘরখানি আলোকিত হয়েছে, আর মেয়েটি যুক্তাসনে বসে তিনটি অপরিচিত অতিথির কাণ্ডকারখানা দেখছে; একবার বা আমাদের দিকে চাইতেই আমাদের সঙ্গে যেমন চোখাচোখি হচ্ছে, অমনি চোখ নামিয়ে দু'হাতের দশটা অঙ্গুলি নিয়ে খেলা করছে। আমি বারে বারে তার মুখের দিকে চেয়ে দেখছিলাম; মুখখানি যে খুব সুন্দর তা নয়, তবে ভারি সরলতাপূর্ণ। চোখের উপর কাল ভ্রূ; সমস্ত মুখখানি ও রুক্ষ অপরিচ্ছন্ন চুলের উপর প্রদীপের আলো পড়ে তাকে একটি পবিত্র আরণ্য–ফুলের মত দেখাচ্ছিল; সুন্দর না হোক কিন্তু তার সুবাস ঢাকা থাকে না। এই মেয়েটি তার ক্ষুদ্র জীবনের কয়েক বৎসর মধ্যে আমাদের মত কত অপরিচিত পথিক দেখেছে, কতদিন কত লোকের সুখ দুঃখের সঙ্গে তার জীবনের একদিনের সুখ দুঃখ আনন্দ মিশিয়ে দিয়েছে। সংসারে সকল বন্ধন কেটে যারা সন্ন্যাসী হয়ে বেরিয়েছে, পুত্র কন্যার স্নেহের টান এই দূর হিমালয় শৃঙ্গেও যাদের হৃদয়কে সবলে আকর্ষণ করেছে – এমন কত লোক এমনি সন্ধ্যাবেলা এই কুটিরে প্রদীপের আলোতে এই মেয়েটির কচি মুখখানি দেখে চিরবিদায় ক্লিষ্ট হৃদয়ে আপনার একটি সুন্দর ছোট মেয়ের করুণ আহ্বান অনুভব করেছে, হঠাৎ একটা অব্যক্ত মধুর ব্যথায় তাদের বুকের শিরাগুলো টনটন করে উঠেছে এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে আমি কুটিরের এক কোণে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। বৃষ্টি ও ঝড়ে আমার শরীরটেও বড় কাতর হয়েছিল, কাজেই আমাকে ঘুমাতে দেখে কেউ জাগিয়ে দেন নি। শেষে কতক্ষণ পরে জানি নে, স্বামিজীর ডাকাডাকিতে ঘুম ভেঙে গেল, দেখি তখনও মিটমিট করে আলো জ্বলছে, উনুনের আগুন নিবে গিয়েছে, মেয়েটিও চলে গিয়েছে, তার বদলে থালের উপর অনেকগুলি গরম লুচি, খোসাওয়ালা 'রহড়কা ডাল' আর ছোট একতাল গুড়, তাতে বালি কাঁকর প্রভৃতি এমন অনেক জিনিস প্রচুর পরিমাণে মিশানো, যা কোনো কালে খাদ্যশ্রেণীর মধ্যে ধর্তব্য হতে পারে না। কিন্তু তাই পরম পরিতৃপ্তির সঙ্গে গ্রহণ করা গেল। আমার অনুরোধক্রমে দোকানদার তার মেয়েটিকে নিয়ে এল, বোধ হয় সে ঘুমিয়েছিল। প্রথমে কিছুতেই সে খাবার নিতে চায় না, শেষকালে তার বাপের উপদেশে কিছু কিছু নিলে ! দোকানদার তার নিজের বা গৃহিণীর হাতের রান্না ভিন্ন খায় না, ব্রাহ্মণদের মধ্যে উচ্চ শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বলে নিজের পরিচয় দিল, সুতরাং আমাদের এই আনন্দভোজন থেকে তাকে বঞ্চিত হতে হলো। আমরা খুব পরিতোষের সঙ্গেই আহার করলাম, পথের সমস্ত কষ্ট এবং ক্ষুধা এই গরম পুরি ও 'রহড়কা ডালের' সঙ্গে পরিপাক হয়ে গেল। আমাদের সঙ্গী রোগা ছেলেটির প্রতিও এই পথ্যের ব্যবস্থা হলো;

কিন্তু এই ব্যবস্থা সমালোচনা করবার উপযুক্ত লোক সেখানে ছিলেন না; এক স্বামিজী নাড়ি টিপতে জানতেন, কিন্তু তিনিই রোগা ছেলেটিকে স্বহস্তে 'ডাল ও পুরি' দিলেন।

আহারান্তে আবার নিদ্রা – অতি চমৎকার নিদ্রা। এই দেশভ্রমণে প্রবৃত্ত হয়ে আমাদের সকল জিনিসেরই অভাব ছিল, অভাব ছিল না কেবল একটি জিনিসের, সেটি হচ্ছে – সুনিদ্রা। বাস্তবিকই এই অতি দুর্গম দীর্ঘ পথে নিদ্রা আমাদের সন্তাপহারিণী মায়ের মত হয়েছিল। এই নিদ্রার অভাব হলে বোধ করি আমরা এতটা কষ্ট সহ্য করতে পারতাম না। বিছানা ত কোনদিন জোটেই নি, কোনদিন কদাচিৎ পর্ণকুটিরে মাথা রাখবার জায়গা পেয়েছি; অধিকাংশ সময়েই হয় অনাবৃত পর্বতবক্ষে, না হয় গাছের তলায় রাত্রি কাটাতে হয়েছে; কিন্তু তখন সেই পর্বত গহ্বরে ভূমিশয্যায় কম্বল মুড়ি দিয়ে যেমন ঘুম হতো, সেরূপ নিদ্রা লাভ করার জন্যে এখন কতদিন সুকোমল শয্যার উপর শয্যাকণ্টক ভোগ করতে হয়েছে। সন্ধ্যার সময় শুয়েছি, আর এক ঘুমেই রাত্রি ভোর হয়েছে; সঙ্গে সঙ্গে শরীরের জড়তা, পায়ের বেদনা, মনের অবসন্ন ভাব দূর হয়ে গিয়েছে; সম্মুখের বড় বড় চরাই উৎরাইগুলো ভাঙতে কিছুই কষ্ট বোধ হয় নি। আজ এই বাঙলাদেশে সে সব কথা স্বপ্ন বলে মনে হয় , আরও দিনকতক পরে হয় ত মনেই করতে পারবো না যে, আমার দ্বারা এমন একটা গুরুতর কাজ সম্পন্ন হয়েছিল।

৪ জুন, বৃহস্পতিবার। . . . আজ সকালে যাত্রা আরম্ভের উদ্যোগ করলাম। স্থির করা গেল লালসাঙা গিয়ে দুপুরবেলা বিশ্রাম করতে হবে। লালসাঙার কথাটা আমার এখনও বেশ মনে আছে। এই পথ দিয়ে নারায়ণে যাবার সময় এইখানেই সেই জুতোচোর সাধুর বিড়ম্বনা দেখেছিলাম। আমাদের দুর্ভাগ্যবশত আজও কিছু লজ্জাজনক ব্যাপার দেখতে হলো। নারায়ণচটি হতে লালাসাঙা ছয় মাইল, পথের বর্ণনার আর দরকার নেই। আজ এই এক মাসের উপর হতে শুধু চরাই ও উৎরাই, নামা আর উঠা, পর্বত নির্ঝর এবং নির্ঝর পর্বত এই নিয়েই আছি। এসব কথা ভাল লাগবে না, কিন্তু এখন নেমে যাচ্ছি, আর কখন এ সব জায়গাতে ফিরে আসতে পারব না – তাই ভেবে মনে বড় কষ্ট হচ্ছে। একরাত্রিও যে দোকানে বাস করেছি, সেটা ছাড়তে মনে হচ্ছে যেন চিরকালের জন্যে একটা আশ্রয় ছেড়ে চললাম। নারায়ণে যাবার সময় মনে হয়েছিল যেন মহাপ্রস্থানের স্বর্গে চলেছি। এখন মনে হচ্ছে আবার সেই আকাঙ্খা–কাতর ধূলিময়, রৌদ্রদগ্ধ পৃথিবীতে ফিরে যাচ্ছি। আমার চিরদিনের মাতৃভূমিতে যাচ্ছি এই যা কিছু সান্ত্বনা; কিন্তু সেখানেও দুঃখযন্ত্রণা, হাহাকারের বিরাম নেই।

এই সকল কথা ভাবতে ভাবতে চলতে লাগলাম; শেষে বিস্তর চরাই উৎরাই ভেঙে শ্রান্তদেহে বেলা প্রায় এগারটার সময় লালসাঙায় পৌঁছলাম। আজ আমাদের পথশ্রম বড়ই বেশি হয়েছিল। ধীরে ধীরে চলা আমার অভ্যাস নয়, সে কথা পূর্বেই বলেছি, চলতে চলতে মাঝরাস্তাতে বসে আমি কোনদিনই বিশ্রাম করতে পারি নি। যেদিন যতটুকু যাওয়া দরকার, এক দম চলে, তারপর হাত পা ছড়িয়ে সে দিনের মত ছুটি। এই রকম হিসাবে চলে আসা যাচ্ছিল, কিন্তু আজ আমাকে বাধ্য হয়ে এ অভ্যাস ছাড়তে হলো। আমাদের সঙ্গে সেই রোগা ছেলেটি আছে; সে নিতান্ত ভাল মানুষ, মুখে কথাটি নেই। তাকে সঙ্গে করে পথ চলা বড় কঠিন; পাছে দ্রুত চলতে তার কষ্ট হয়,

এই ভেবে আমি বড় আস্তে আস্তে চলছিলাম। সে দশ পা যায়, আবার নিতান্ত অবসন্ন হয়ে পড়ে, তখন গাছে ছায়া, কি পাথরের পাশে বসে, তাকে অঞ্জলি পুরে ঝরনার জল খাওয়াই, ইংরেজি পুঁথির দু চারটি ভাল গল্প বলি, কখনও বা দু চারটি কবিতা বলে তার মনটা প্রফুল্ল করবার চেষ্টা করি। তারপর আবার তাকে নিয়ে উঠি – ধীরে ধীরে পায়ে পায়ে তাকে নানারকমের অদ্ভুত গল্প বলে – মা যেমন ছোট ছেলেটির মন গল্পে আকৃষ্ট করে তাঁর চঞ্চল শিশুটিকে ঘুমের রাজ্যে নিয়ে যান, তেমনি আমিও তার অজ্ঞাতসারে তাকে চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছি, অজ্ঞাতসারে তার গতিবৃদ্ধি হচ্ছে। এই রকম করে ছয় ঘণ্টায় প্রায় চায় মাইল পথ পার হয়ে লালসাঙায় হাজির হওয়া গেল।

নারায়ণে যাওয়ার সময় লালসাঙার বাজারটি পর্যন্ত ঘুরে দেখিনি। এবার লালসাঙায় এসে সেবারকার সেই দোকানের উপর ঘরেই বাসা নেওয়া গেল। আহারাদির বন্দোবস্তের ভার সঙ্গীদের উপর সমর্পণ করে বাজার দেখতে বেড়িয়ে পড়া গেল।

বাজারের ঘরগুলি বেশ বড় বড়, অধিকাংশ দোতলা। দোকানগুলিতে প্রচুর পরিমাণে জিনিসপত্র আছে। চারিদিক দেখতে দেখতে আমি বাজারের শেষপ্রান্তে উপস্থিত হলাম। সেখানে একটা ছোট অথচ বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন কুটিরের সম্মুখে একটু জনতা দেখতে পেয়ে সেখানে গিয়ে দেখি চার পাঁচজন লোক দাঁড়িয়ে আছে। ব্যাপার কি জানবার জন্যে একটু অগ্রসর হয়ে দেখি, দুজন স্ত্রীলোক হিন্দি ও বাংলায় কথা মিশিয়ে ঝগড়া করছে। এই দূরদেশে বাংলা কথা, তা আবার স্ত্রীলোকের মুখে ! আমি আরও খানিকটে অগ্রসর হলাম। সে সময়ে আমার চেহারা এমন হয়েছিল যে, আমার অতি নিকট বন্ধুও আমাকে বাঙালি বলে সন্দেহ করতো না, সুতরাং সেখানে যে সমস্ত পাহাড়ী দাঁড়িয়ে ঝগড়া দেখছিল, আমিও তাদের মধ্যে একজন হয়ে পড়লাম। কিন্তু গিয়ে দেখি সেখানে না গেলেই ভাল হতো। সে দৃশ্য দেখে আমার যেমন কষ্ট তেমনি রাগ হলো। অনেক দিন হতেই সাধু সন্ন্যাসীদের সঙ্গে চলা-ফেরা, আহার উপবেশন করছি সাধারণের কাছে আমিও একজন সন্ন্যাসী বলে পরিচিত, কিন্তু সাধুসন্ন্যাসীর মধ্যে থেকেও সন্ন্যাসীর জাতের উপর শ্রদ্ধা অপেক্ষা আমার অশ্রদ্ধাই বেশি হয়েছে। সন্ন্যাসীদের দূর হতে দেখতে বেশ; কোনো আসক্তি নেই, বিলাস-লালসা, সংসার চিন্তার নাম মাত্র নেই; মুক্ত, স্বাধীন, বন্ধনহীন; কিন্তু শরীরের উপরের মত তাদের অধিকাংশেরই মনের ভিতর এত ময়লা-মাটি যে, এদের ঘৃণা করাই স্বাভাবিক বলে বোধ হয়। শ্রেষ্ঠতীর্থ কাশীধামের পবিত্রতার আবরণতলে যে বিভৎস কাণ্ডের অভিনয় হয় পবিত্র সন্ন্যাসী নাম গ্রহণ করে কত সমাজ-তাড়িত লোক যে সন্ন্যাসধর্মের উপর কলঙ্ক ঢেলে দিচ্ছে, তার আর অবধি নেই। অধিকাংশ সন্ন্যাসীই শুধু গেজাখোর, ভিক্ষুক, কোপন-স্বভাব, সকল দোষের ঝুলি নিয়ে তীর্থে তীর্থে পাপের বীজ ছড়িয়ে বেড়াচ্ছে তবে বাঙালি সন্ন্যাসীর সংখ্যা নিতান্ত কম, তাই তাদের কুকীর্তি বলার কোনো সুযোগ হয় না, কিন্তু খুঁজে দেখলে বাঙালি সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীর মধ্যেও অনেক ভণ্ড নজরে পড়ে।

আজ যে স্ত্রীলোক দুটিকে প্রকাশ্য বাজারের মধ্যে দাঁড়িয়ে অশ্লীল ভাষায় ঝগড়া করতে দেখলাম, তারা বাঙালি সন্ন্যাসিনী, ভৈরবী বেশ, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, সিঁথিতে রক্তচন্দনের কি সিঁদুরের ফোঁটা, রুক্ষকেশপাশ আলুলায়িত, হস্তে ত্রিশূল ও কমণ্ডুল, গলে রুদ্রাক্ষের মালা, কাঁধের ঝুলি বোধ হয় কুটিরের মধ্যে আছে; অনুষ্ঠানের ত্রুটি

নেই, যাত্রার দলে নির্লজ্জ ছোকরারা যেমন গোঁফ কামিয়ে সন্ন্যাসিনীর পোষাকে দর্শকদিগের সম্মুখে দর্শন দেয়, কিছুমাত্র সংকোচ কিংবা শ্লীলতা নেই, এদের দুজনেরও ঠিক সেই ভাব দেখা গেল। অনুষ্ঠানের কোনো ত্রুটি না থাকলেও এদের আর কিছু নেই; ধর্ম নেই, কর্ম নেই, সতীত্বের সৌকুমার্য নেই। স্ত্রীলোক দু জন মধ্যবয়সী, একটি প্রৌঢ়াবয়স্কা বললেও অত্যুক্তি হয় না। যার বয়স কিছু বেশি, সে এইমাত্র লালসাঙায় এসেছে; দেখে বোধ হলো সে এখনও বাসা নেয় নি; সর্বশরীর ধূলিধূসরিত, শ্রান্ত ক্লান্ত। এদের বিবাদের কারণ শুনে আমার মনে যুগপৎ লজ্জা ও দুঃখ হলো। এরা দুজনেই কেদারনাথ দর্শন করতে গিয়েছিল। বড় ভৈরবীর সঙ্গে একটি সাধুপুরুষ ছিল, কনিষ্ঠা ভৈরবী পূর্বদিন অপরাহ্নে সেই সাধুটিকে ভুলিয়ে এখানে নিয়ে এসেছে। জ্যেষ্ঠা সন্ন্যাসিনী বহু পরিশ্রমে এখানে এসে তার হারানিধিকে আবিষ্কার করেছে, এবং সেই সাধুপুরুষের উপর অধিকার নিয়ে দুজনে বিষম ঝগড়া আরম্ভ করেছে। এ বিবাদের কথাবার্তা সমস্ত হিন্দুস্থানিতে পুষিয়ে ওঠে নি, কাজেই হিন্দুস্থানি ছেড়ে এখন বাংলায় কথা চলেছে, এবং সঙ্গে সঙ্গে দুজনেই হাত মুখের অতি কুৎসিত ভঙ্গি করছে। আমি সেখানে লজ্জায় দাঁড়াতে পারলাম না। যে সকল দর্শক সেখানে উপস্থিত ছিল, তারা বাংলা জানে না, কাজেই তারা পরম তৃপ্ত মনে এই বীরত্ব গাথা শুনে যাচ্ছিল। আমি সেখান হতে তাড়াতাড়ি বাসায় ফিরে এলাম। কথায় কথায় অচ্যুত ভায়া এই কলঙ্ক কাহিনী শুনতে পেলেন; আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন ''তারা সত্যিসত্যিই বাঙালি নাকি ? এতক্ষণ বল নি !''– এই বলে তিনি তাঁর সুবৃহৎ পার্বত্য–যষ্টি নিয়ে ভৈরবীদ্বয়ের দর্শনাকাঙ্খায় চটি ত্যাগ করলেন। আমি ও স্বামিজী মিলে কি তাঁকে ঠাণ্ডা করতে পারি ? শেষে অনেক নীতিকথা ব্যয় করে তাঁকে ফিরাই। ভৈরবীদ্বয় আপাতত রক্ষা পেলে, কিন্তু ভায়া তর্জন করতে করতে বললেন যে একবার তাদের সঙ্গে দেখা হলে এক লাঠির বাড়িতে তাদের ভণ্ডামি ভেঙে দেবেন।

নারায়ণে যাবার সময়ে লালসাঙায় এক বিনামা চোর সাধুর কীর্তিকাহিনী বলেছিলাম, এখন ফিরবার সময়ে দুইটি বাঙালি ভৈরবীর পাশব দৃশ্য দেখা গেল। স্বামিজীর ইচ্ছা ছিল যে, আজকার দিনটা লালসাঙায় থাকা যাক, বৈদান্তিক ভায়ারও তাতে বড় একটা আপত্তি ছিল না; কিন্তু যা হোক বসে থাকা আমার ভাল লাগলো না; কাজেই আমরা সেই অপরাহ্নেই বেরিয়ে পড়লাম। শীঘ্র শীঘ্র নন্দপ্রয়াগে আসবার আমার আরও একটা উদ্দেশ্য ছিল; আমাদের সঙ্গে এক অজ্ঞাতকুলশীল বালক সন্ন্যাসী জুটেছিল তার শরীরের অবস্থা অতিশয় শোচনীয়। আজ অনেক কষ্টে তাকে লালসাঙা অবধি নিয়ে এসেছি। আজ রাতটা যদি এখানে বাস করি, তা হলে এমনটা হওয়া অসম্ভব নয় যে, সে একেবারে অবসন্ন হয়ে পড়বে, তার শরীর এমন ভেঙে পড়বে যে, আর তার চলবার শক্তি থাকবে না। যদিও লালসাঙাতে চিকিৎসালয় আছে, কিন্তু যাকে আজ কয়দিন থেকে সঙ্গ করে ফিরছি, তাকে এই অপরিচিত স্থানে দাতব্য চিকিৎসালয়ে ফেলে যাব, এ কথাটা যেন মনে কেমন ঠেকতে লাগলো। তাকে হয় ত দুদিন পরে ডাক্তারখানা থেকে তাড়িয়ে দিতে পারে। অথবা সাধারণত দাতব্য চিকিৎসালয়ের রোগীদের প্রতি যে প্রকাণ্ড যত্ন লওয়া হয়, তাতে এই দুর্বল রুগ্ন অসহায় বালকটি দুদিন আগেই জীবনলীলা শেষ করে বসবে। কোন রকমে তাকে নন্দপ্রয়াগে নিয়ে যেতে পারলে আমার আর সে ভয় থাকবে না। যখন নারায়ণ দর্শনে যাই, সেই সময়ে নন্দপ্রয়াগের দাতব্য–চিকিৎসালয়ের ডাক্তারবাবুর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় হয়েছিল, তাঁকে একজন দয়ালু ভাল ভদ্রলোক

বলে আমার বেশ বিশ্বাস হয়েছিল। এই রোগীটিকে তাঁর হাতে দিয়ে যেতে পারলে তার যে অযত্ন হবে না এবং সেই ডাক্তারের যতটুকু বিদ্যা তাতে যদি বালকের রোগমুক্তির সম্ভাবনা থাকে তা হলে চাই কি, সে আবার সুস্থ হয়ে নিজ গন্তব্য স্থানে চলে যেতে পারবে। এই জন্যেই সেই অপরাহ্নে তাড়াতাড়ি নন্দপ্রয়াগে আসবার জন্য বেড়িয়ে পড়া গিয়েছিল।

প্রাতে ছয় মাইল রাস্তা হেঁটেই বালকটি কাতর হয়েছিল; এবেলা আমাদের বাহির হবার আয়োজন দেখে সে যে অতি অনিচ্ছায় তার ঝুলিটি কাঁধে ফেলে বাহির হলো তা তার আকার-প্রকারেই বেশ বুঝতে পারা গিয়েছিল। কিন্তু কি করা যায় ! তার মঙ্গলের জন্যই তাকে আজ এই অপরাহ্নে আবার ছয় মাইল পথ যেতে হলো। অপরাহ্ণ বলে আজ আর আমরা কেহই একাকী চললাম না; আমরা চারজন মানুষ একসঙ্গে চলতে লাগলাম। বালকটিকে ধীরে ধীরে চলবার জন্য স্বামিজী তার সঙ্গে নানাপ্রকার গল্প জুড়ে দিলেন। সে এমনই ধীর অথবা তার স্বাভাবিকতা গোপন করবার তার এতটাই দরকার যে, সে 'হুঁ' 'না' এই প্রকার দুই একটি কথা ভিন্ন বেশি বাক্যব্যয় মোটেই করলে না। তার এই প্রকার সংকোচের ভাব দেখে সে যে নিশ্চয়ই বাঙালী এ বিশ্বাস আমার ক্রমেই দৃঢ় হচ্ছিল। সে যদি বালক না হতো তা হলে তার পরিচয়ের জন্য এত আগ্রহ হতো না; কারণ বাঙালীই হোক আর হিন্দুস্থানীই হোক সন্ন্যাসীদলের মধ্যে এ প্রকার লোকের সংখ্যা খুব বেশি, যাদের পূর্বজীবন না জানাই ভাল। আইনের হাত থেকে পালিয়ে জটাধারী হয়ে ভস্ম মেখে কতজন তাদের দুর্বহ জীবন যাপন করে, তার ঠিকানা কি ? কি কষ্টেই জীবন তাদের ! হৃদয়ের মধ্যে সন্ন্যাসের বোঝা প্রকৃত সন্ন্যাসী অপেক্ষা তাদেরই বেশি করে বইতে হচ্ছে; তাদের ভান বেশি, কারণ তাদের আত্মগোপন বেশি দরকার। বালকটি অবশ্যই এমন কোনো অপরাধ করে নি, বা তার পক্ষে এমন কোনো কাজ করা সম্ভবপর নয়, যার জন্যে সে নবীন বয়সে সব ছেড়ে বনে বনে নিতান্ত অসহায় অবস্থায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। পারিবারিক কোনো প্রকার অশান্তি, বা মনের কষ্টেই সে ঘর ছেড়ে ফকির হয়েছে; নতুবা ছেলেমানুষ, ইংরেজি এন্ট্রান্স অবধি পড়েছে, বয়সও অল্প এবং জাতিতে সম্ভবত বাঙালী, সে যে ধর্মের জন্য সব ছেড়েছে, এ কথা, এই কলি যুগের শেষভাগে পুনরায় প্রহ্লাদের ন্যায় ভক্তের আগমন সম্বন্ধে বিশ্বাসবান ব্যক্তি ব্যতীত আর কেউ সহজে, মোটেই বিশ্বাস করতে চাইবে না।

রাস্তায় এমন কোন ঘটনা উপস্থিত হয় নি, যার কথা বলা যেতে পারে, তবে রাস্তার বর্ণনা একটা দেওয়া যেতেই পারে; কিন্তু তার ভিতরে ত আর নূতন কথা কিছু নাই; সেই চরাই আর উৎরাই, সেই বন আর নির্ঝর; সেই হিমালয়, সেই পাখির কলতান, আর সেই জনশূন্য পথে আমাদের মধুর গমন। রাস্তার ধারে তেমনি অতুল শোভা বিকাশ করে ফুল ফুটে রয়েছে, অলকানন্দা তেমনি কুলকুলস্বরে নীচের দিকে নেমে যাচ্ছে; বনের মধ্যে পাখি সকল তেমনই গান করছে। এসব দেখতে আমরা একেবারে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি।

লালসাঙা থেকে নন্দপ্রয়াগ ছয় মাইল। আমাদের নন্দপ্রয়াগে পৌঁছিতে রাত হয়ে গেল; তাতে আমাদের বিশেষ কোন অসুবিধার ভয় ছিল না। এখন প্রত্যাবর্তনের পথ; কোথায় কি আছে সব আমরা জানি; যেখানে গিয়ে সুবিধামত থাকতে পারা যায়, তারও

বন্দোবস্ত আমরা পূর্ব হতেই করতে পারি। নন্দপ্রয়াগে উপস্থিত হয়ে আমাদের সেই পূর্বাবাসেই অবস্থিতি হলো। রাত্রিকালে আর বালকটিকে দাতব্য-চিকিৎসালয়ে নিয়ে যাওয়া হলো না। যতক্ষণ তাকে আমাদের কাছে রাখতে পারি, সেই ভাল। আমাদের পৌঁছানো সংবাদ পেয়েই থানার দারোগা মহাশয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। নারায়ণে যাবার সময় এখানেই পুলিসের ইন্সপেক্টর বাবুর সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল, সেই সূত্রে নন্দপ্রয়াগ থানার দারোগা বাবুও আমাকে একটা বড় লোক ঠাউরে রেখেছিলেন। রাস্তায় কোন প্রকার অসুবিধা হয়েছে কি না, পুলিসের কোনো কর্মচারী যাত্রীর উপর কোনো প্রকার অত্যাচার করেছে কি না, ইন্সপেক্টার সাহেবকে আমি কোনো পত্র লিখেছি কি না, এইসব কথা তিনি একটি একটি করে জিজ্ঞাসা করতে লাগলেন। তাঁর কথাগুলির জবাব দিয়ে আমি সঙ্গী বালকের কথা পাড়লাম; তাকে যে দাতব্য চিকিৎসালয়ে রেখে যাব সে কথা জানিয়ে দিলাম, এবং তাঁদের ভরসায় যে আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বালকটিকে ফেলে যাচ্ছি, সে কথাও বলতে ত্রুটি করা গেল না। দারোগা সাহেব প্রাণপণে এ কাজ করবেন বলে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। একে সে রোগী, তার তত্ত্বাবধান করা ত কর্তব্য কর্ম; তারপর আমি যখন এত করে অনুরোধ করছি এবং ছেলেটির ভার তাঁর উপরে দিয়ে নিশ্চিন্ত হচ্ছি, তখন তিনি যে প্রকারে হউক, তাকে আরাম করে দেবেন; সেই রাত্রেই বালকটিকে চিকিৎসালয়ে নিয়ে যেতে প্রস্তুত, কিন্তু রাত্রিটা আমরা একসঙ্গে বাস করবো এই অভিপ্রায় প্রকাশ করায় অতি 'সবেরে' এসে একত্রে ডাক্তারখানায় যাওয়া যাবে, এই বন্দোবস্ত স্থির করে 'বন্দেগি' জানিয়ে নন্দপ্রয়াগের দণ্ডমুণ্ডের কর্তা মহাশয় প্রস্থান করলেন। তিনি চলে গেলেন বটে, কিন্তু তাঁর অনুচরগণ সে রাত্রি আমাদের ছেড়ে সহজে যায় নি। আমার কথা ত বলেই রেখেছি, কোনো রকমে একবার কম্বলখানি জড়িয়ে পরতে পেলেই হয়, তা হলে স্বয়ং কুম্ভকর্ণও পেরে উঠেন কি না সন্দেহ। পরদিন ভোরে উঠে শুনলাম সমস্ত রাত্রিই কনস্টেবলগণ বাজারে পাহারা দিয়েছে এবং তাদের চীৎকারে মরা মানুষেরও নিদ্রাভঙ্গ হয়; বৈদান্তিক ভায়া না কি অনেক রাত্রে তাদের উপর চটে উঠেছিলেন, কিন্তু আজ তারা মনিবের হুকুম পেয়েছে, আজ বেশ ভাল করে পাহারা দিতে হবে। কেউ যেন মনে না করেন, আমাদের মত অজ্ঞাতকুলশীল মুসাফির লোক আজ বাজারে বাসা নিয়েছে, রাত্রে হয় ত কিছু চুরি করে নিয়ে আমরা পালিয়ে যেতে পারি, সেই জন্যই এত কড়াকড়ি পাহারা। ব্যাপার এই, নীচে নেমে যাচ্ছি খুব সম্ভবত নীচে কোনো জায়গায় ইনস্পেক্টর বাবুর সঙ্গে দেখা হলে নন্দপ্রয়াগের পুলিস বন্দোবস্ত সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি খারাপ কিছু বলতে পারি; যাতে তা না বলি, তারই জন্যে আজ এ প্রকার পাহারা ! নতুবা দোকানদারদের কাছে শুনলাম অন্য কোনো রাত্রে পাহারাওয়ালাদের সাড়া শব্দও পাওয়া যায় না।

পরদিন প্রাতঃকালে (৫ ই জুন শুক্রবার) আমরা প্রস্তুত হবার পূর্বেই দারোগা সাহেব ও দুইজন বরকন্দাজ ধড়াচূড়া পরে এসে হাজির। স্বামিজী, বৈদান্তিক ও আমি তিনজনেই বালকটির সঙ্গে সঙ্গে দাতব্য চিকিৎসালয়ে গেলাম। ডাক্তারবাবু খুব খাতির যত্ন করলেন। পথে কোনপ্রকার অসুখ হয়েছিল কি না তার তত্ত্ব নিলেন; স্বামিজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম। ডাক্তার অতি ভক্তিভরে তাঁর চরণ-বন্দনা করলেন। শেষে বালকটির কথা বলায় অতি আগ্রহে তাকে হাসপাতালে একটি ছোট ঘরে একাকী থাকবার বন্দোবস্ত করবার আদেশ দিলেন। বালকটিকে বিশেষ রকম তত্ত্ব লওয়ার জন্যে

এবং তাকে ভাল করে শুশ্রূষা করতে যদি কিছু ব্যয় হয়, আমি তা দিয়ে যেতে প্রস্তুত হওয়ায় ডাক্তার বাবু বড়ই দুঃখিত হলেন। চিকিৎসালয়ের নিয়মানুসারে সরকার হতেই সব দেওয়া হয়ে থাকে; তা ছাড়াও যদি বিশেষ কিছু দরকার হয়. তাহলে সে দেওয়ার ক্ষমতা ভগবান তাঁহাকে দিয়েছেন, এ কথা তিনি অতি বিনীতভাবে বললেন। – আমি একটু অপ্রস্তুত হয়ে গেলাম।

বালকটির জন্যে বিছানা প্রস্তুত হলে তাকে সেই ঘরে নিয়ে যাওয়া হল, আমরাও সঙ্গে সঙ্গে গেলাম। এখন বিদায় গ্রহণের সময় উপস্থিত হল। আজ তিনদিন যদিও বালকটিকে পেয়েছি, তবুও তাকে আমাদের একজন নিতান্ত আপনার জন বলে মনে হতে লাগলো। এই অসহায় রুগ্ন অবস্থায় তাকে এই পর্বতের মধ্যে ফেলে যাচ্ছি; এ জীবনে হয় ত আর তার সঙ্গে দেখা হবে না। এই দাতব্য চিকিৎসালয় থেকে সে যে আর বাহির হতে পারবে, তার্ই বা নিশ্চয়তা কি, এই সব কথা ভেবে প্রাণের মধ্যে কেমন করতে লাগলো। তারপর যখনই তার সেই রোগক্লিষ্ট মলিন মুখের দিকে দৃষ্টি পড়তে লাগলো, তখনই একটা অব্যক্ত শোকের ছায়া এসে আমাদের হৃদয় আচ্ছন্ন করতে লাগলো। তবুও আমি ধীর নিশ্চলভাবে দাঁড়িয়ে রইলাম; বৈদান্তিক ভায়ার দুইটি চক্ষু বিস্ফারিত দেখে বেশ বুঝতে পারলাম, মায়াবাদী অনেক কষ্টে মনের কোমল ভাব গোপন করছেন। স্বামিজী কিন্তু কেঁদে ফেললেন। তিনি আর আত্মসংবরণ করতে পারলেন না; বালকটির হাত ধরে তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। হায় সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী তুমিই ধন্য ! নিজের সব ত্যাগ করে এসে এখন পথে ঘাটে যাকে কাতর দেখ, যাকে দুঃখী দেখ, তারই জন্যে কেঁদে আকুল। আমারা সর্বত্যগী সন্ন্যাসীর এই অশ্রুত্যাগ দেখতে লাগলাম। পরের জন্যে যে এমন করে চোখের জল ফেলতে পারে, সে দেবতা নয় ত কি !

বেলা হয়ে যায় দেখে, আমরা অতিকষ্টে বালকের নিকট হতে বিদায় গ্রহণ করলাম। ডাক্তারবাবু ও দারোগা মহাশয়কে বিশেষ করে অনুরোধ করা গেল। শেষে তাঁদের নিকট হতে বিদায় নিয়ে আমরা নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ করে চলে এলাম। আর হয় ত জীবনে নন্দপ্রায়াগ দেখা হবে না। যে সব স্থান ছেড়ে যাচ্ছি, কতদিনের সাধনবলে তবে এমন সব পবিত্র স্থান দেখা হয়েছিল; আবার কি এ পুণ্যভূমিতে আসা হবে ? কে জানে ভবিষ্যতের গর্ভে কি আছে ? কে জানে অদৃষ্টদেবী অন্তরাল থেকে আমাদিগকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছেন। রাস্তায় যেতে যেতে শুধু বালকটির কথাই মনে হতে লাগলো। সে যদি আমাদের পরিচয় দিত, তা হলে তার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করতে পারতাম। সে ত নিজের পরিচয় দিলে না। কি এক মনের আবেগে, কি এক হৃদয়ভেদী কষ্টে, যন্ত্রণায় সে লোকালয় ছেড়ে এই ভয়ানক পর্বতপ্রদেশে মাথা দিয়েছে, তা না জানতে পেরে তার উপরে আমাদের স্নেহ আরও বৃদ্ধি হয়েছিল। এমনি করে কত পথিকের সঙ্গে কতদিন কত পথে দেখা হয়েছিল। আজ হয় ত তাদের চেহারা পর্যন্তও মনে নাই।

অদ্য **৫** জুন, শুক্রবার – নন্দপ্রয়াগ ত্যাগ করে আমরা তিনটি মানুষ ধীরে ধীরে অগ্রসর হতে লাগলাম; কারও মনে প্রসন্নতা নাই। কেমন একটা গভীর বিষাদ বুকে করে আমরা নিঃশব্দে পথ বেয়ে চললাম, পা দুখানি যেন কলে চলছে। মুখে কথা নেই। এমন

অবসাদ নিয়ে কি বেশি পথ চলা যায়; কাজেই বেলা যখন দশটা, তখন আমরা সবে চার মাইল রাস্তা এসে কালকাচটিতে বাসা নিলাম। এখন পথ–ঘাট সব চেনা; যে চটিতে আমরা যাবার সময় বাস করে গিয়েছি, সে চটিওয়ালাকে পর্যন্ত বেশ ভাল করে মনে করে রেখেছি। বিদ্যাবুদ্ধি মোটেই নেই, টাকা–কড়ি দিয়ে যে লোককে বশ করবো তাও তেমন ছিল না; তবে একটি জিনিস সম্বল করে এ পথে বেরিয়েছিলাম, সেটি শীতল বুলি। একটা দোঁহা আমি সর্বদাই আবৃত্তি করতাম এবং জীবনে সেটিকে কার্যে পরিণত করবার জন্য অনেক চেষ্টাও করেছি; সে চেষ্টা যে নিতান্তই বৃথা করি নি তার প্রমাণ এই নারায়ণের পথে পেয়েছি। দোঁহাটি ঠিক হবে কি না বলতে পারি না, তবে আমি তাকে এই আকারেই পেয়েছি –

> ''ইয়ে রসনা বশ কর, ধর গরিবি বেশ,
> শীতল বুলি লেকে চলো, সবহি তুমহারা দেশ।''

এই 'শীতল বুলি' – এই মিষ্টি কথাতেই সকলের সঙ্গে মিলে মিশে চলে এসেছি। আমার ত এই অভিজ্ঞতা জন্মেছে যে, পথে ঘাটে চলতে হলে টাকায় কুলোয় না, মান মর্যাদা, গর্ব অহঙ্কার পদে পদে বিড়ম্বিত হয় ; তারা কোনদিনই পথের সঙ্গী নয়, তা এই পাহাড়ের মধ্যেই হউক, আর ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির রেলের গাড়ির মধ্যেই হউক। নিজের ধন, মান, মর্যাদা, বংশগৌরব নিজের গ্রামে বা আশ্রিতমণ্ডলীকে বেশ গুছিয়ে আপন আধিপত্য বিস্তার করতে পারে, পথে ঘাটে তা বিশেষ অসুবিধাই ঘটিয়ে দেয়। এই মিষ্ট বাক্যে সকল চটিওয়ালাকেই বাধ্য করে আমরা পথ চলেছি।

কালকা চটিতে আমরা পৌঁছিলে চটিওয়ালা আমাদের দেখে বড়ই আনন্দিত হল। কতদিন সে কতজনের কাছে আমাদের কথা বলেছে; প্রতিদিনই আমাদের প্রত্যাগমনের পথের দিকে চেয়ে থাকত। তার কথাগুলি শুনে আমাদের মনে বড়ই আনন্দ হল ! আমরা কোথাকার কে, কবে এক রাত্রির জন্যে তার দোকানে আশ্রয় নিয়েছিলাম, আর সে আমাদের কথা মনে রেখেছে, এ কথা শুনে বড়ই আনন্দ হল।

আমরা চটিতে বিশ্রাম করছি, দোকনদার আমাদের আহারাদির আয়োজন করছে। সে দিন আমরা ব্যতীত সে চটিতে আর কোন যাত্রী বাসা নেয় নি; তাই দোকানদার তার যা কিছু সম্বল সমস্তই আমাদের সেবায় নিযুক্ত করেছে। বেলা যখন প্রায় ১১ টা সেই সময় নীচের দিক থেকে একজন বৈষ্ণব সাধু এসে ঐ চটিতে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভাব দেখে বোধ হলো, তিনি আজ অনেক পথ হেঁটেছেন। তাঁর সঙ্গে দ্বিতীয় লোকটি নেই। আমাদের দেশের বৈষ্ণবের মত বেশ; স্কন্ধে একটি ছোট রকমের ঝুলি আছে। তিনি দোকানে প্রবেশ করেই নিজের ঝুলিটি নামিয়ে রেখে একেবারে মাটির উপর শুয়ে পড়লেন, এবং কতকক্ষণ চোখ বুজে রইলেন। তাঁর ভাব দেখে বোধ হলো, এমনি করে শুয়ে তিনি বেশ আরাম বোধ করছেন। তাঁর সে আরামে বাধা দিয়ে কথাবার্তা বলা সঙ্গত নয় মনে করে আমরাও চুপ করে বসে রইলাম। একটু পরেই তিনি গা ঝাড়া দিয়ে উঠে বসলেন এবং স্বামিজীর দিকে চেয়ে বললেন, ''পথশ্রমে বড়ই কাতর হয়ে পড়েছিলাম, তাই আপনার সঙ্গে কথা কইতে পারি নি, কিছু মনে করবেন না।'' স্বামিজী অবাক হয়ে গেলেন; তাঁর সেই আজানুলম্বিত দাড়ি এবং গৈরিক বস্ত্রের প্রকাণ্ড উষ্ণীষ সত্ত্বেও

কি করে বৈষ্ণব তাঁকে বাঙালি ঠাউরে নিয়ে বেশ দিব্বি বাংলায় কথা বললেন, এই স্বামিজীর বিস্ময়ের কারণ। কিন্তু বৈষ্ণব মহাশয় তা বেশ বুঝতে পেরেছিলেন; কারণ পরক্ষণেই তিনি বললেন, '' আপনি সন্ন্যাসীর বেশেই থাকুন, আর যাই করুন, আপনার দাড়ি আমরা কোনদিন ভুলব না। আপনার হয় ত মনে নাই; কিন্তু আপনারা যখন মুঙ্গেরে ছিলেন, আমি তখন জামালপুরে থাকতাম।'' স্বামিজী তাঁকে চিনতে পারলেন না। বৈষ্ণব শেষে আত্মপরিচয় দিলেন। তিনি জামালপুরে কোনো অফিসে চাকরি করতেন। যখন মুঙ্গেরে কেশব বাবু, সদলবলে অবস্থান করছিলেন, সে সময়ে ঐ অঞ্চলে খুব একটা ধর্মান্দোলন উপস্থিত হয়েছিল। অনেক শিক্ষিত যুবক ব্রাহ্মসভা, সংশোধনী-সভা প্রভৃতি স্থাপন করে খুব একটা সোরগোল উপস্থিত করেছিলেন। তার পর কেশব বাবুরা চলে গেলেন; কিন্তু ধর্মের আন্দোলন সহজে মুঙ্গের জামালপুর ত্যাগ করল না; কতকগুলি যুবক যথারীতি ব্রাহ্মধর্ম অবলম্বন করলেন; কেউ শৈব হলেন; কেউ বৈষ্ণব হলেন; পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন, যিনি পরে কৃষ্ণানন্দ স্বামী নাম ধারণ করেছিলেন, তিনি সেই মুঙ্গেরের যুবকদলের একজন উৎসাহী নেতা ছিলেন। কতকগুলি যুবক ধর্মের জন্যে চাকুরি আদি ত্যাগ করলেন। শ্রীকৃষ্ণপ্রসন্ন সেন হিন্দুধর্মের প্রচারক হয়ে দেশে দেশে ফিরতে লাগলেন, তাঁর বক্তৃতা শুনে চারিদিকে হৈ চৈ পড়ে গেল ! আমাদের সঙ্গে যে বৈষ্ণবের সাক্ষাৎ হল, তিনি কিছুদিন সেই দলেই ছিলেন, কিন্তু শেষে নিজের রুচি অনুসারে বৈষ্ণবধর্ম গ্রহণ করে যথারীতি ভেক নিয়ে এখন বৃন্দাবনে বাস করছেন। নারায়ণ দর্শন উদ্দেশ্যে তিনি এদিকে আসেন নাই। তাঁর একজন বাঙালি বন্ধু কানপুরে থাকেন; সেই বন্ধুটির একমাত্র পুত্র কোথায় চলে গিয়েছে। তাঁরা কেমন করে সন্ধান পেয়েছেন যে,সে ছেলেটি বদরিকাশ্রমের দিকে এসেছে; তাই এই বৈষ্ণব সেই ছেলের অনুসন্ধানে এসেছেন। বৃন্দাবনে বসেও প্রভুর নাম করছিলেন, পথেও তাঁরই নাম করবেন; বন্ধুর ছেলেটি যদি পাওয়া যায়, তা হলে বন্ধুর যথেষ্ট উপকার করা হবে বন্ধুপত্নীও প্রাণ পাবেন। পরের উপকারের জন্যই সাধু বৈষ্ণব এই ভয়ানক পথে এসেছেন।

আমরা ত তাঁকে একেবারে নিরাশ করে দিলাম। তিনি যে লোকের উদ্দেশ্যে যাচ্ছেন তার চেহারা যে ভাবে বললেন, তাতে তেমন চেহারার লোক ত আমাদের নজরে পড়ে নাই। একটি ছেলেকে আমরা সেদিন ডাক্তারখানায় রেখে এসেছি, তাকে দেখে আমাদের বাঙালি বলে বিশ্বাস হয়েছে; সে কথা তাঁকে জানিয়ে দিলাম। তিনিও সেদিন যে করে হোক, সেই ডাক্তারখানা অবধি যাবেন। যখন এতদূর এসেছেন, তখন আর নারায়ণ দর্শন না করে শ্রীধামে ফিরবেন না। লোকটি বড়ই সুন্দর প্রকৃতির। চৈতন্যদেব উপদেশ দিয়েছিলেন –

তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা,
অমানিনা মানদেন কীর্তনীয়ঃ সদা হরি।

সে উপদেশ আধুনিক বৈষ্ণব মহাশয়েরা কতদূর পালন করে থাকেন সে বিষয়ে সন্দেহ আছে; আমার যতটুকু অভিজ্ঞতা তাতে বলতে পারি বৈষ্ণব মহাশয়েরা উপদেশের শেষাংশ পালন করে থাকেন, সর্বদা হরিনাম কীর্তন তাঁরা করে থাকেন; তবে তার কতখানি হরির জন্য, আর কতখানি ভিক্ষার জন্য, পদ-প্রসারের জন্য, তা তাঁরা এবং তাঁদের হরিই বলতে পারেন। বৈষ্ণব নাম শুনলেই তার সঙ্গে সঙ্গে অনেকগুলি কথা,

অনেকগুলি ভাব, আমাদের মনে এসে পড়ে, সেগুলি নামের সঙ্গে এমন দৃঢ়রূপে জড়িয়েছে যে, তাদের স্থানচ্যুত করা এক প্রকার অসম্ভব ব্যাপার হয়ে পড়েছে। ভাল বৈষ্ণব বড় একটা নজরে পড়ে না। প্রতিদিন গ্রামে গ্রামে যে বৈষ্ণব দেখতে পাই, তারা শুধু ভিক্ষা পাবার জন্যই তিলক-মালা ধারণ করেছে বলে মনে হয়। বৈষ্ণবদের কথা বলতে বলতে একটা অনেকদিনের কথা আমার মনে পড়ে গেল। যিনি সে কথাটি বলেছিলেন, তিনি আজ স্বর্গে; এখন তাঁর কথা আর প্রতিদিন মনে হয় না। তিনি আমার স্বর্গীয়া মাতৃদেবী। তিনি যদিও হিন্দু পরিবারের মধ্যে বর্ধিত হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর ধর্মভাব সার্বভৌমিক ভিত্তির উপর সংস্থাপিত ছিল। তিনি কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের গোঁড়ামি দেখতে পারতেন না। তিনি একদিন বৈষ্ণবদের সমালোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন যে, আমরা সংসারের মধ্যে থেকে হরিনাম অনেক সময় ভুলে যাই; সুতরাং আমরা পাপী তার আর সন্দেহ নেই; কিন্তু এই বৈষ্ণবগুলো সংসারটাকে এতই ভালবাসে যে, তাকে একদণ্ড কাছছাড়া করতে পারে না; তাই তারা তাদের সংসারের উনকোটি চৌষট্টি ঝুলির ভিতর পুরে দিনরাত কাঁধে করে, পিঠে ঝুলিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে। তারা এই ঝোলাই বইবে, না হরিনাম করবে ! কথা কয়টি বড় ঠিক। বৈষ্ণব সাধু-সন্ন্যাসী আমি জীবনে অনেক দেখেছি; কিন্তু তাদের অধিকাংশই প্রাণের মধ্যে প্রকাণ্ড একটা সংসার। তারা যে কেমন করে, সংসার বাসনা ঝুলিতে বোঝাই করে নিয়ে বেড়ায়, তাই ভেবে উঠা যায় না।

সে কথা যাক। আজ এই চটিতে যে বৈষ্ণবের সঙ্গে দেখা হলো, তাঁর উপরে এত কথা খাটে না। তাঁকে দেখে সেই অল্প সময়ের মধ্যে যতটুকু আমি বুঝতে পেরেছিলাম, তাতে বলতে পারি লোকটা বেশ ধার্মিক; আর তিনি সত্যসত্যই ধর্মের জনই এই আশ্রমে প্রবেশ করেছেন। তিনি এত বেলায় রান্না করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু আমরা আর তাঁকে সে কষ্ট পেতে দিলাম না; আমাদের জন্যে যে খাবার তৈয়েরি হয়েছিল, তাই তাঁর সঙ্গে ভাগ করে গ্রহণ করা গেল।

আহারান্তে তিনি আর একদণ্ড বিশ্রাম করলেন না; আমরা যে দেশ ছেড়ে এসেছি, তিনি সেই দেশের দিকে চলে গেলেন। আমার প্রাণের মধ্যে আবার বাসনা জেগে উঠল। মনে হতে লাগলো, নেমে কোথায় যাব ? আমার আবার প্রত্যাবর্তন কেন ? বেশ ত গিয়েছিলাম ! নেমে আসবার কি এমন একটা দরকার হয়েছিল, তা ত আজ বুঝতে পারি না। কি মনে করে যে এতটা রাস্তা এসেছি, তা আজ মোটেই মনে আনতে পারলাম না। বড়ই ইচ্ছা হলো বৈষ্ণবের সঙ্গে আবার নারায়ণের পথে চলে যাই; সেখানে গিয়ে শেষে যা হয় একটা ব্যবস্থা করা যাবে। যে কথা সেই কাজ, আমি তখনই কম্বল কাঁধে করে বের হবার উদ্যোগ করছি দেখে স্বামিজী নিষেধ করলেন, এত রৌদ্রে বাহির হয়ে কাজ নেই। আমি তাঁকে জানিয়ে দিলাম যে আমি আবার নারায়ণের পথে যাচ্ছি; নীচে ফিরে যাবার মত পরিবর্তন হয়েছে। স্বামিজী শুনে একেবারে অবাক; সত্যসত্যই তিনি হাঁ করে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইলেন; দেখে যেন বোধ হলো যে, হয় তিনি আমার কথা মোটেই বুঝতে পারেন নি, আর না হয় তিনি আমার মস্তিষ্ক বিকৃতির কথা ভাবছেন। আমি তাঁকে এই অবস্থায় দেখে নিজেই নীরবতা ভঙ্গ করে দিলাম ''তা হলে আসি'', এই বলে যখন আমি পা বাড়িয়েছি, তখন সেই সন্ন্যাসী, সেই সংসারত্যাগী সর্বত্যাগী সাধু এসে একেবারে দুই হাত দিয়ে আমাকে আটকিয়ে

রাখবেন বলে মনে করলেন। শুধু তাই নয়, নির্বাক সন্ন্যাসী দুই চারিবিন্দু চোখের জল ফেললেন। হায় কপট সন্ন্যাসী, হায় ভণ্ড সাধু, আজ তুমি বাহুবন্ধনে ও চোখের জলে ধরা পড়েছ। তোমার গৈরিকবসন, দণ্ড কমণ্ডুল ও তোমার এই কষ্ট স্বীকার, এত সাধন ভজন মিথ্যা, তুমি ঘোর সংসারী; তুমি এক সংসার ছেড়ে এসে আর এক সংসারে পড়েছ। তুমি ভগবানের দ্বারে পৌঁছতে পারছ না। এত যার স্নেহ মমতা, এত যার মানুষে উপর টান, সে ভগবানকে ডাকে কি করে ? আমি সন্ন্যাসীর সেই বাহুবন্ধনে মহা বিপন্ন হয়ে পড়লাম, তাঁর চোখের জল দেখে আমার সব ঘুরে গেল। আমি আর কথাবার্তা না বলে সেখানে বসে পড়লাম। স্বামিজীও আমার কাছে বসে সস্নেহে আমার দীর্ঘ কেশ, রুক্ষ মস্তকে হাত বুলাতে লাগলেন। আমার আর নারায়ণের পথে যাওয়া হল না; কিন্তু তখনই সকলে মিলে সে চটি থেকে বেড়িয়ে পড়া গেল। সন্ধ্যার সময়ে কর্ণপ্রয়াগে এসে নীরবে নিঃশব্দে একটা দোকানঘরে রাত্রিবাস করা গেল। কর্ণপ্রয়াগে পেড়া কিনতে পাওয়া যায়; সে পেড়া খেয়েই সে রাত্রি কাটিয়ে দেওয়া গেল।

৬ জুন। – প্রাতে উঠে দেখি আকাশ একেবারে মেঘে ছেয়ে ফেলেছে, আর ধীরে ধীরে বেশ বৃষ্টি হচ্ছে। পাহাড় অঞ্চলে এ রকম বৃষ্টি দেখলেই বুঝতে হবে যে, সে দিন বৃষ্টি বড় শীঘ্র থামবে না। আমার আর এ বৃষ্টির মধ্যে বার হবার মোটেই ইচ্ছা ছিল না, আবার বেশ গুছিয়ে কম্বলখানা মুড়ি দিয়ে শয়ন করতে যাচ্চি, এমন সময় বৈদান্তিক ভায়া বাধা দিলেন; তিনি বললেন, ''এ রকম বাজারে জায়গায় আর এক বেলাও থেকে দরকার নই, যদি এক আধবেলা বিশ্রাম করা নিতান্তই দরকার হয় ত পাহাড়ে মধ্যে কোনো একটা নির্জন চটিতে দুই একদিন কাটিয়ে দেওয়া ভাল।'' বৈদান্তিক ভায়ার কখন যে কি মত হয়, তা দেবতারাও ঠিক করে বলতে পারেন না। যেখানে বেশি জিনিসপত্র পাওয়া যায়, সেখানে থাকতে ইতিপূর্বে কোনো দিনও তাঁর কোনো প্রকার আপত্তি হয় নি; কিন্তু আজ তিনি জঙ্গলের মধ্যে জনহীন পর্বতগহ্বর , কি সামান্য চটিতে বিশ্রাম ভাল বলে মত প্রকাশ করলেন। হয় তিনি আমাকে বার হতে অনিচ্ছুক দেখেই বার হবার জন্য প্রস্তুত হলেন, না হয় আজ বৃষ্টির মধ্যে বেড়িয়ে পড়ে রাস্তায় কিঞ্চিৎ কষ্টভোগ আমাদের অদৃষ্টলিপি ছিল, তাই বৈদান্তিক আজ সকলের আগে কম্বল কাঁধে করে বেড়িয়ে পড়লেন। আমি বাক্যব্যয় না করে তাঁর অনুবর্তী হলাম।

খানিকটা দূর এগিয়ে এমন ঝড়ে আটকিয়ে যাওয়া গেল যে, আর এক পা অগ্রসর হবার শক্তি রইল না। মড় মড় করে বড় বড় গাছ সব ভেঙে পড়তে লাগলো, প্রতি মুহূর্তে বোধ হলো যেন এই বারেই হয় আমাদের উড়িয়ে নিয়ে যাবে, বা উপর থেকে হয় গাছ ভেঙ্গে না হয় পাহাড়ের ধস্ নেমে আমাদের সন্ন্যাসীগিরি জন্মের মত ঘুচিয়ে দেবে। আমরা তখন এক জায়গাতেও নেই যে, একত্রে জড়িয়ে পড়ে থাকব। কে যে কোথায়া, তা আর সেই ঝড় বৃষ্টির মধ্যে দেখতে পাওয়া গেল না। আমি একে নিজের প্রাণ নিয়ে ব্যস্ত তার মধ্যে আবার স্বামিজীর কথা মনে হতে লাগলো। একটা গাছের শিকড় প্রাণপণে দুই হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে আমি শুয়ে পড়েছি। মাথার উপর দিয়ে কত কি বয়ে যাচ্ছে, একবার একটা হয় ত প্রচণ্ড ডালই হবে, আমার মাথার কাছ দিয়ে চলে গেল। কম্বলখানি দুই তিন জায়গায় ছিঁড়ে গেল, গানের বইখানি কিন্তু বুকের মধ্যে আছে। ঝড় আর থামে না, তবু একটু নরম হয়ে গেল; বৃষ্টি খুব কম হয়ে গেল। বৃষ্টি খুব হওয়াতে কিছু এলো গেল না; তার চাইতে যদি বাতাসটা কমে গিয়ে বৃষ্টি

সমভাবেই থাকতো তাতে আমার কোনোই ক্ষতি ছিল না; কাপড় ও কম্বল যতটা ভিজে গিয়েছিল তার চাইতে বেশি ভিজবার জো ছিল না। এভাবে আমাকে অধিকক্ষণ আর থাকতে হয় নি। অচ্যুত বাবাজী আমার সম্মুখে কোথায় ছিলেন; তিনি বিপুল বিক্রমে বাতাসের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে আমার কাছে এসে উপস্থিত হলেন এবং তাঁর সেই বিশাল দেহ দিয়ে আমাকে আবৃত করে বসলেন। আমার মনে পড়ে যখনই ঝড় বৃষ্টি হয়েছে, তখনই বৈদান্তিকের নির্মম কঠোর বক্ষতলে আমি আশ্রয় পেয়েছি। পক্ষীমাতা যেমন নিরাশ্রয় শাবককে বিপদকালে নিজের পাখা দুইখানির নীচে লুকিয়ে রাখে, বৈদান্তিকের সেই বিপুল বক্ষ তেমনি আমাকে অনেক বিপদের সময়ে আশ্রয় দিয়ে রক্ষা করেছে। আমি বিপন্ন হলে কোনো দিনই সে মায়াবাদের আশ্রয় গ্রহণ করে আমাকে উড়িয়ে দিতে পারে নি। এ মানুষটি এতদিন আমাদের সঙ্গে রইল, তবু এর ভাবগতিক আমি ত মোটেই বুঝতে পারলাম না; তার মতামতের একটা সামঞ্জস্য কখনও দেখা গেল না। কি একটা এলোমেলো হৃদয় নিয়ে সে যে দেশত্যাগ করেছে তা আর বলতে পারি নে; সে বোধ হয় এত দিনেও তার প্রাণের বিক্ষিপ্ত জিনিসগুলিকে একত্র সংগ্রহ করে একটা বুদ্ধি স্থির করতে পারে নি।

আর একটু পরেই ঝড় থেমে গেল। স্বামিজী আমাদের পশ্চাতে আছেন, তাঁর উদ্দেশ করা দরকার হয়ে পড়লো; কারণ এখনও তাঁর কোনো খোঁজ-খবরই নেই। আমরা দুই জনে তাঁর বিলম্ব দেখে বড়ই ব্যস্ত হয়ে যে পথে এসেছিলাম, সেই পথে ফিরে যেতে লাগলাম। বেশি দূর যেতে হল না; একটু পথ যেতে না যেতেই দেখি তিনি ভারি ব্যস্ত হয়ে ছুটে আসছেন। আমাদের দুই জনকে দেখে একেবারে বসে পড়লেন। তাঁর এই প্রকার হঠাৎ বসে পড়া দেখে আমরা বেশ বুঝতে পারলাম, তিনি অনেক দূর থেকে ঊর্দ্ধশ্বাসে আমাদের যে কি দশা হলো তাই জানবার জন্য বিশেষ আকুল হয়ে আসছিলেন, সম্মুখে আমাদের দেখে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলেন। আমরা তাঁর কাছে গিয়ে চুপ করে বসে রইলাম। তিনি যখন একটু কথা কইবার মত হলেন, তখন আমরা কি করে কোথায় আশ্রয় পেয়েছিলাম, তাই জানবার জন্য উৎসুক হলেন এবং আমাদের ভিজে কাপড় ও কম্বল দেখে দুঃখ করতে লাগলেন। তাঁর নিজের শরীরে মোটেই জল লাগে নি; তিনি ভগবানের কৃপায় একটি প্রশস্ত গুহায় আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেখানে ঝড় বৃষ্টি মোটেই ঢুকতে পায় নি। আমাদের অবস্থা শুনে তিনি ভগবানকে কৃতজ্ঞতা জানালেন; আজ যে ঝড় জল, তাতে ভগবানের কৃপা না হলে আমরা বাঁচতাম না। স্বামিজী ভগবদ্‌প্রেমে এতটাই বিগলিত হয়ে পড়লেন যে সেখান থেকে যে তিনি শীঘ্র গা ঝাড়া দিয়ে উঠবেন, তেমন রকমটা মোটেই বোধ হলো না। প্রথমে তিনি চক্ষু মুদ্রিত করে বসলেন, আমরা দুইটি হতভাগ্য পাষাণ হৃদয় জীব হাঁ করে তাঁর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। একটু পরেই তিনি গান আরম্ভ করে দিলেন। – আমার উপর তাঁর একটা আদেশ ছিল যে যখনই তিনি যে অবস্থায় গান ধরবেন, তাতে আমাকে যোগ দিতেই হবে। আমার ভাগ্যক্রমে তিনি কখনও এমন কোনো গান ধরেন নি যা আমি জানিনে; গাইতে যদিও ভাল জানি না – ভাল কেন, নিজের তৃপ্তি ব্যতীত আমার গান শুনে দ্বিতীয় ব্যক্তির তৃপ্তি জন্মাবার দুরাশা আমিও কোন দিনও মনে স্থান দিই নি, কিন্তু তা বলে আমার গানের তহবিল শূণ্য নয়। গাইতে পারি আর না পারি, গান আমার সংগ্রহ আছে; আর তা না হলে যদিও কম্বল ও যষ্টি সম্বল করে পথে বেরিয়েছিলাম, কিন্তু

আমার পরমারাধ্য কাঙাল ফিকিরচাঁদের গানের বইখানি কোন দিনও ছাড়ি নি, সেখানিকে বৈষ্ণবের জপমালার মত বুকে করে নিয়ে বেড়িয়েছি।
স্বামিজী গান ধরলেন; তার সবটা মনে নেই। তবে তার মুখখানি মনে আছে, পাঠকগণের মধ্যে যাঁদের জানা আছে তাঁরা সবটা গেয়ে নেবেন গানটি এই –"হরিসে লাগি রহো রে ভাই।"

এই গানটি মীরাবাইএর রচিত। স্বামিজী যখন–তখনই এই গানটি গাইতেন। তিনি যেভাবে উল্টে–পাল্টে গানটি গাইতে লাগলেন, তাতে কতক্ষণে যে তিনি গান ছেড়ে দেবেন তা মোটেই বুঝতে পারা গেল না; এদিকে বেলাও হয়ে উঠতে লাগল। অগত্যা আমি গান ছেড়ে দিলাম; তাঁর স্বর ধীরে ধীরে নামতে লাগল, শেষে একেবারে বাতাসে মিলিয়ে গেল। কিন্তু তখনও তিনি উঠলেন না। গান শেষ হয়েছে দেখে আমরা দুইজনে উঠে এদিক ওদিক করতে লাগলাম। কিচুক্ষণ পরে তিনি আপন মনেই চলতে লাগলেন; আমরা দুইজনে ধীরে ধীরে তাঁর পশ্চাতে যেতে লাগলাম।

আজ দুই প্রহরে যে চটিতে আশ্রয় নিয়েছিলাম তার নামটি আমার খাতায় লেখা নেই, সেই জায়গাটা ফাঁক রয়েছে; বোধ হয় সেই দুই প্রহরে কোন নূতন চটিতে ছিলাম, তার নামটি শুনে নিতে মনে ছিল না, বিশেষতঃ এই প্রত্যাবর্তনের সময়ে আমার ডাইরীটা তেমন নিয়ম মত লেখাই হতো না; তার কারণ হচ্ছে এই যে, নারায়ণে যাবার সময় যেমন একটা স্ফূর্তি নিয়ে বেরিয়েছিলাম আসবার সময় তার সম্পূর্ণ অভাব। এখন কলের পুতুলের মত যাচ্ছি। এ কথাটা মনে হলে আমার প্রাণের ভিতর কেমন একটা ঘোর অবসাদের ভাব এসে উপস্থিত হতো; আমার উদাস প্রাণকে আরও উদাস করে ফেলতো; আমি মোটেই মনটাকে স্থির করে নিতে পারতাম না; কাজেই সে সময়ে কোন কাজই ভাল লাগতো না, আর সেই জন্যই প্রত্যাবর্তনের ডাইরী শুধু যে ভাল করে রাখা হয় নি তা নয় , অসম্পূর্ণ পড়ে রয়েছে। যতই নীচে নেমেছি ততই জড়তা, বিষাদ, দঃুখ কষ্টের ছবি সব আমার প্রাণের ভিতর বেশি করে ফুটে উঠেছে, আর ততই আমি অন্যমনস্ক হয়েছি।

সেই অজ্ঞাতনামা চটিতে দুই প্রহর বিশ্রাম করে অপরাহ্নে আবার পথে নামলাম। আজ সন্ধ্যার সময়ে আমরা শিবানন্দ চটিতে এসে রইলাম। এই চটিতে আমাদের একাকী ফেলে অচ্যুত বাবাজি চলে যান। আমরা শিবানন্দীর সেই ঠাকুরবাড়িতে পূর্ব বারের মত বাসা করে রইলাম। রাত্রিটা বেশ কেটে গেল।

৭ জুন। – শিবানন্দী হতে রুদ্রপ্রয়াগ পর্যন্ত পথ অতি কদর্য, এমন ভয়ানক রাস্তা যে পা ঠিক রাখা যায় না। আর এই পথের মধ্যে পাহাড়গুলো আবার এমন নরম যে একটু জল হলেই অনেক ধস্ নামে। গভর্নমেন্ট এই রাস্তাটিকে ঠিক রাখতে না পেরে শিবানন্দীর ৪ মাইল উপরে পিপলচটিতে একটা লোহার সেতু নির্মান করে রাস্তাটিকে নদীর অপর পার দিয়ে চালিয়েছেন এবং সেই রাস্তা রুদ্রপ্রয়াগে এসে আবার আর একটা লৌহসেতুর সাহায্যে পূর্ব রাস্তায় এসে মিশেছে। আমরা এ সংবাদ জানতাম, কিন্তু আমাদের এও জানা ছিল, এই নূতন রাস্তায় আশ্রয় স্থান নেই। তাই আমরা নারায়ণে যাবার সময়েও সে রাস্তায় যাই নি, এখন ফিরবার সময়েও সে রাস্তায় গেলাম না। পিপল চটিতে

অপেক্ষা না করে আমরা একেবারে শিবানন্দীতে এসে উঠেছিলাম। আজ শিবানন্দী হতে বাহির হয়ে একটু বোধ হয় মাইল দেড় কি দুই মাইল হবে, অগ্রসর হয়েই দেখি রাস্তার চিহ্নমাত্র নেই। গতকল্য যে ঝড় জল হয়েছিল, তাতে রাস্তা একেবারে ধুয়ে নেমে গিয়েছে। এখন কি করা যায়। স্বামিজী বললেন, আর কি করা; ফিরে পিপলচটিতে আজ রাত্রিবাস করে, কাল খুব ভোরে উঠে নদী পার হয়ে নূতন রাস্তা ধরে যেমন করে হোক, না খেয়ে সন্ধ্যা নাগাদ কি চার দণ্ড রাত্রের মধ্যে রুদ্রপ্রয়াগে পৌঁছুতে হবে; তা ছাড়া আর উপায় নেই। ফিরে যেতেও আমাদের আপত্তি ছিল না। তার পরের দিন অনাহারে সারাদিন চলতেও যে বড় একটা ভারি কষ্ট হবে তাও মনে হয় নি; কিন্তু আজকের সারাদিন রাত্রি পিপলচটিতে বাস করা অপেক্ষা গঙ্গায় ঝাঁপ দেওয়া ভাল; অচ্যুত ভায়ারও সেই মত। যে পিপলচটির লক্ষ লক্ষ মাছির দৌরাত্ম্যের কথা আজও আমার মনে আছে, সেখানে কিছুতেই রাত্রিবাস করা হবে না; অচ্যুত ভায়া বললেন, ''আপনারা এইখানে অপেক্ষা করুন, আমি একটু উপরে উঠে গাছ ধরে ধরে এগিয়ে দেখি এই সুমুখের পাহাড়ের ও-পাশে রাস্তা আছে কি না।'' যে কথা সেই কাজ; তিনি তাঁর বেদান্তদর্শনের বোঝা ও কম্বলখানি নামিয়ে রেখে বিপুল বিক্রমে গাছপালা ধরে ধরে উপরে উঠতে লাগলেন; এবং কখন গাছের পাতা সরিয়ে, কখন শিকড় ধরে বেশ যেতে লাগলেন; এবং মধ্যে মধ্যে আমাদের দিকে সগর্বে দৃষ্টিনিক্ষেপ করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরেই চীৎকার করে বললেন, ''ভয় নেই এদিকের রাস্তা তেমন ভাঙেনি।'' তারপর আবার যেমন করে গিয়েছিলেন তেমনি করে ফিরে এলেন। আমি তাঁর গমনাগমন দেখে বেশ যেতে পারব বলে মনে ভরসা বাঁধলাম, কিন্তু স্বামিজী তেমন সাহস পান নাই। অবশেষে কি করেন, আর ত কোনো উপায় নাই; কাজেই তাঁর দণ্ডকমণ্ডুল অচ্যুত ভায়ার জিম্মা করে দিয়ে তিনি আগেই রওনা হলেন; বৈদান্তিক তাঁর সঙ্গে সঙ্গে যেতে লাগলেন; সে সময়ে বৈদান্তিকের দৃষ্টি এমন সতর্ক যে, তা লিখে বোঝাতে পারি না। তিনি শুধু স্বামিজীর গতিবিধির উপর নজর রেখে অগ্রসর হচ্ছেন, আর মধ্যে মধ্যে খবরদারি করছেন। বোধ হয় আমি তাঁর প্রদর্শিত পথে অনায়াসে যেতে পারব ভেবে তিনি আর আমার দিকে লক্ষ্য রাখলেন না, শুধু সাবধান করে দিতে লাগলেন। কখন গাছের ডাল ধরে, কখন লাফিয়ে অগ্রসর হতে লাগলেন। শেষে অনেক কষ্টে নিরাপদে একটা রাস্তায় ওঠা গেল। এই আমাদের কষ্টের শেষ নয়। রাস্তায় পাঁচ সাত জায়গায় ভেঙে গিয়েছে; তবে এই ভাঙনটা যেমন অনেকটা স্থান জুড়ে, অন্যগুলি তেমন নয়। সেগুলি পার হতেও লাফালাফি করতে হয়েছে বটে, কিন্তু তাতে তেমন বেশি কষ্ট হয় নি। যাই হোক, দুই ঘণ্টার পথ পাঁচ ঘন্টায় চলে বেলা প্রায় এগারোটার সময় আমরা রুদ্রপ্রয়াগে এসে উপস্থিত। নারায়ণে যাবার সময়ে আমরা রুদ্রপ্রয়াগের গভর্নমেন্টের ধর্মশালায় ছিলাম এবং সেখানে পীড়িত হয়ে আমাদের তিন দিন থাকতে হয়; এবারে সেজন্য আর ধর্মশালায় গেলাম না; বাজারে একটা দোকানে আশ্রয় গ্রহণ করা গেল।

আমরা আহারাদি শেষ করে বিশ্রামের আয়োজন করছি, বেলা তখন দুইটা বেজে গিয়েছে বলে বোধ হল। সে সময়ে দেখি একজন বাঙালি সন্ন্যাসী বাংলা ভাষায় যাচ্ছে তাই বলে দোকানদারগণকে গালাগাল দিতে দিতে আমাদের সম্মুখ দিয়ে চলে যাচ্ছে। আমরা যে দোকানখানিতে ছিলাম, সেখানি বাজারের একপ্রান্তে অবস্থিত। লোকটির গৈরিক বসন দেখে তাকে সন্ন্যাসী বলেছি। তার পর গৈরিক রং করা ক্যামবিসের

একজোড়া জুতা, পরিধানে গৈরিক বস্ত্র, গায়ে গৈরিক পিরান, কাঁধে ১ খানি কম্বল তাকেও রং করে পোষাকের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়েছে; হাতে একটা সেতার; তারও পরিত্রাণ নাই, তাকেও গৈরিক খোলে মোড়া হয়েছে। লোকটাকে বড়ই রাগান্বিত দেখে আমি তাকে ডাকতে লাগলাম, বাংলা ভাষায় তাকে ডাকছি, তবু সে রাগের ভরে চলে যায় দেখে আমি তাড়াতাড়ি গিয়ে তার পথ রোধ করে দাঁড়ালাম এবং কেন সে এত চটে গিয়েছে জিজ্ঞাসা করায়, সে দোকানদারের পিতৃমাতৃ উচ্চারণ করে গালি দিতে লাগলো এবং রাগে গরগর করে কতকগুলি কথা বলে ফেললে; তার সার এই যে আজ ভোরে রওনা হয়ে সাত আট ক্রোশ রাস্তা সে হেঁটে এসেছে, সঙ্গে একটি পয়সা নেই। এখানে এসে যে দোকানে যায় সেই দোকানদারই বিনা পয়সায় তার আহার যোগাতে অসম্মত হয়। বেলা আড়াই প্রহরের সময় বেচারার উপর এ প্রকার অত্যাচার করায় সে কি করে তার মেজাজ ঠিক রাখতে পারে; আপনারাই তার বিচার করুন। অনেক বুঝিয়ে তাকে এনে আমাদের দোকানে বসালাম এবং দোকানদারের ঘরে জলখাবার যা ছিল তা দিয়ে তার উদরকে শান্ত করা গেল। সে যখন প্রকৃতিস্থ হল তখন তাকে আমি বুঝিয়ে দিলাম যে, সে যে প্রকার চটা মেজাজের লোক তাতে বিনা সম্বলে এ পথে চলতে পারবে না; তার চাইতে তার পক্ষে ফিরে যাওয়া ভাল, এবং সে যদি সম্মত হয়, তা হলে তাকে আমরা সঙ্গে নিয়ে যেতে রাজি আছি। সে তাতে সম্মত হল না; যে করেই হোক সে নারায়ণ দর্শন করতে যাবেই। তার সদুদ্দেশ্যে বাধা দেওয়া অকর্তব্য মনে করে আমি যথাসাধ্য তাকে সাহায্য করলাম, শেষে একসঙ্গেই সকলে বাহির হওয়া গেল। দুর্বাসার ছোট সংস্করণ সাধু নারায়ণের পথে গেলেন, আমরাও শ্রীনগরের দিকে অগ্রসর হলাম। এই স্থানে একটি কথা না বলা ভাল হয় না। নারায়ণে যাবার সময়ে এই রুদ্রপ্রয়াগে একজন জুতাওয়ালার পরমাসুন্দরী মেয়েকে দেখেছিলাম; তার কথা আমার মনেই ছিল, এবং এখানে এসেই তার দোকানের দিকে গেলাম; কিন্তু গতকল্য যে ঝড় বৃষ্টি হয়েছিল, তাতে তাদের সে ক্ষুদ্র দোকান ঘরখানি নদীতে নেমে গিয়েছে, তারা কোথায় গিয়েছে কে তার উদ্দেশ্য বলে দেবে আর কাকেই বা সে কথা জিজ্ঞাসা করব।
আজ অপরাহ্নে আমরা ভজনী চটিতে রাত্রিবাস করি। এ চটির কথা আমার খাতায় বেশি কিছুই লেখা নাই।

৮ জুন – আজ আমরা এই দীর্ঘ প্রবাসের সঙ্গী অচ্যুতানন্দ ব্রহ্মচারীকে হারিয়েছি। তিনি পথে আসতে আসতে কয়েকজন সন্ন্যাসীর সঙ্গে দেখা হলে তাদের দলে মিশে ফিরে গিয়েছে। আমি আগে এসেছিলাম, স্বামিজী পরে, সর্বশেষে বৈদান্তিকের আসবার কথা। আমরা দুজনে এসে একটা চটিতে বসে বৈদান্তিকের জন্য অপেক্ষা করছি; তিনি আর এসে পৌঁছেন না। কতকক্ষণ পরে সেই পথে একজন সন্ন্যাসী এলেন; তিনি এসে আমাদের সংবাদ দিলেন যে, আমাদের সঙ্গী তাঁর মুখে বলে পাঠিয়েছেন যে, তিনি একজন সাধুর সঙ্গে মানসসরোবরের দিকে গেলেন; আমাদের মনে বড়ই কষ্ট হল। লোকটা এতদিন সঙ্গে ছিল; যাবার সময় একটি কথাও বলে গেল না, বা বিদায় নিয়ে গেল না। হঠাৎ রাস্তার ভিতর থেকে ফিরে চলে গেল। তার কি একবারও মনে হল না যে, আমরা দুইটি মানুষ তার জন্যে পথ চেয়ে বসে থাকব; এবং শেষে যখন শুনবো যে, সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে, তখন আমাদের মনে যে একটা ভয়ানক কষ্ট হবে, সে ভাবনাটাও কি মায়াবাদী বৈদান্তিকের মনে ক্ষণকালের জন্যও ওঠেনি। আর যাকে সে সংবাদ দিতে বলেছিল, সে যদি সংবাদ না দিত, তার যদি সে কথাটা মনে না থাকতো,

তা হলে ত আমরা দুইটি মানুষ সে দিন কেন দুই তিন দিন ধরে তাকে সেই বনপ্রদেশের পর্বতগাত্রে খুঁজে খুঁজে হয়রান হয়ে যেতাম ! এ সব কথা তার মনে হলে সে অমন করে নিতান্ত অপরিচিতের মত আমাদের পরিত্যাগ করে যেতে পারত না। কে জানে ভগবান তাকে কোথায় নিয়ে গেলেন; এ জীবনে তার সঙ্গে আর দেখা হবে বলে মনে হল না। এতদিন একত্র ছিলাম, পথশ্রমে কাতর হলে তার সঙ্গে তর্ক জুড়ে দিয়ে বেশ সময় কাটানো গিয়েছিল, বিপদে আপদে সে তার বিশাল বক্ষঃস্থল পেতে দিয়ে কতদিন আমাকে রক্ষা করেছে; – গতকল্যই আমার প্রতি স্নেহ প্রকাশ করেছে, আজ কি না সে অনায়াসে চলে গেল। পথে ছেড়ে যেতে কি তার প্রাণে একটি কথাও উঠেনি; দুইজন স্বদেশবাসী সঙ্গীকে সে অনায়াসে ফেলে চলে গেল। স্বামিজী বড়ই দুঃখ করতে লাগলেন এবং বললেন যে, তার অদৃষ্টে অনেক কষ্ট আছে। তাঁর সে কথা সত্যসত্যই ফলে গিয়েছিল। অনেকদিন পরে, বোধ হয় চার পাঁচ মাস হবে, একদিন রুগ্ন জীর্ণশীর্ণ দেহে অচ্যুতানন্দ স্বামী আমার দেরাদুনের বাসায় এসে পৌঁছেছিলেন এবং তাঁর সেই পঞ্চমাসব্যাপী কষ্ট যন্ত্রণার কাহিনী যা আমাকে বলেছিলেন তা শুনলে পাষাণও বিগলিত হয়। তিনি অনেক কষ্ট পেয়েছিলেন। আমি তাঁকে কয়েকদিন বাসায় রাখি, তারপর তিনি আলমোড়ায় যাবেন বলে আমার নিকট হতে বিদায় নিয়ে যান। সেই হতে তাঁর আর কোনো সংবাদ পাইনি, কিন্তু এখনও তাঁর কথা মনে পড়ে; এখনও আমার এই দরিদ্র গৃহস্থালীর মধ্যে অচ্যুতানন্দকে পেলে আমি কত সুখী হই এবং তার সঙ্গে হিমালয়ের প্রবাস–কাহিনী বলে অতুল আনন্দ পেতে পারি।

এইদিন থেকে আমি আর ডাইরী রাখিনি। কোন দিন আমার ভ্রমণ কাহিনী মানুষের নিকটে বলতে হবে, সে কথা ত আমি স্বপ্নেও ভাবিনি। আর যে দেশে ফিরে আসবো, সে চিন্তা একদিনের জন্যেও আমার মনে হয় নি। ডাইরী লিখবার অভিপ্রায়ও আমার ছিল না। আমার সঙ্গে একখানি গানের বই ছিল, সেই বইখানি যখন ভাল করে বাঁধানো হয়, সেই সময়ে তাতে অনেকগুলি সাদা কাগজ জুড়ে রাখি, উদ্দেশ্য নূতন নূতন গান পেলে সেখানে লিখব। যখন নারায়ণের পথে যাই, সে সময়ে সেই খাতায় সাদা কাগজ দেখে স্বামিজী আমাকে কিছু লিখে রাখতে বলেন এবং তারই আদেশে যে দিন যেখানে যা দেখেছিলাম, তা লিখে রাখি। কিন্তু প্রত্যাবর্তেনের পথে শ্রীনগর অবধি এসে আর আমার লেখবার তেমন ইচ্ছা হল না। আসল কথা এই যে, যতই আমি লোকালয়ের দিকে নেমে আসছিলাম, ততই যেন কেমন করে আমার সব গোলমাল হয়ে যাচ্ছিল, আমার মনের অবস্থা ততই কেমন খারাপ হচ্ছিল। এ অবস্থায় কি আর রোজনামচা লিখে রাখবার ইচ্ছা হয়। বিশেষ যে পথে গিয়েছিলাম, সেই পথেই প্রত্যাবর্তন; নূতন ব্যাপার, নূতন দৃশ্য কিছুই আমার সম্মুখে পড়েনি; ডাইরী না লিখবার ইহাও একটি কারণ।

শ্রীনগর হিমালয়ের মধ্যে হলেও একটা লোকালয়। আমরা লোকালয়ে পৌঁছেছি। শ্রীনগরে আমার অনেক বন্ধু, অনেক ছাত্র আছেন, তাঁদের সঙ্গে কয়েকদিন কাটিয়ে আমি ফিরে আসি।

এখন আমার বিদায় গ্রহণের সময়। হিমালয়ের পরম পবিত্র মহিমা আমি কীর্তন করতে পারিনি। যেটি যেমন করে বললে ভাল হত, আমার দুর্বল লেখনী তা বলতে পারেনি। যে দৃশ্যের সামনে দাঁড়িয়ে পৃথিবীর সর্বপ্রধান শিল্পী নিজের দুর্বল হস্তের অযোগ্যতায়

কাতর হয়ে তুলিকা দূরে নিক্ষেপ করে সেই মহান দৃশ্যের সম্মুখে করজোড়ে দাঁড়িয়ে থেকেই কৃতার্থ হন, আমি সেই হিমালয়ের মহিমা বলতে গিয়েছিলাম – আমার স্পর্ধা কম নয় ! আর যে রকম করে দেখলে ঠিক দেখা হত, আমার তা মোটেই হয় নি। আমি শ্মশানের জ্বলন্ত অগ্নিশিখা বুকে নিয়ে হিমালয়ের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম; আমি শুধু দুই হাতে হিমালয়ের শীতল বাতাস, হিমালয়ের কঠিন বরফ বুকে চেপে ধরেছি; চারিদিকে যে স্বর্গের দৃশ্য জগৎপিতার অনন্তমহিমা অনুক্ষণ কীর্তন করত , আমার কি সে সব দেখবার শুনবার সময় ছিল, না তেমন আমার মন ছিল ? আমি তখন মাথা উঁচু করে কি আকাশের দিকে, স্বর্গের দিকে চাইতে পারতাম; সে ভাবই তখন আমার ছিল না। আমার হৃদয়ের মধ্যে যে কবিত্ব থাকলে মানুষ গাছের ফল, নদীর জল, ফুলের সৌন্দর্য, নির্ঝরিণীর কলতান, বিহঙ্গের হৃদয়মনোমোহন কূজন বর্ণনা করতে পারে, আমার সে কবিত্ব কোনোদিনই ছিল না। আমার কবিত্বানুভবের অবকাশ বা সুবিধা কোন দিনই হয় নাই, সুতরাং কিছুই বলা হয় নাই। আমার এই অতি সামান্য ভ্রমণ বৃত্তান্ত পড়ে যদি কারো প্রাণে হিমালয় দর্শনের ইচ্ছা প্রবল হয়, তাহা হলেই আমার এ সব লেখা সার্থক হবে, এবং সেই হিমালয়ের দেবতা ভগবানের চরণে যদি কেহ অগ্রসর হতে পারেন, তা হলে আমার জীবন সার্থক হবে।

সমাপ্ত